অনুষ্ঠান ১-৪
১৩৯৩

চয়নিকা

কবিতা

বিদেশী কবিতা

প্র
হীনযান
৭ম বছর সংকলন-১-৪
১৩৮২-১৩৮৩
১৩৮৯-৯০
৮ম বছর সংকলন ১, ৩
১৩৮৫
১৩৯৫-৯৬
Rabindr
এবং
অন্যান্য

হীনযান

৭ বছর ১ সংকলন

কবিতা ১

কবিতা সিংহ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত পবিত্র সরকার মুকুল চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত ঘোষ

বিদেশী কবিতা ১২

এলিজাবেথ জেনিংস আর্চিবল্ড ম্যাকলীশ/ অনুবাদ : সুভাষ ঘোষাল

স্মৃতিচারণ ১৫

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

সমালোচনা

সুরজিৎ ঘোষের 'নিষ্ঠুর কাঁচ' ২৫ পিনাকী ভাদুড়ী

সুভাষ ঘোষালের 'লীনার বিমান' ২৯ দিলীপকুমার চক্রবর্তী

পবিত্র সরকারের 'নাটমঞ্চ নাটারূপ' ৩২ ঐ

প্রসঙ্গ : বাংলা গ্রুপ থিয়েটার ৪২

থিয়েটার কমিউন * থিয়েট্রন * সন্দীপন

পরিশিষ্ট ৭২

সাম্প্রতিক মার্কিনী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

---

১ অনিবার্য কারণে পুরুষোত্তম লালের 'মহাভারত' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটি এ'সংখ্যায় প্রকাশ সম্ভব হ'লো না। আগামী সংখ্যায় থাকবে।

২ অ.কৃ.ব.-র 'স্মৃতিচারণ' রচনাটি 'ক্রমশ' চলবে।

সম্পাদনা : **সুভাষ ঘোষাল**

প্রচ্ছদ : **সুনীল দাস**

With best compliments from :

NATIONAL

TOBACCO

COMPANY

A Division of Duncans Agro Industries Ltd.

1 & 2 OLD COURT HOUSE CORNER

CALCUTTA-700 001

রবীন্দ্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে মহামানব, মহাত্মা ও মনীষীদের জীবন ও বাণীর যে-সব ব্যাখ্যা করেছেন ও তাঁদের উদ্দেশে কবিতা রচনা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে সেগুলি সমাহৃত :

অরবিন্দ ঘোষ	৬·০০	বঙ্কিমচন্দ্র	১০·০০
খৃষ্ট	৩·৫০	ভারতপথিক	
চারিত্রপূজা	২·৫০	রামমোহন রায়	৪·৫০
বিদ্যাসাগরচরিত	২·০০	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৬·৫০
		মহাত্মা গান্ধী	১·৫০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

With compliments from :

TATA STEEL

With best compliments from :

R. D. B. ENGINEERING WORKS

Phone : 41-1132

Office : 64/A, Tollygunge Road,
Calcutta-700 033

Works : 83/E, Chetla Road,
Calcutta-700 027

Structural Fabricator & Mechanical Engineers

Specialised in : Conveyors. Tanks.

Manufacturers of : Mechanised Drying Plant, Cycloflame Furnace & Mechanised Batch Parboiling Plant.

পড়ুন

নতুন সাহিত্য পত্রিকা

নির্মিতি

সম্পাদক : দেবায়ন বসু

১৪/২৯/১, গলফ্ ক্লাব রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৩৩

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

একটাই অভীপ্সা

"আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে ? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্ত চিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয়মাধুর্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না।" তেরো শো দশের চৈত্রে এই অনিবার দুঃখের কথা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। লেখাটির নাম ছিলো 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়'। লেখক রবীন্দ্রনাথ, যিনি তখন 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক। ১৮৮২-তে জন্ম, মৃত্যুবর্ষ ১৯০৪—অর্থাৎ বাইশ বছরের একটি জীবন এবং সেই জীবনেরও মাত্র শেষের দুটি বছর সতীশচন্দ্রের কবিতা ও গদ্য রচনার কাল। শান্তিনিকেতনের এই স্বল্পায়ু তরুণ বাংলা সাহিত্যকে কতোটা রাঙিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন তা এখানে কোনভাবেই প্রসঙ্গ হচ্ছে না। বরং প্রসঙ্গ হয়ে উঠছে মানবীয় চেতনার সেই বিশালাদ্রি যাকে রবীন্দ্রনাথ নামেই আমরা বারে বারে চিনেছি। তাঁর আসন্ন বা উপনীত জন্মদিনে মনে পড়ে যায় তিনি নমস্য হয়েও নমস্কার জানাতে ভুলে যান নি। তিনি ক্ষমতার আকর হয়েও ক্ষমতার অঙ্কুর দেখে দুলে উঠতে পেরেছিলেন। এস-

ঘটনা-তো দূরাগত অতীতের নয়, এই-তো সেদিনের কথা। অথচ মনে পড়লে কেমন যেন অবিশ্বাস্য তথা অলৌকিক মনে হয়। কারণ, আমরা অন্তত এই মুহূর্তের বাংলা সাহিত্যজগতে সন্দর্শন করি একেবারে বিপরীত চিত্র। তাঁর তুলনায় কতো খর্ব মানুষেরা কত দর্পে দর্পিত। কেমন এক অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং আত্ম-মূল্যায়নের অভাব পরিবেশকে এতোটাই ঊষর করে রেখেছে যে, সেখানে যে-কোন রূপেই ঊষার প্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। 'হীনযান'-এর দেহ-প্রাণ-মন জুড়ে একটাই প্রার্থনা, একটাই অভীপ্সা—এই অচলায়তন দূর হোক। দূর হতে যতো দেরী হবে আমরা ততোই পেয়ে যেতে থাকবো সৃষ্টির নামে শত-সহস্র উৎপাদন।

প্রথমে কল্পনা ছিলো, এ-সংখ্যাটি আদ্যোপান্ত আজকের নাট্যভাবনায় ভরে থাকবে। কিন্তু, জল-হাওয়ার গুণে কল্পনা থেকে শেষপর্যন্ত পরিকল্পনায় নেমে আসতে হলো। তাই এ-সংখ্যার কিছুটা জুড়ে থাকলো সত্তর দশকের তিনটি নাট্যদলের দেওয়া 'হীনযান'-এর প্রশ্নের কিছু উত্তর। বলা দরকার, যে-তিনটি দলের উত্তর রাখা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের গোত্র আলাদা এবং দলগুলির নাম নির্বাচিত হয় নি, বরং নির্বিচারে এসেছে। অর্থাৎ এটিকে Sample-Survey বলে ফেলা যায়।

মুক্তাঙ্গন (খাতাগুলি

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

এই বৈশাখে, যখন প্রেসে হীনযান-এর সংখ্যাটি ক্রমশ প্রাণ পাচ্ছে, স্নেহাকর ভট্টাচার্য চলে গেলেন। ক্যানসার-নামক সেই অব্যর্থ শিকারী পঞ্চাশে পৌঁছনোর আগেই তাঁকে অপসারিত করলো। তবে সামান্য স্বস্তি এই যে, মৃত্যুর কিছুকাল আগে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বধ্যভূমিতে মাতলামি' পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে। তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন না। তার প্রধান কারণ হয়তো, বিখ্যাত হবার জন্য অধুনা যতোরূপে যতোভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়, তার কোনটিরই চর্চা ক'রে যেতে তাঁর আগ্রহ দেখা যায় নি। বরং ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার প্রচারসচিবের পদে থেকে এই কবি অনেক সাহিত্যপত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিঃশব্দে অনুপ্রাণিত করেছেন। হীনযানও বারংবার তাঁর মনোময় সমর্থন পেয়েছে। আর বাংলাভাষার সেবক হয়েও লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি যে অত্যন্ত সংযমী ছিলেন তা তাঁর রচনার স্বল্পায়তনই প্রমাণ করে। তাঁকে হারানোর দুঃখ আমরা কেবল অনুভব করে যাই, প্রমাণ করতে পারি না।

যদিদং হৃদয়ং মম।।
তদিদং হৃদয়ং তব।।

শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর—এই একই মন্ত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে নর-নারীর বিবাহের শুভ উপলক্ষে। দুটি হৃদয়ের মিলন-মুহূর্তের এই মঙ্গল মন্ত্র আজও ছড়িয়ে পড়ে আরও নানা আয়োজন ও অনুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে সর্বত্র—রোশনচৌকির সজ্জায়, সানাইয়ের মধুর শব্দে, শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে এবং বিভিন্ন বেশে সুসজ্জিত নিমন্ত্রিতদের আনাগোনায়।

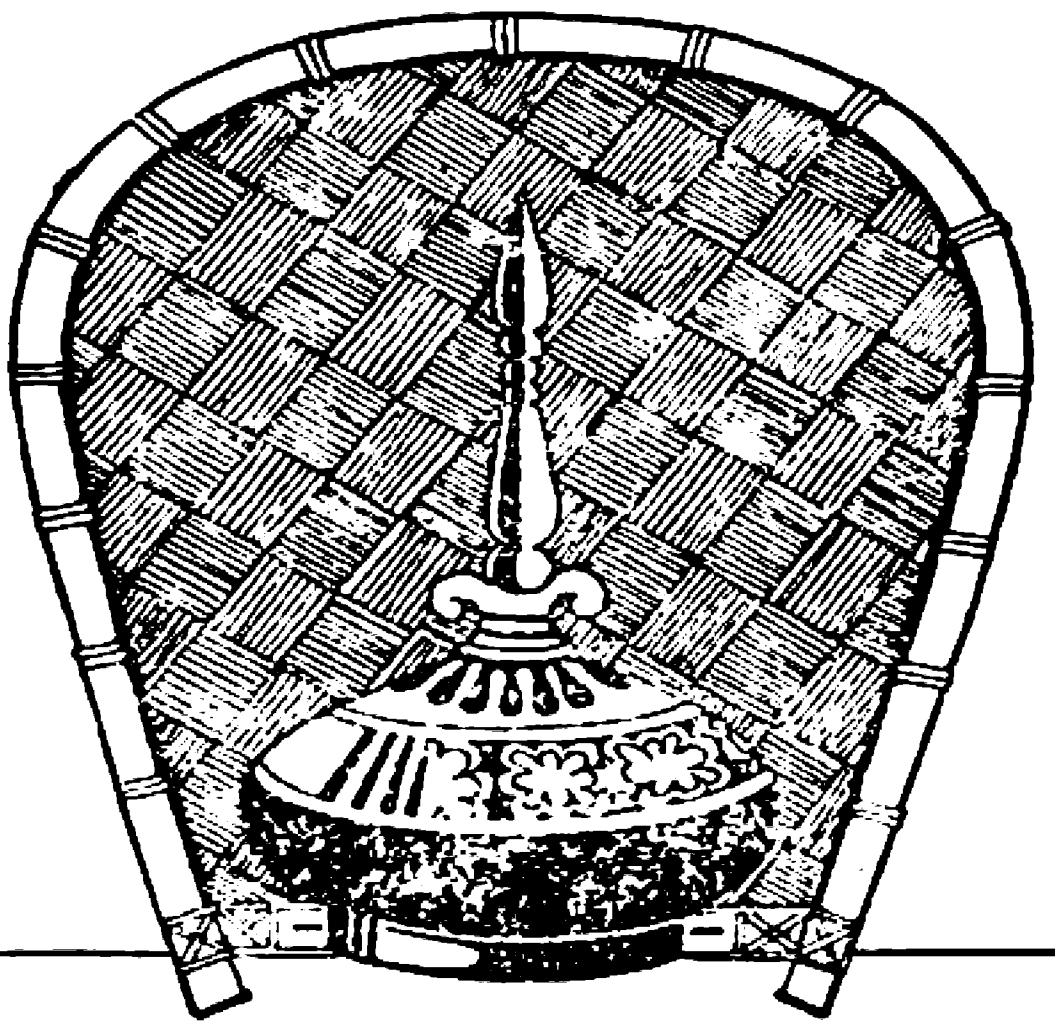

আমাদের কাজ শুভ বিবাহের উৎসব আরও একটু আনন্দমুখর করে তোলা—নিমন্ত্রিত অতিথি ও অভ্যাগতদের সযত্নে খাইয়েদাইয়ে তৃপ্ত করা। আপনার পছন্দ-অপছন্দ, সামর্থ্য ও ইচ্ছার কথা বিজলী গ্রীল-কে বললেই হলো, দেখবেন ঠিক যেমনটি আপনি চান তেমনি মনভরা আয়োজন ও চটপটে আপ্যায়ন দিয়ে নিমন্ত্রিতদের খুশী করছি আমরা।

কারণ, অতিথি আপ্যায়ন শুধু আমাদের পেশাই নয়, আমাদের আদর্শও বটে।

Bijli Grill

কলকাতার সেরা কেটারার

৯ই রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, কলকাতা ২৫ ।। ফোন : ৪৮-২৩৬০/৪৭-৩৯২০

adsystems-BG-1.79

CENTRAL LIBRARY

কবিতা সিংহ

অন্ধদেখা

এই যে দুচোখ দু চোখ নয়তো !
সংগে হৃদয় হৃদয়ও হয়তো
সেই সাথে দুই চোখের ধন্ধ
ধন্ধ চোখের স্মরণ অন্ধ
নয়ন হৃদয় দৃষ্টি অদেখা
ভ্রমরই এভাবে এভাবে ভ্রমর
ওড়ে একা একা ওড়ে একা একা
এখানে ওখানে যখন যেখানে
শুধু সে কি জানে ? কে জানে ? কে জানে ?
কিছুই ভাবে না অথচ কি ভাব
ভাব দোলে তার ওড়ার গড়নে
গড়ন কেমন কেমন আকার
জানতে জানতে আর কে বা কার ?
সকাল পোহালো বিকালের আলো
ক্রমে ধীরে ধীরে সীমানা সরালো
সরানো সীমানা অশ্রুর জলে
কে আপন পর ? পর কে আপন
ভাবতে ভাবতে উড়তে উড়তে
এখানে ওখানে যখন যেখানে
দেখার সুখেই নয়ন অন্ধ !
অন্ধ নয়ন দূরে ফেলে দেয়
মনের অন্ধ চোখের ধন্ধ ।

CENTRAL LIBRARY

হীনযান

পূর্ণ

আমার নিথরে
নিথরে আমার
একটি প্রণাম
প্রণাম তুলুক
একটি সে নাম
প্রাণের আরাম
খুলুক কূলুপ
কূলুপ খুলুক
সকল সকাল
হোকনা বিকাল
বিকাল ভুলুক
ভুলুক চাওয়া
আমার নিথর
নিথর আমার

তার মুখচ্ছবি

কে জানত ? বিরহ একদিন
ছোঁয়ার মতন গাঢ় আঙুলে উঠবে
কে জানত চুল খুলে দিলে

স্বয়ং গভীর শোক নামবেন কালো আঁকা বাঁকা
কে জানত একদিন স্বপ্ন জাগরণ মিশে যাবে
দুঃখসুখ যাওয়া আর থাকা ?
কে জানত চলচ্ছবির মত দেখাবে জগৎ

কে জানত তুমি দ্রষ্টা হবে
এবং সত্যের মত কিংবা সত্য হয়ে
একমাত্র থেকে যাবে তার মুখচ্ছবি !

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

গূঢ় কাক

গূঢ় কাক উড়ে গেলে আঁধার পেরিয়ে
সমস্ত নাবাল জমি কেঁপে ওঠে।
কে যেন ভেতর থেকে সাড়া দেয়। "তুমি আছো ?"
—প্রশ্ন ক'রে, কারা যেন দ্রুত চ'লে যায়।
সমস্ত পৃথিবী শুধু কাছে এসে ব'সে থাকে মহিলার মতো।

কবে শুরু হয়েছিলো, কারো মনে নেই।
এখন আঁধার আলো সমান সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।
গূঢ় কাক নিঃশব্দ সাঁতার কেটে চ'লে গেলে
সবাই নিজের কাছে ফিরে আসে। দেয়ালে দেয়ালে
শ্যাওলার সবুজ আলো চোখের আরাম মনে হয়।
কে যেন বিশাল হাত বাড়িয়ে রেখেছে, ছুঁয়ে যায়—
চুমোর মতন স্বাদ ঠোঁটের ভেতরে ভ'রে ওঠে॥

সিম্ফনী

কান পাতলেই কিন্তু শোনা যায়।
ছোটো ট্রেন এইমাত্র বাঁক নিলো পালাড়তলীর গ্রাম ঘেঁষে।
বনে বনান্তরে আজ পাগল এঞ্জিন চালু হ'লো।
জলের ওপরে শুধু মফুরান শাদা জেগে ওঠে।

আরো একটু দূরে যাও—আরো শব্দ, আরো ভাঙাগড়া।
পুরনো দুর্গ থেকে পাথরখণ্ড আজ গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে
মাইল মাইল শুধু টেলিফোনে কথা চলে সমস্ত জীবন—
একটা স্তব্ধ পাখি বসেছিলো, সেও শিস দিয়ে ওঠে।

কোথাও কি শেষ আছে ? গান শুধু গানের ভেতরে বেঁকে যায়।
ছোটো ট্রেন এইমাত্র স্টেশন ছাড়িয়ে চ'লে গেলো।
"এখনি সময়" ব'লে, চারপাশে হাওয়া জেগে ওঠে।
ওকে প্রণাম করে, আলিঙ্গন করে, ভালোবাসে॥

স্বপ্নের ল্যাণ্ডস্কেপ

ভাঙাচোরা গাছপালা, চাঁদের কুহক লেগে ভারি—
স্বপ্নে এসেছিলো আগে, পরে তাকে বাইরে দেখেছি।
এ কেমন ভালোবাসা ? কিছুটা তো ভয় লেগে আছে !
নদী চ'লে যায়, মাটি গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে ওঠে।

পুরনো দুর্গের মতো প'ড়ে আছে সংরক্ত পাহাড়—
একটা পুতুল পেলে, তাকে আমি বসিয়ে দিতাম গিরিচূড়ে,
মেঘের সংসার কেন হাওয়া এসে ছিন্ন ক'রে গেছে ?
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। রামধনু, উঠবে কিনা বুঝতে পারে না।

খুব মৃদুস্বরে একটা গান শুরু হয়, কিছু পরে
তার শব্দ বেড়ে যায়। কান পেতে শোনো, কান পাতো।

হীনযান

ঝর্ণা ঝিলিক দিয়ে জেগে ওঠে, পাখিদের ত্রস্ত ওড়াওড়ি
ঝোপঝাড় থেকে ক্রমে আকাশের দিকে স'রে যায়।

ভাঙাচোরা গাছপালা, চাঁদের কুহক, পাশাপাশি
মৃদু মাদলের ধ্বনি হৃৎপিণ্ডে শব্দ ক'রে ওঠে।
এই কি নিসর্গচিত্র? ভালোবাসা ভয় দিয়ে ঘেরা?
স্বপ্নে শুরু হয়েছিলো, তারপরে ব্যাপ্ত জাগরণ।

পবিত্র সরকার

শরৎ

পায়ে জলঝাঁঝি মেখে বসে আছে বক,
ডোবার গম্ভীর জলে শ্রান্ত পাট পেতেছে শিথান,
ঈষৎ সাফল্য নিয়ে হাঁটুজলে জেগে আছে ধান,
নৌকোর গলুই থেকে আল্লা জহিরুদ্দীনের শখ
তামাকে গন্ধ হয়ে মিশে যায় চটুল বাতাসে।
শরৎ নিক্ষেপ করে তীব্র রোদ পথের দুপাশে।

এই সব মনে আসে, ছবি, যেন ঋতুর পুষ্পক
উড়ে আসে, যেন পার হয়ে আসে বছর ছত্রিশ,
পৌঁছে দেয় শুশুকের উদ্বর্তন, দেবদারুর শিস,
রঙিন ভগ্নাংশ জুড়ে খাড়া হয় নিঃসঙ্গ বালক।
ভোরবেলার ভিজে ঘাস রেখেছিল পায়ের আদল,
জলের হলুদ সাপ, কেঁপে-ওঠা শিষ্ট পানিফল
শিউলি-বোঁটার মতো ঠোঁট নিয়ে পাখি, ছিল
তারই উপাসক

কোথায়, কবে সে ছিল ? কোন্ দেশে ? কার বংশধর ?
নদী উন্মথিত করে রয়ে গেল নদীর ভিতর,
চড়ায় জলের দাগ মুছে আসে। জল ? না কি
তারই স্বচ্ছ চোখ ?

সব কেড়ে নিয়ে গেছে কে এক নিষ্ঠুর হন্তারক।

CENTRAL LIBRARY

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

অশৌচ

তুমি পুড়ছো মা, আমাদের অশৌচ
আমাদের ছোঁয় না কেউ, ছুঁতে নেই মা মরাদের
আমাদের হাতে তুমি আগুন নাওনি, তবুও পুড়ছো
কোন্ সতীন-ছেলেরা তোমার মুখাগ্নি করেছে ?

আমাদের রুখু পা মাথায় ধূসর চুল
দুহাতে বালির পিণ্ডি
আমরা আণবিক, মা
আমাদের সভায় তুমি দেয়ালে দুলতে
এখন আমরা তাতে মালা দিয়েছি

ত্রিভুজ-শরীর নিয়ে তুমি কেমন পুড়ছো
কন্যাকুমারীর জলে চিতা নেভাবো
অস্থি দেব ভারত সাগরে

আমাদের মা হয়ে তুমি আর এসো না

প্রাস্তিক

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শহীদ হ'য়ে যায়
তাকে ঘিরে আমরা গাই স্বদেশ সঙ্গীত

CENTRAL LIBRARY

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাণিজ্যে যায়
তাকে ঘিরে গোল হ'য়ে ব'সে পড়ি আমরা
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শিকারে যায়
আমরা তার সম্মুখে দাঁড়াই

আর

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রভু হ'য়ে যায়
ওমনি আমরা খুব ছোটো হ'তে আপ্রাণ চেষ্টা করি

দেবব্রত ঘোষ

সংকট

আজকাল রকমারি পোষাক পরছি : সুতি ও সিন্থেটিক্
তবু মনে হয় কেউ আমার গা থেকে
টান মেরে ফেলে দিতে চাইছে সমস্ত পোশাক
তাই আরো জোরে চেপে ধরি বোতাম ও হুকগুলি
কিন্তু এমন নগ্নতাবোধ নিয়ে
ফুটপাত ধরে আমি হাঁটতে পারি না।

বিশ্বাস করো আমার মনে আজও দ্বিধা
শরীরে বিভেদ
আমি সত্যিই এবিষয়ে পুরোপুরি সচেতন
দোহাই তোমাদের, আমার কুশপুত্তলিকা
তোমরা পুড়িয়ো না আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

চিঠি

সম্বোধনে কী শব্দ বসাব ?
কিছু রাগী বদমেজাজী শব্দ মেয়রের চেয়ার উল্টে দিয়ে
মাটির শরীরে এঁকে দিয়েছে সুদীর্ঘ আঁচড়,
চিবিয়ে দিয়েছে মানুষের অস্থি

এ সব শব্দ তোমাকে পাঠানো যাবে না
অবশ্য তাছাড়াও বেশ কিছু তৎসম-তদ্ভব শব্দ আছে
ভারি এবং গম্ভীর যেমন ধরো—
কিন্তু সেগুলোর একটাও পছন্দে আসে না
অতএব আজ
সম্বোধনে কোনো প্রিয় শব্দ মনে নেই

কি লিখব চিঠি

CENTRAL LIBRARY

বিদেশী কবিতা

একটি পারলৌকিক গাথা

এলিজাবেথ জেনিংস

মৃত্যু তো নয় মরণোত্তর আচার
এনে দেয় সেই রুদ্ধ আবেগে মুক্তি।
যে-প্রেম ভাবি নি সত্যি আমার ছিলো
আর যতোসব বিক্ষোভ নিয়ের
এই যে পুরুষ অল্পই যাকে জেনেছি,
তার মৃত্যুই সে-সব দেখিয়ে দিলো।

নয় উন্মাদ বিলাপীর কোন কান্না
নয় সে অতাপ ক্ষেত্র যেখানে মৃত সামগ্রী থাকে,
এ-তো সেই ধীর, গম্ভীর কিছু আমাকে শেখায়,
কোণে দাঁড়ানোর দাবীটুকু আমি পারি না জানাতে।
হুল ফোটানোর এই যে অশ্রু এসেছে—
সন্তাপ থেকে নাকি সংকোচ থেকে ?

কবিতা—শাস্ত্র

আর্চিবল্ড ম্যাকলীশ

স্পর্শগ্রাহ্য আর মূক হওয়া সংগত
একটি কবিতা গোলক ফলের মতো.

আর নির্বাক সে
যেমন প্রাচীন পদক্ষসকল অঙ্গুষ্ঠে.

গরাদবিহীন শৈলজানলা শৈবাল আছে সব
হাতায় ধূসর তার পাথরের মতোই নীরব—

একটি কবিতা শব্দশূন্য হওয়া সঙ্গত
পাখীর ওড়ার মতো।

.....

একটি কবিতা কালের মধ্যে গতিহীন হওয়া উচিত
যেমন চন্দ্র উঠে যায় ঠিক

ছেড়ে চলে যাওয়া, চন্দ্র যেভাবে মুক্ত করে
রজনীগ্রস্ত বৃক্ষসকল শাখা ও শাখান্তরে,

ছেড়ে চলে যাওয়া, শীতের পিছনে চন্দ্র যেভাবে
স্মরণের দ্বারা স্মরণেতে মন ত্যাগ করে যাবে—

একটি কবিতা কালের মধ্যে গতিহীন হওয়া উচিত
যেমন চন্দ্র উঠে যায় ঠিক।

হীনযান

একটি কবিতা যেটার সঙ্গে সমান হওয়াই সঙ্গত
সে নয় সত্য।

দুঃখের যতো ইতিহাস তার জন্য
একটি রিক্ত দেউড়ি এবং একটি মেপল পর্ণ

প্রেমের জন্য
ঝুঁকে পড়া ঘাস আর দুটি আলো সমুদ্রোপরে—

কবিতার কিছু বোঝানো উচিত নয়
কবিতা আদতে হয়।

অনুবাদ : সুভাষ ঘোষাল

স্মৃতিচারণ

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব)

॥ পাঁচ ॥

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে রেকর্ডিং প্রসঙ্গে এক দিনের একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। কেন্দ্রটি তখন অবস্থিত ছিল লাল দীঘির কাছাকাছি গারস্টিন প্লেসে। সালটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে বা কিছু পরে।

সেদিন স্বরচিত কবিতা স্বকণ্ঠে রেকর্ড করিয়েছিলাম কবি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আমি। তাঁর কবিতা এবং পাঠ ভালো লেগেছিল। তাঁর পরে আমি পাঠ করেছিলাম আমার সদ্য লেখা দুটি 'পাগ্‌লা-গারদের কবিতা'। তাদের প্রথমটি ছিল :

পাথরের জনার্দন পাল

পার্কের ঈশান কোণে বসে আছে পাথরের বেদীর ওপর
পাথরের জনার্দন পাল,
মুখে তার সূক্ষ্ম হাসি, ভাঙা দুটি গাল,
পায়ে পাথরের চটি, গায়ে তার পাথরের শাল।

ভাবী ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে
মাথার অনেক ঘাম পায়ে ফেলে জনার্দন পাল
বিশ-ত্রিশ-পতি থেকে হয়েছিল বহুলক্ষ পতি
চড়া দামে বেচে বেচে সস্তা কেনা নানাবিধ মাল।

হীনযান

করেছিল বহু কিছু আমদানি রপ্তানি
মোটা মোটা মুনাফায় পাল জনার্দন,
নিজে রোগা থেকে। তার ছেলেরাই করিছে কাপ্তানি
সে পয়সায়, ছিনিমিনি খেলার মতন।

পাথরের সাদা বুকে কালো কালো অক্ষরেতে লেখা
জনার্দন-কীর্তিকথা আনমনে নিরবে ঝিমায়।
জনারণ্য-মাঝে আহা জনার্দন নিতান্তই একা,
খেয়াল করে না কেহ, তার পানে যদি বা তাকায়।

কত শিশু বড় হয়ে বাবা হলো নতুন শিশুর,
তারপর পিতামহ, তারপর মিশে গেল পাঁচে—
পাথুর বেদীর 'পরে নীরব নিস্পন্দ নির্বিকার
সেই একই চেহারার জনার্দন পাল বসে আছে।

জানি জানি একদিন অক্কা পেয়ে চলে যাবো আমি,
কোথা যাব জানে মহাকাল—
পার্কের ঈশান কোনে তখনও হয় তো বসে রবে
পাথরের জনার্দন পাল।

আমার এই কবিতাটি লেখার পিছনে ছিল স্বাধীন ভারতের একজন মধ্যবয়সী বাঙালী ভদ্রলোকের পরোক্ষ প্রেরণা। কলকাতার 'হেদুয়া' বা 'হেদো' নামে খ্যাত একটি পুকুরওয়ালা পার্কের (ভূতপূর্ব কর্ণওআলিস স্কোয়ার) উত্তর পশ্চিম কোণে একটি পাথরের বেদীর ওপর বসে আছে সেকালের বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী ৺বটকৃষ্ণ পালের একটি পাথরের মূর্তি। মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে এই বাঙালী ভদ্রলোককে মাথা দুলিয়ে বলতে

শুনেছিলাম: "কি হে বটকেষ্টো পাল? তোমার মুখে যে বড় হাসি দেখা যায়!"

ভদ্রলোকের মন্তব্যের উক্তিটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে মনে পড়েছিল ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর একটি কবিতা (The Bishop Orders His Tomb At Saint Praxed's Church), যে কবিতায় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে একজন বিশপ নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের ওপর তাঁর পাথরের তৈরী মূর্তিটি কি রকম হবে।

কবিতাটি রচনার জন্য আমি এই দুজনের কাছে ঋণী। বটকৃষ্ণ আমার কবিতায় জনার্দনে রূপান্তরিত হয়েছিলেন কেন, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

দ্বিতীয় কবিতার নাম ছিল 'ভীষ্ম-বিলাপ'। দুটি কবিতাই 'বেতার-জগৎ' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে পরে আমার ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'এক নদী বহু তরঙ্গ' কবিতা-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আমাদের কবিতাগুলি যিনি বেতার কেন্দ্রের টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড করেছিলেন, রেকর্ডিং-এর পর তিনি প্রশ্ন করলেন, "শুনবেন নাকি কি রকম রেকর্ডিং হলো?"

নীরেনবাবু বললেন, "শোনান।"

শুনলাম। নীরেনবাবুকে বললাম, "আপনার কণ্ঠস্বরটি রেকর্ডে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। রেকর্ডটি শুনে মনে হচ্ছে আপনার নিজস্ব কণ্ঠই শুনছি। কিন্তু আমার রেকর্ডে তো আমার গলার আওয়াজ একেবারেই চেনা যাচ্ছে না।"

নীরেনবাবু হেসে বললেন, "কিন্তু আমরা রেকর্ডে হুবহু আপনার কণ্ঠস্বরই শুনতে পাচ্ছি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার নিজের কণ্ঠস্বর আপনি কখনো আমাদের মতো শুনতে পাবেন না। আমিও আমার নিজের কণ্ঠস্বর যেমন শুনি, আপনারা তার চাইতে অন্যরকম শোনেন। আমরা কেউই নিজের কণ্ঠ অন্যেরা যে রকম শোনেন তেমনটি শুনতে পাই না, কারণ আমরা যখন কথা বলি, চেঁচাই বা গান গাই, তখন আমাদের কণ্ঠস্বর চলে যায় আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উল্টো দিকে।"

ভেবে দেখলাম কথাটি অতি সহজ সত্য, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু আগে কখনো বুঝি নি, খেয়াল করি নি। এই সত্যটি সম্বন্ধে আমাকে প্রথম ওয়াকিবহাল করলেন নীরেন্দ্রনাথ। দুঃখের বিষয় এই বিশেষ ঘটনার সঠিক তারিখটি আমার মনে নেই। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না।

নীরেন বাবুর কথাটি আমার চিন্তাকে বেশ নাড়া দিয়ে ছিল। এর পর থেকে যখন স্নানঘরের নিরালায় আপন মনে স্নান করতে করতে ওস্তাদ আবদুল করিম, ফৈয়াজ, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ সেরা সেরা গাইয়েদের সেরা সেরা গান গাইতাম, তখন আর আশা করতাম না এ গান শুনে আমি যেমন মুগ্ধ হচ্ছি, অন্য শ্রোতারাও তেমন মুগ্ধ হবেনা। এও ভাবতাম যে স্নানঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কেউ আমার গান শুনলে তাঁরা শুনবেন আমার অপটু আনাড়ী কণ্ঠের গান মাত্র, কিন্তু আমি শুনছি আমার গান নয়, সেই মহান শিল্পীদের যাদুভরা গান, স্মৃতির কান দিয়ে আমার অপটু কণ্ঠের গাওয়া আমার মনে তাঁদের অনবদ্য সঙ্গীতের স্মৃতি জাগাবার উপলক্ষ্য মাত্র।

এবার পিছু হটে চলে আসা যাক ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। ঐ মাসের 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় (তখন সম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত দাস) আমার 'ধনপতি পাগ্‌লা' শীর্ষক একটি ১৩০ লাইন লম্বা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তার আরম্ভটি এই রকম :

কাছে ধনপতি পাগ্‌লা :
'অন্যের ঘর অন্যে দেখুক,
নিজ ঘর আগে আগ্‌লা।
বহুদূর হতে এসে
ধীরে ধীরে ছাখ শেষে
প্রাসাদ তুলেছে তোদেরি কুটীর ঘেঁষে
বনোয়ারীলাল বাগ্‌লা।

আমার এই কবিতাটি রচনার মূলে ছিল কলকাতায় (তথা তখনকার বাংলা দেশে) অবাঙালীদের প্রাধান্য (এবং শোষণ) দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে বলে প্রচণ্ড উদ্বেগ। এই উদ্বেগটি প্রকাশ করে বাঙালীদের হুঁশিয়ার করে দেবার উদ্দেশ্যেই কবিতাটি লিখেছিলাম এবং সম্পাদক সজনীকান্ত সেটি অবিলম্বে 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশ করেছিলেন। আমার এই উদ্বেগ প্রকাশের জন্য মুখপাত্র করেছিলাম কল্পিত ধনপতি পাগ্‌লাকে। ই চরিত্রটির মডেলকে দেখেছিলাম ১৯২৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে করোনেশন পার্কে এক অপরাহ্ণ বেলায়।

ঐ মাসে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন দিন কয়েকের সফরে ঢাকা শহরে। বুড়িগঙ্গার বুকে একটি বোটে ছিলেনও দু-এক দিন।

রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করে অতীতের সেই বালক আমি-র মনে হয়েছিল যেন ঈশ্বর দর্শন করলাম। সেই অনবদ্য অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঢাকা থেকে চলে আসার পর বেশ কিছু দিন আমার মনটা বড় উদাস হয়ে ছিল। আমার গেণ্ডারিয়া এলাকায় অবস্থিত বাড়ি থেকে স্কুলে (ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল) আসবার সময়ে 'শর্টকাট' বা সোজা রাস্তা না ধরে করোনেশন পার্ক দিয়ে যাতায়াত করতে শুরু করেছিলাম। করোনেশন পার্কের সবুজ ঘাসের ওপর যেখানে রবীন্দ্রনাথের বিদায়-ভাষণ-মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, স্কুলে যাওয়ার পথে এবং স্কুল থেকে বাড়ী ফিরবার পথে সেখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রবীন্দ্রনাথের অশরীরী সান্নিধ্য অনুভব করতাম।

এক গোধূলি বেলায় স্কুল থেকে ফেরার পথে ঐ জায়গাটিরই কাছাকাছি দেখা হয়ে গেল পূর্বোক্ত পাগলটির সঙ্গে। তার বেশ, হাবভাব ইত্যাদি দেখে মনে হলো সে যেন রবীন্দ্রনাথেরই কোনো নাটকের পৃষ্ঠা থেকে জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। সে আপন মনেই পায়চারি করতে করতে এবং ডান হাতের তর্জনী শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বার বার ঘোষণা করেছিল :

"সম্ভব অসম্ভব হবে।
অসম্ভব সম্ভব হবে॥"

শুনে তখন লোকটিকে পাগল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বহু সম্ভবকে অসম্ভব আর বহু অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে দেখে এখন মনে হয় সে ছিল অসাধারণ দূরদৃষ্টিমান ভবিষ্যৎ-বক্তা।

নিজের চোখে দেখা এই অসাধারণ চরিত্রটিকে মনে রেখেই আমি তাকে দেখার অনেক পরে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'ধনপতি পাগ্‌লা' কবিতাটি লিখেছিলাম বাঙালী কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেবার জন্য।

'শনিবারের চিঠি'-তে আমার এই কবিতাটি ছাপা হবার কিছু আগে 'সচিত্র ভারত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার বিদ্যাসাগরী ভঙ্গীর সাধু ভাষায় লেখা 'কুম্ভকর্ণ' নামক কৌতুকরসাত্মক গল্প ছাপা হয়েছিল, তার সঙ্গে কার্টুন এঁকেছিলেন সেকালের বিশিষ্ট কার্টুন শিল্পী প্রমথ সমাদ্দার, যিনি তার আগে এবং পরে আমার অনেক কৌতুক-গল্পের জন্য কার্টুন এঁকেছিলেন।

'সচিত্র ভারত' নামটি শুনে সাপ্তাহিকটির চরিত্র অনুমান করা যাবে না। কলকাতার পয়লা নম্বর ছাপাখানা আর্ট প্রেস (১৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট) থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটিতে প্রথমে খুব ভালো আর্ট পেপারে ছাপা হতো ভারতের নানা দ্রষ্টব্য স্থান, মন্দির, ভাস্কর্য ইত্যাদির ফোটোগ্রাফ। মালিক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (বিখ্যাত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাই) স্থির করলেন শুধু ছবি ছেপে পত্রিকাটিকে ব্যাপকভাবে আকর্ষক এবং জনপ্রিয় করা যাবে না, অতিশয় মজাদার কিছু গল্প, নক্‌শা এবং বিচিত্রা (ফীচার) প্রতি সংখ্যায় ছাপতে হবে। প্রেসের ম্যানেজার প্রবোধ সমাদ্দার (কার্টুনশিল্পী প্রমথ সমাদ্দারের দাদা) ছিলেন রসিক মানুষ, তিনি লিখতে শুরু করলেন 'কৌতুকী' শীর্ষক একটি চুটকি রঙ্গরসের ফীচার। 'খাপছাড়া' শীর্ষক ফীচার লিখবার এবং নেপথ্যে পাঠ্যাংশের সম্পাদনার ভার নিলেন

সজনীকান্ত দাস। (সম্পাদক রূপে নাম ছাপা হতো মালিক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের।) কিছুকাল পরিমল গোস্বামীও এই দুটি কাজ করেছিলেন। বিশেষ ধরণের কৌতুক, ব্যঙ্গ এবং আজগুবি রসের ছোট গল্প ছাপা হতে লাগল সচিত্র ভারতে, লিখতে লাগলেন বাংলার সেরা ব্যঙ্গ-রসিক লেখকবৃন্দ। দক্ষিণার বাঁধা হার ছিল লেখকের বড়ত্ব ছোটত্ব বিচার না করে গল্প পিছু পাঁচ টাকা। ক্রমে 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় ছবি গৌণ হয়ে লেখাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল, এবং সচিত্র ভারত বিখ্যাত হলো হাস্যরসপ্রধান সাপ্তাহিক পত্রে বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'সচিত্র ভারত'-এর একটি বিশেষ স্থান আছে। দুঃখের বিষয় পত্রিকাটি বেঁচে নেই, বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত অনেক ভালো প্রতিষ্ঠানের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমার 'কুম্ভকর্ণ' গল্পটি যখন সচিত্র ভারতে ছাপা হয়েছিল (১৯৩৭ বা ১৯৩৮, আমার সঠিক মনে নেই) তখন 'সচিত্র ভারত' সাপ্তাহিকের নেপথ্য সম্পাদক ছিলেন পরিমল গোস্বামী।

'কুম্ভকর্ণ' গল্পে লিখেছিলাম মহাবলী রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এক-টানা ছয় মাস ঘুমাতেন, ছয় মাস জেগে থাকতেন। ঘুমের পুরো মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার আগেই ঘুম ভাঙিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল বলেই কুম্ভকর্ণ মারা পড়েছিলেন, ঘুমের মেয়াদটা পুরো করে গেলে বেচারা মরতেন না। সেকালের কুম্ভকর্ণের এই ট্র্যাজিডির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ যুগের কুম্ভকর্ণ বাঙালী জাতিকে বলেছিলাম: "তোমরা এখনি জাগিও না। বাহির হইতে আসিয়া ছাতুখোরেরা তোমাদের দেশের সম্পদ লুটিতেছে, সর্বত্র গ্যাঁট হইয়া বসিতেছে, সোনার বাংলাকে তোমাদের জন্য পিতলের বাংলায় পরিণত

করিয়াছে এবং সীসার বাংলা বানাইবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু তবু তোমরা জাগিও না, আরো ঘুমাও। ভুলিও না অকালে জাগিয়া সেকালের কুম্ভকর্ণের কি দশা হইয়াছিল।"

আমার এই ব্যঙ্গ-গল্পটি পড়ে অন্ততঃ একজন অল্প-বাংলা-জানা 'ছাতুখোর' ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে 'সচিত্র ভারত' সম্পাদকের প্রযত্নে একটি পোষ্ট কার্ডে লিখেছিলেন :

"অ কু ব মহাশয়, আপনি লিখেছেন ছাতুখোরেরা আপনাদের সোনার বাংলা লুঠিয়া লইল। আমি বলিতেছি ছাতুখোরেরা যেমন পরিশ্রম করিতে পারে, পচা চিংড়িখোরের বাপ সে রকম পারে না। তা যদি পারিত তা হোলে ছাতুখোরদের অনেক আগেই হটাইয়া দিতে পারিত। ইতি একজন ছাতুখোর।"

সম্পাদক পরিমল গোস্বামী মহাশয় পোষ্টকার্ডটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পোষ্টকার্ডটি পড়ে বুঝলাম তাঁকে এবং তাঁর জাতভাইদের ছাতুখোর বলেছি বলে পত্রলেখক ছাতুখোর ভদ্রলোক আমাকে এবং আমার জ্ঞাতি-ভাইদের 'পচা চিংড়িখোর' আখ্যা দিয়ে এবং বাপ তুলে ব্যঙ্গ করে গায়ের ঝাল মিটিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের উক্তির সারবত্তা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারা গেল না।

কুম্ভকর্ণ' গল্পের কিছু আগে (অথবা কিছু পরে) 'সচিত্র ভারত' সাপ্তাহিকে আমার আরেকটি ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, যার শিরোনাম ছিল "নিখিল বঙ্গ বাঙালী-বর্জন সমিতি"। তাতে প্রতিটি বাঙালীকে এই সমিতির সভ্য হতে আবেদন

জানিয়েছিলাম। এই সমিতির মহান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী যেন নিজের দেশে ক্রমশঃ আরো বেশী কোণঠাসা হয়ে আসে, তার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে প্রত্যেক বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করা, এবং মটো ছিল : "বাঙালীকে বাঙালী না মারিলে কে মারিবে ?"

নিষ্ঠুর কাঁচ : সুরজিৎ ঘোষ। (করুণা প্রকাশনী। ৫ টাকা)

কবিতার বই নিয়ে কিছু লিখতে বসার একটা আলাদা আনন্দ আছে। কবিতা যিনি পড়তে ভালবাসেন, শুধু কবিতা পড়াটাই তাঁর কাছে একটা লাভ। তাছাড়া যদি শুধু তাই নিয়ে লিখতে হয় তাহলে পড়াটায় আরো মনোযোগ দিতেই হয়। সেজন্য, অন্যথায় যা পেতাম না, তাই হয়তো পেয়ে যেতে পারি। শব্দের যে কৌশল বা কলা নজরে আসেনা. এখন সেটাই খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। এক হিসেবে, এই কবিতা পড়াটা প্রায় কবিতাটি লেখার কাছকাছি পৌঁছে যায়। শব্দের অনুভূতি ধরতে পেরে যে আনন্দ বা যে বেদনা পাই, তা কবির বোধের চেয়ে কেবল অল্পমাত্রায় ন্যূন।

সুরজিৎ ঘোষের 'নিষ্ঠুর কাঁচ' পড়তে গিয়েই এত কথা মনে হল। কারণ, আবিষ্কার করলাম যে আমি অনেকদিন তেমনভাবে কবিতা পড়িনা। ছাত্রজীবনে একটা নতুন কবিতার বই যেমনভাবে পড়তাম, এই বইটি পড়তে গিয়ে আমার সেই প্রথম ভালোবাসার কথা মনে পড়ে গেল।

খিল ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি,
বিষের শৃঙ্গারে ক্লান্ত এলানো মুখচ্ছবি ;
যেন 'এ বিষের নাম অভিমান'—এক্ষুণি ভেঙে যাবে
যদি ডাকি ডাকনামে পুরোনো অভ্যাসে কানে কানে।

পাঠককে বলে দিতে হয় না যে এই কবিতার নাম 'অভিমান' ছাড়া আ কিছু হতে পারে না। ছবিটা সুন্দর এবং করুণ, অথবা করুণ বলেই সুন্দর।

এইরকম ছোট ছোট মর্মভেদী ছবি এতে ছড়ানো আছে। যেমন 'ঘুম' কবিতায় একটা ডুবে যাওয়ার বর্ণনা। এতে ডুবে যাওয়ার চিত্রটা শ্বাসরোধী না হয়ে হয়েছে ধীরে নিভে যাওয়ার মতো।

'সারা শরীর একটুখানি বাতাস চাইছে একটুখানি'—'একটুখানি' শব্দটা দুবার ব্যবহারে কবি বুঝিয়েছেন যে সেটুকু বাতাস আর পাওয়া যাচ্ছে না—ডুবতে ডুবতে নিয়ে এসেছেন স্মৃতির ম্লান বেদনা—'এমন মধুর গানের সভায় সেই শুধু রয় বাকী'—হঠাৎ এই রাবীন্দ্রিক পংক্তিটি লাগিয়ে দিয়েছেন সুরজিৎ ঘোষ। কে সে, যে বাকী রয়? কবি নিজের কথাই বলছেন। কিন্তু এই কবিতার পরে তিনি বাকী থাকতে পারেন না। [পংক্তিটিতে 'সে-ই' কথাটা 'সেই' ছাপা হয়েছে।]

এরকম খুচরো পংক্তি অনেক উদ্ধার করে আনা যায়। 'এমন একলা ফেলে আমায় তোমার কোন সুখে দিন কাটে'—ভারী আশ্চর্য একটি কথা, দুঃখে গাঢ়, ভৎর্সনায় ক্লিষ্ট. হয়তো একটু আহত। অনুরূপ একটি প্রশ্ন রয়েছে আরো একটিতে।

এগারো লাইনের সেই কবিতায় ('কেমন লাগছে তোমার') কবি মনের ভাবকে যতদূর নিয়ে যেতে চান. ততদূর নিয়ে গেছেন. কারণ মিল দেবার বাধ্য এক্ষেত্রে নেই। উৎসবমুখর কোনো বাড়ীতে দাঁড়িয়ে কেউ প্রশ্ন করেছে কাউকে—

দরজার বাইরে ঐ মার্কারির ছায়া নিয়ে মুখে
তুমি কি রকম আছো, এসব কেমন লাগছে. ভালো?

এ প্রশ্নের উত্তর কবিতায় নেই। কিছু বলতে পারা যায় যে এসব

ভালো লাগার কথা নয়, তাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

'ছুটি' কবিতাটিতে মিল দেওয়া আছে, আনা হয়েছে একটি সচেতন ছন্দ। খুবই মামুলি একটি বর্ণনা, কবিতায় লেখা না হলে হয়তো এটি পড়াই যেতো না। তবু এর শেষ স্তবকে বেজে উঠেছে একটি বুক ভরা কান্না—

দেয়ালে খোকার গাবা প্রতিদিন আমায় ডাকে,
'বড় বৌ আর কত কাজ কর, ঘুমোতে এসো।'

স্বর্গত সঙ্গীর ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, যেমন করে শোনা যেতো বেঁচে থাকার সময়ে রাত্রে শুতে যাবার জন্য। 'দূরপাল্লার দৌড়' কবিতায় ফিরে এসেছে ছোটবেলার নানা কথা, যখন শেষ হয়েছে তখনো কোনো যতিচিহ্ন দেওয়া হয়নি—যেন এই দৌড় চলছেই। 'নামভূমিকা'য় মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার একটি ক্যাজুয়াল ভঙ্গী—

মড়া পুড়তে যাওয়ার সময় একজন যায় খাটে চেপে
ফুলের মালা আর নতুন কাপড়ে সেজে,
আর একদল খই ছড়াতে ছড়াতে হরিবোল দিতে দিতে
ইলেকট্রিক চুল্লীর পাশে পৌঁছয়। মোটর
থেকে কান্নায় ভেঙে পড়া কাউকে কাউকে
ধরে নামানো হয়।.....শুধু মামাবাড়ি
বেড়াতে এসে যে ছেলেটা পাশের বাড়ির
অপরিচিত মড়ার সঙ্গে জুটে যায়.....

এই অপরিচিত ছেলেটির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাটকটিতে গাম্ভীর্য

এসে যায়। এসে যায় একটি চিরকালের বিষাদের ছবি।

এত কথা বলার পরেও, বইটির দুয়েকজায়গায় খটকা লাগেনি, এমন নয়। 'তোর জন্যেই' এই নামের কবিতাটিতে, 'উলুবেড়িয়ায় গঙ্গার ধারে', এই পংক্তির পরে যতিচিহ্ন কেন? বা 'আনন্দ' কবিতাটি কি শুধু ছন্দের জন্যই লেখা? এতে কোন সুর লাগেনা। 'অপেক্ষার স্বেদে' এই শব্দচয়নে যেন ছন্দ কাটা পড়ে, শেষ পংক্তিতে 'প্রণতি' শব্দটি 'প্রকৃতি'র সঙ্গে মিল দেবার একটি দুর্বল এবং বোধ হয় ভুল প্রচেষ্টা।

আর একটি কথা, সমস্ত বইটির ভঙ্গীটিতে কোন ওঠাপড়া চোখে পড়ে না। কবি হয়তো তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু কথার মধ্যে স্বরের উত্থানপতনই তো কাম্য। নামকরণটি বোঝাবার জন্য একটি প্রস্তাবনা করা আছে। সেটি বড়ো বেশী প্রতীকী। তাছাড়া এই বইয়ের কাঁচে যেসব ছায়া পরেছে তারা তো নিষ্ঠুর নয়, হয়তো নির্মোহ। মোহহীনতা আর নিষ্ঠুরতা কি এক?

পিনাকী ভাদুড়ী

লীনার বিমান : সুভাষ ঘোষাল। (প্রমা। ১৯৮২। ছ'টাকা।)

আলোচ্য গ্রন্থটি সুভাষ ঘোষালের দ্বিতীয় কাব্যসংকলন, বেরোলো প্রথমটির এক দশকেরও পরে। অন্তর্বর্তী এই এক দশক অবশ্য তাঁর কাব্যচর্চা স্তব্ধ থাকে নি, উপরন্তু বহুপল্লবিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্ম।

বর্তমান গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলিকে স্পষ্ট দু'টি ধরনে চিহ্নিত করা যায়। এক, যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উন্মীলন নেই, অভিজ্ঞতা-সম্পর্কিত কবিতা এ'গুলি। এখানে বিশেষ কোনো পরিস্থিতি মূর্ত না হওয়ায় কবিতার লক্ষ্যবিষয় কবির নিজ কল্প-লোকে যতোটা বিস্তৃত পাঠকের কাছে ততোটা নয়, বর্ণনা ততো বিশদ নয়, যতোটা আভাসিত। এবং অবশ্যম্ভাবীরূপেই চিত্রকল্প এখানে ততোখানি চলমান নয়, যতোটা গুহ্য। আবার, দুই, কিছু রচনা কবিতার অভিজ্ঞতায় বিধৃত। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা হ'য়ে উঠেছে কবিতা। বলাই বাহুল্য, পাঠকের ইনভল্‌ভমেণ্ট অনেক বেশি সম্ভব এখানে এখানে আর প্রথমটির মতো অনাবশ্যক শব্দ-কৌশল নেই, মন্তব্যে বাঁধা পড়েনি কবির অনুভূতি। 'আরো নীরন্ধ্র', 'অনেকের কথা নয়', 'যখন প্রেম, পদাঘাত নেই' এই গোত্রের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।

কিন্তু আলোচ্য সংকলনের কবিতাগুলি যেখানে স্ব-চিহ্নিত, তা হ'লো কবির পার্থিব পরিবেশের সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক অভি-মুখিতার এক তীব্র বিরোধাভাস। শিল্পের দাবি পূরণ ক'রে এই বিরোধাভাস নির্মিতির কাজই এই পর্বের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবিলায় সফল হয়েছেন এই তরুণ কবি। প্রসঙ্গত না বললেই নয় যে এই আধ্যাত্মিক অভিমুখিতা কেবল কবিতাগুলিতে

বহু-উচ্চারিত কৃষ্ণ, রাধা, দশমহাবিদ্যা, ব্রহ্মবাদিনী, বিধাতা, শুদ্ধ স্বক, প্রণাম. চৈতন্য ইত্যাকার শব্দ ও অনুষঙ্গেই নিহিত নয়, বরং মনোলোকের যাত্রাপথে (বিমানে ?) যথার্থ সূচিত হয়েছে তা। অবশ্য সেই যাত্রার (journey) কোনো কংক্রিট রূপ পাওয়া যায় নি এখনো এই উচ্চাশী তরুণ কবির কাছে, যদিও আপাতত মনো-যোগী পাঠকের বোঝার মতো এ'টুকু অবকাশ তিনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন এখানে যে, বস্তুত এই যাত্রাই তাঁর সৃজন-সোপান, এবং আমরা বুঝে নিতে পারি যে সেই যাত্রার ক্রমিক স্তর এখনো অজানা তাঁর, উদ্ভাসিত নয় ততোটা তাঁর কাছেও, যতোটা পাঠকের কৌতূহল দাবি করে। বস্তুত, তাঁর সৃজনী মানস ও অজানা স্তরের মিলনভূমি আসলে এই দুইয়ের অতীত এক বাস্তবতার প্রতীক।—

নদী অম্বরে ডুব দিয়ে প্রস্তুত
মাঝি প্রস্তুত
এমন-কী স্তোত্রগুলি পেয়ে গেছে ডানা।

তবে কেন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছো ?

এই কৃষ্ণনীল হয়ে ওঠে লগ্নে
আমার বুকের ওপর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে
হে দিগ্‌বসনা যাত্রা করো।

('মাঝি প্রস্তুত')

কখনো-বা পূর্বোক্ত বিরোধাভাস অশ্লিষ্ট হয়েছে অবভাস ও বাস্তবের সচেতন দ্বৈততায়। ছন্দের সঙ্গীতে ও স্থাপত্যগুণে ভারি সুন্দর এমন একটি কবিতা 'দিনের মাঝখানে', যার ছ'টি পংক্তি উদ্ধৃত করছি :

সত্যে যতোদিন　　সত্যতা
চাইতে গিয়ে তাকে　　চাইবো না
দিনের মাঝখানে　　ডাকলে কি
পাখিরা হয়ে যায়　　পদ্মটি
পদ্মে ভরে গেছে　　পদ্মজা
মাটির নিচে হাসে　　দেবীর পা ॥

আপাতত বলার কথা হলো, সুভাষের কবিতা ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কয়েকটা সুন্দর পংক্তি নয়, কেবলই দুর্ধর্ষ বিক্ষিপ্ত চিত্রকল্প নয়, নয় শুধু শব্দের ঝংকার বা বর্ণের বিচ্ছুরণ, অথচ এসবেরই সম্মিলিত কারুকৃতি, যার গভীর ভাব ও গড়ন এক অভূতপূর্ব শিহরণ সঞ্চার করে মনে, নিজেকে অনিঃশেষ জানার দুরূহ সাধনে এক শুদ্ধ উপচার হ'য়ে বাজতে থাকে অনুভূতিশীল পাঠকের কানে।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

নাট্যরূপ ও নাট্যরূপদানকারীদের রূপচর্চা

নাটমঞ্চ নাট্যরূপ : পবিত্র সরকার (প্রমা । ১৯৮১ । ২০ টাকা)

ছাপা অক্ষর দূরে থাক্, নাটকের নামে বাংলা নাটমঞ্চে যা-সব হচ্ছে আজকাল, তা নিয়ে কোনো বুদ্ধিদীপ্ত দর্শক যে একটি আস্ত বই লিখে ফেলতে পারেন, আলোচ্য বইটি হাতে পাওয়ার আগে তা ভাবাই শক্ত ছিলো। বরং আলাদা ক'রে অভিনয়, নির্দেশনা, মঞ্চের উপর কারিগরি বিদ্যার কেরামতি—এ'সব নিয়ে বই তবু ভাবা সম্ভব, কিন্তু নাটক? ইচ্ছেসুখ কিছু হাসির কিংবা ক্রোধের সংলাপ বসিয়ে দিলেই নাটক হ'য়ে গেলো? হয়? —আর নাটকই যদি না হ'লো তবে নাট্যরূপই বা কিসের? আলোচ্য গ্রন্থের লেখককে রবীন্দ্রনাথের 'নিসর্গ-নাটক' ছাড়া আর কোনো রচনার নাট্যগুণ নিয়ে ভাবিতে দেখা গেলো না, প্রশ্ন তোলেন নি তিনি বাংলা নাটমঞ্চে হালের প্রযোজিত বস্তুগুলির নাটকপদবাচ্যতা নিয়ে, কোনোরকম বিচারমুখী সমালোচনার মধ্যে যান নি তিনি। আর তাই কেবল উৎপল দত্তের 'তীর'-এর লেখক-কৃত একটি ভাষ্য সংযোজন গ্রন্থের বিষয়-পরিধিতে নিতান্তই অসংলগ্ন বোধ হ'লো। লেখক মূলত নাট্যরূপের তাত্ত্বিক আলোচনাতেই তাঁর গণ্ডি কেটে নিয়েছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে হালের কয়েকটি দলের মামুলি উল্লেখ ছাড়া মূলত তিনি বহুরূপী, পি. এল. টি, নান্দীকার এবং থিয়েটার সেন্টারের কাজ-কারবারের কথা বলেছেন। এবং সেই কথাবার্তা তিনি বলেছেন কলকাতার থিয়েটার-তল্লাটে চলতি বিতর্কসূত্রে; কখনো-বা ঐতিহাসিক ধারা-বিবরণীর ভঙ্গিতে উক্ত দলগুলির নেপথ্য-তথ্যাদি জানিয়ে গেছেন এ'কালের ও পরবর্তীকালের

পাঠকদের জন্ত। সে'দিক থেকে বইটি নাট্যরূপের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার চেয়েও নাট্যরূপদানকারীদের প্রতি অধিকতর নিবেদিত মনে হ'লেও ভুল হবে না কোনো।

বইটি যেহেতু বিভিন্ন সময়ে লেখা লেখকের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন, তাই আলোচনার ধারায় দু'টি ভিন্ন লক্ষণ সুপরিস্ফুট. যদিও বিষয়ের পরম্পরা-বিন্যাসে লেখকের মনোযোগ কিছুতেই পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়। প্রথম লক্ষণটি হ'লো, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু ক'রে সাধারণ নাট্যামোদীদের শিক্ষাকল্পে সংস্কৃত তথা বাংলা নাটমঞ্চের বিবর্তনের পাঠ্যপুস্তকসুলভ আলোচনা, যেখানে লেখক সুদক্ষ সংকলক-টিকাকার ও সুযোগ্য অধ্যাপক; আর দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাটক থেকে সমকালীন লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ ও যাত্রা, অনুবাদ নাটক, এবং 'জাতীয়' নাট্যরূপ প্রসঙ্গে স্বকীয় চিন্তাভাবনা, যেখানে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত ও চিন্তাবিদ্, যুগপৎ শ্রদ্ধেয় এবং বিতর্কিত। —যেহেতু গ্রন্থের ছয় পর্বের সূচীতে পাঁচটিই দ্বিতীয় লক্ষণযুক্ত, তাই বর্তমান পরিসরে ঐ পর্যায়টি আমাদের আলোচ্য।

প্রথমেই আসা যাক্ অনুবাদ বিষয়ক প্রবন্ধটিতে—'স্যার জন ফলস্টাফ ও জলধর'। সুলিখিত প্রবন্ধ। এইটিও লেখা থিয়েটারতল্লাটের চলতি বিতর্কসূত্রে: বিদেশী নাটকের রূপান্তর অভিনয় দেশি নাটকের উন্নতির সহায়ক না প্রতিবন্ধক, রূপান্তর কী ধরনের হওয়া উচিত—'শুদ্ধ অনুবাদ' না ভাবানুবাদ, অর্থ আর জনপ্রিয়তার লোভেই রূপান্তর অভিনয়, নাকি 'আত্মোন্নয়নের' জন্য, ইত্যাদি। লেখকের উত্তরগুলি হ'লো: দেশি নাটকের উন্নতি ব্যাহত হবে না, বরং দেশি নাটকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে।

প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন ১৯৫৬তে অস্‌বোর্নের আবির্ভাবের আগে বৃটিশ নাটমঞ্চে ইংরেজি নাটকের বন্ধ্যাদশায় ইতালীয়-ফরাসী-জর্মন নাটক অভিনয়ের অনুরূপ জোয়াড়ের সংবাদ। রূপান্তরের ধরন প্রসঙ্গে তিনি দিশি মিশেলে ভাবানুবাদকেই সমর্থন করেছেন, এবং এতোটাই জোরের সঙ্গে যে তিনি ব'লে দিয়েছেন, "রূপান্তরগুলিকে মূলত দেশি নাটক হিসাবে গ্রহণ করে তাদের মূল্য বিচার করলে অনেক হৃদয়জ্বালার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।" প্রসঙ্গত তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন জনৈক বাংলা নাটকের ইতিহাস রচয়িতার প্রতি, অবজ্ঞাভ'রে যাঁর নাম বা বইয়ের নাম তিনি জানান নি। সবশেষে, অর্থ আর জনপ্রিতার লোভের অভিযোগও তিনি খণ্ডন করেছেন দু'একটি নাট্যগোষ্ঠীর বিপরীত অভিজ্ঞতার নিরিখে। —থিয়েটার-তল্লাটের চলতি বিতর্কসূত্রেই কেবলমাত্র প্রবন্ধটির জন্ম হওয়ায় আলোচনার পরিধি আশানুরূপ বিস্তৃত হ'তে পারেনি। নতুবা গ্রন্থের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জরুরি আলোচ্য ছিলো যে সুদীর্ঘকাল ধ'রে বাংলা নাটমঞ্চে যে-সব রূপান্তর হয়েছে সে'গুলি কতোখানি "শুদ্ধ অনুবাদ", অথবা ভাবানুবাদে দিশী বাস্তবতার চেহারাটা কী দাঁড়িয়েছে। সেই বিচার আগে না সেরে রূপান্তরগুলিকে "মূলত দেশি নাটক হিসাবে গ্রহণ" করা কি সঙ্গত? আদৌ সম্ভব? — "গ্রহণ করে তাদের মূল্য বিচার"-এর চেয়েও বিচার ক'রে গ্রহণ-বর্জনটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত নয় কি? ভাবানুবাদগুলিতে দিশী বাস্তবতা ও মূল্যবোধের শোচনীয় বিনাশও কি দর্শকদের কম দেখা হয়েছে? বস্তুত, দু'তিনজন ব্যতিক্রম ছাড়া বাদবাকীদের কাজকর্মে সাহিত্যবোধের এতোটাই দৈন্য পরিলক্ষিত হয় যে মনে হয়, এঁরা বোধ হয় আদৌ জানেন-ই না যে নাটক মূলত সাহিত্য।

তবে লেখকের সঙ্গে কেউই দ্বিমত হবেন না যে, রূপান্তরের জন্যে দেশি নাটকের উন্নতি ব্যাহত হবার নয়, বরঞ্চ তাতে দেশি নাটকের উৎকর্ষই সাধিত হয়। এবং বিশ্বসাহিত্য পাঠে আমরা সম্যক অবহিত আছি যে, এক-একটি অনুবাদ কী ব্যাপক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে এক-একটি জাতীয় সাহিত্যে। বাংলা নাটকের কোনো 'ইতিহাস রচয়িতার' কাছে না গিয়েও ১৯৮১-র শুরুতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা কি "মূঢ়তা" হবে যে, বহুরূপী, নান্দীকার তো প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করলো, কিন্তু বাংলা নাটকে তাঁদের অধিকাংশ-সুন্দর রূপান্তরগুলির অভিঘাত কী বা কতোটুকু? কিংবা, এমন যে ব্রেশ্‌ট্-প্রেমের জোয়ার বইলো বাংলা মঞ্চে গত এক দশক ধ'রে, তারই বা কতোটুকু সার্থক অনুরণন ঘটলো বাংলা নাটকে?— অথচ পাশাপাশি এও তো দেখা হ'লো আমাদের যে, বোদলেয়র-র্যাঁবো-এলিয়টের কাব্যানুবাদ কী তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটিয়েছে বাংলা কবিতায়! অবশ্য সেই আগুনের উত্তাপে কতোটা পাকা হয়েছে, আর কতোটাই-বা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, সে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। কিন্তু গন্‌গনে আঁচটা কি টের পান নি আপামর বঙ্গীয় কাব্যরসিক? —পরন্তু, শ্রীসরকারের এ্যানালজি ধ'রেই বলা চলে, ইংরেজি সাহিত্যে একটা শতকও যদি অনুর্বর থাকে, তবু তার কিছু এসে যায় না, প্রতিতুলনায় বাংলা সাহিত্যের পুঁজি এতোই স্বল্প যে তার তিন-চার দশকের বন্ধ্যাত্ব সমূহ দুশ্চিন্তার বিষয় বৈ কি! —শ্রীসরকারের এ্যানালজি বেশি সরল নয় কি? —'Optical illusion' বললে কটূক্তি হবে?

'জাতীয়' নাট্যরূপ' শীর্ষক আলোচনাটিতে ভিন্ন সময়ে ব্যক্ত শম্ভু মিত্রের মতাদর্শ সামনে রেখে শ্রীসরকার তাঁর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। (জনান্তিকে প্রতিবেদন, গ্রন্থের অন্যত্র

শ্রীসরকার কেন যে শ্রীমিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা'র মতো একটি অসাধারণ শক্তিমান আধুনিক বাংলা নাটককে 'ফ্যানটাসি' বলেছেন তা বোধগম্য হ'লো না।) শ্রীমিত্র প্রস্তাবিত 'জাতীয় থিয়েটারের' ফর্মুলার বাঁধনে সৃজনশীল লেখকের অস্বস্তির অবকাশ হয়তো কিছুটা আছে এবং 'জাতীয়' কথাটাও একটু রাজনীতি ঘেঁষা বটে, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের গভীর তাৎপর্য অনস্বীকার্য। শ্রীমিত্র যখন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের থিয়েটারকে 'শিল্প-বাণিজ্যের মতোই ইউরোপ থেকে ধার করা', 'কর্মসংঘাতময়', 'বহির্জীবন-নির্ভর', এবং 'ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুগত হ'য়ে ভাবমূলক নয়' বলে চিহ্নিত করেন, তখন প্রতিবাদে শ্রীসরকার ভারতীয় নাট্যকলার "প্রতিপক্ষ" নয় এমন ইউরোপীয় ভাবমূলক নাট্যধারার সন্ধান দেন স্ট্রিণ্ডবার্গে, মেটারলিংকে, হাউপ্টমানের শেষ দিককার নাটকে, শেখভে, সিঙ্গ বা ইয়েট্‌সের কাব্যনাট্যে, এবং বেকেট ও ইয়োনেস্কোর "অ্যাবসার্ড মার্কা" নাটকগুলিতে। —শ্রীসরকার যথার্থ বলেছেন বটে যে, ঐসব নাটকে "ব্যক্তির বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সমস্যা এসেছে, বাস্তব ও প্রতীকের যুগ্ম ব্যবহার ঘটেছে", —কিন্তু এদের মধ্যে প্রকাশিত জীবনবোধের সঙ্গে কি মেলানো সম্ভব ভারতীয় জীবন-দর্শন? বেকেটের 'অপেক্ষা'-ধারণার সঙ্গে কোনোভাবে মেলে কি রবীন্দ্রনাথের 'অপেক্ষা'র ধরন? উপরোক্ত পশ্চিমী সব নাট্যকারের রচনাই নিশ্চয় ভারতীয় চিন্তার "প্রতিপক্ষ" নয়, কিন্তু তাদের ভিন্নতা অতি স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য। ভারতের নিজস্ব গৌরবময় দর্শন ও সংস্কৃতি, তার বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে যদি কোনো অঞ্জলি কিংবা বৈদেহীকে যথাক্রমে জুলি (স্ট্রিণ্ডবার্গ) কিংবা হেডা (ইবসেন)-র প্রতিরূপ তৈরি করা হয় আজকের সাহিত্যে, তবে তা

কি হবে ভারতীয় বাস্তবতার সম্যক অনুসরণ? এখানকার লেখকের কি জানা জরুরি নয় যে, জুলি-হেডা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পতনোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের নারীদের 'যৌন মুক্তি' আন্দোলনের প্রতিভূ? এমন-কি এখানে ব'সে কেউ যদি এই আদিম বিধ্বংসী ব্যাধিটিকে সৃষ্টিরহস্যের প্রেক্ষিতে এক স্বতন্ত্র সত্যরূপেও দেখতে চান, তবে কি সামাজিক খোল-নলচে পাল্টে সাজাতে গিয়ে বাস্তবের সঙ্গে এক গোলযোগ বাঁধবে না? লেখক চোখে রঙিন কাঁচ চড়িয়ে গোঁজামিল দিয়ে সারতে পারলেও আজকের পাঠককে কি তিনি ভোলাতে পারবেন? মুশকিল হলো সবাই যে পানাসক্ত নয়, আর যারাও-বা পানাসক্ত তারা সবাই মাতাল নয়! —ভারতীয় চিন্তায় ইয়েট্‌স্ অনেকখানি পুষ্ট হয়েছিলেন বটে, তবুও তাঁর কাব্যনাটক কিংবা সিঞ্জ পড়তে-পড়তে ভেসে ওঠে না আয়ার্ল্যাণ্ড ভূ-খণ্ড ও তার জীবন? সুবিখ্যাত সিঞ্জ-বিশারদ এলিস ফার্মর তো ভুলতেই পারেন নি সিঞ্জের রচনার আইরিশ পটভূমি। ভোলা কি সম্ভব কোনো মনোযোগী পাঠকের পক্ষে? —অবশ্যই আয়ার্ল্যাণ্ডকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছেন ইয়েট্‌স্ কি-বা সিঞ্জ, যেমন জর্মনীকে গায়টে, কিংবা ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ, যা কাঙ্ক্ষিত সব মহৎ লেখকের কাছেই। কিন্তু তাই ব'লে ভুলে গেলে চলবে না যে তাঁদের শিকড় প্রোথিত স্ব-স্ব জাতির গভীরে, ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকায় ও জলবায়ুতে। শকুন্তলার তপোবনে রোজালিণ্ড তৈরি হওয়া সম্ভব ছিলো না, যেমন সম্ভব নয় আর্ডেনের বনভূমিতে শকুন্তলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ জরুরি যে, এমন-কি জাতীয়তার সীমানা পেরিয়ে যে তুলনামূলক সাহিত্যের ধারণা বিস্তৃত, সেখানেও গভীর পর্য-বেক্ষণের জন্য জরুরি বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের জাতীয় পটভূমির

সমাক ধারণা, নচেৎ নিছক মিল-অমিল সন্দর্শন নিতান্তই অপরিণত উচ্ছ্বাস থেকে যায়।

পরন্তু, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক নাট্যরূপের প্রসঙ্গে শ্রীসরকারের প্রশ্ন—"এদের মধ্যে কে ভারতের বিশিষ্ট নাট্যরূপ হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করবে ?" —জরুরি মনে হয় না এই কারণে যে, এই নিয়ে তো প্রতিযোগিতার কিছু নেই ! কথা হচ্ছে সৃজন-সম্ভার নিয়ে, সেখানে "প্রতিনিধিত্ব"-র ভাবনা অমূলক নয় কি ? ঐ শব্দটার মধ্যেই মিটিং-ফিটিং-ভোটাভুটি-রাজনীতির দুর্গন্ধ মাখা। আমরা জানি, এরা সবাই ভারতীয়, সবাই ভারত-রাষ্ট্রের সম্পদ। এবং নাট্যরূপের এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত (এবং অভিব্যক্ত) সাধারণ ভারতীয় মোটিফ্। বস্তুত, শ্রীমিত্রও সেই মোটিফ্-এর কথাই বলেছেন, 'মোটিফ্' শব্দটি ব্যবহার না ক'রেও। তা'ছাড়া ভারতের "রাজনীতিক রিয়্যালিটির"-র এখনো এতো বড়ো ক্ষমতা হয় নি তার সুমহান ধর্মীয়-দার্শনিক ধ্যান-ধারণাকে বিকৃত করার, এবং একমাত্র মূর্খের রাজত্ব ছাড়া তা সম্ভবও হবে না। সেই মূর্খের চৈতন্য হোক্ !! এমন-কি যাঁরা মনে করেন আজকের "রাজনীতিক রিয়্যালিটি" বাঙালি নাট্যকারদের প্রধান সম্বল হওয়া উচিত, তাঁরা বস্তুত শিল্পে সৃজনশীলতার দিকটিই উপেক্ষা করেন। তাদের জানা উচিত যে রাজনীতি তথা ক্ষমতার লোভ ও লড়াই জীবনের surface reality মাত্র, তার দ্বারা আর যেই হোক্, সৃজনশীল লেখক আচ্ছন্ন হ'তে পারেন না। রাজনীতি নিশ্চয়ই নাটকে তথা সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার তাগিদেই কেবল। একমাত্র নিকৃষ্ট সাহিত্য-স্রষ্টাই রাজনীতির কাছে তার সৃষ্টিকর্ম বন্ধক রাখতে পারেন। আর তাতে আখেরে লাভ হয় রাজনীতিক ও রাজনীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের। কিন্তু নাট্যকার কি

রাজনীতিকদের mass-media ? এই পত্রিকার পাতাতেই প্রসঙ্গান্তরে যে-কথা বলেছিলাম, পুনরায় তা এখানে বলা চলে— 'রাজনৈতিক সাহিত্য' ততোটাই সাহিত্য, যতোটা সাহিত্য ওষুধের লেবেলে পরিবেশিত ডাক্তারি সাহিত্য (Medical literature)। —বাংলা ভাষায় নাট্যকার ও থিয়েটার কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মী না হোন্ !!!

জাতীয়তার 'বিশুদ্ধতা' প্রসঙ্গেও শ্রীসরকারের দুশ্চিন্তা অমূলক। বলাই বাহুল্য, যে-কোনো বড়ো-সুশিক্ষিত লেখকই তাঁর সৃজনপরিধিতে প্রয়োজনমতো আমদানী করেন বিজাতীয় উপাদান, তাতে তাঁর মৌলিকতা কিছুমাত্র বিকৃত কিংবা অশুদ্ধ হয় না। পাকা সংসারী তিনি, প্রয়োজনমতো ধার ক'রে আবার ধার শোধ ক'রে দেন সময়মতো। আর যারা বেতিসেবী-বাউণ্ডুলে, সংসারী হয়েও সংসার চালাতেই শেখে নি যারা, তারা ধারের পর ধার ক'রে শেষে একদিন নিজের ঘটি-বাটি, মায় দারা-সন্তানাদি বেচে দিয়ে দিগম্বর হয় ! আর্তু জানতেন ভারতীয় কিংবা জাপানী বিড়ালে কতোটা পর্যন্ত গ্রহণ করবেন তাঁর থিয়েটারে, কতোটুকু প্রয়োজন ছিলো তাঁর "cruelty" র এফেক্ট উৎপাদনে। সুতরাং ভারতীয় নাটকে শেক্স্পীয়র আসবেন না, বেকেট না, ব্রেশ্ট্ না, এমন পণ্ডিতী হাঁক দেয়া সম্ভব হ'তে পারে কেবল এ'দেশের কোনো রাজনীতিক বং তার বশংবদ মহাজনদের পক্ষে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি কিংবা অন্য কোনো ভারতীয় নাট্যকারকে দেখতে হবে যে, তাঁদের এনে ঘর ভর্তি ক'রে নিজেকে গিয়ে যেন শেষে রাস্তায় লাইটপোষ্ট ধ'রে না দাঁড়াতে হয় !

আর তার ভাষা কিরকম হবে ? —শ্রীসরকারের এই

প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—হ'তে পারে যে-কোনোরকম, এমন-কি যেমন চেয়েছেন শ্রীসরকার : "রূপকের খোলস ছেড়ে···কখনো খুব রূঢ়, প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ছোঁবে···গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস' যেমন ক'রে ছোঁয়···।" সেইসঙ্গে বর্তমান আলোচকের জরুরি সংযোজন, শ্রীসরকারের উদ্দিষ্ট ভাষাব্যবহারী লেখককেও হ'তে হবে 'লোয়ার ডেপথস'-এর রচয়িতার মতোই সৎ, হ'তে হবে তাঁরই মতো ঋজু, জানতে হবে তাঁরই মতো নিজের দেশকে। কারণ, আমরা জানি, কখনো কোনো অবস্থাতেই গোর্কি নিজের 'রুশী' সত্তাকে ভুলতে পারেন নি। শেখভের 'সী গাল্' কিংবা 'আঙ্কল্ ভেনিয়া'-র নাট্যগুণে মুগ্ধ হ'য়েও তিনি ঐ "দার্শনিক" লেখককে চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর রুশী ভাইবোনদের অন্য প্রয়োজনের কথা। প্রয়োজন-ভিত্তিক সৃষ্টিকর্ম কতোদূর সার্থক সে'সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থাকলেও এখানে বলার কথা হ'লো, জীবন ও সাহিত্যের চিন্তনে ও চর্যায় কোনো ফাঁকি ছিলো না গোর্কির। ভারতীয় লেখকের কাছে এই সততার দাবি আজ জরুরি। কারণ, আঁতলামির ভেল্কিতে নষ্টামির নজির বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমাদের চোখে দেখা হয়েছে। ভারতের সর্বক্ষেত্রেই আজ মেরুদণ্ডি মানুষের বড়ো আকাল!

এতোক্ষণ কেবল মতভেদের কথাই বলা হ'লো। এবার জানাই অপূর্ব তৃপ্তিদায়ক প্রবন্ধটির কথা—'নিসর্গ-নাটক ও রবীন্দ্রনাথ'। আলোচ্য গ্রন্থের সবচেয়ে উজ্জ্বল তো বটেই, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ ভাবনার অন্বেষণে শ্রীসরকার এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন সুগভীর অভিনিবেশে পুরাণ বিচ্যুয়াল ও সময় সম্পর্কে প্রাচী-প্রতীচীর তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে তিনি উদ্ঘাটন করেছেন রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের এক জরুরি স্তর। তাবৎ

রবীন্দ্ররসিকদের অবশ্যপাঠ্য এই প্রবন্ধটি।

'কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার' ও 'যাত্রা' সুন্দর দু'টি ডক্যু-মেণ্টারি আলোচনা। একদা একটি নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে সহজেই তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন থিয়েটার ও যাত্রার বিবিধ সাংগঠনিক এবং গ্রীনরুম-তথ্য ও সমস্যাদি। পরিবেশন-ভঙ্গিতে লেখকের খোলা মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও কখনো-কখনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রচ্ছন্ন থাকে নি (যেমন, পৃঃ ১৮২, লাইন : ২০—২৫)। সম্প্রতি কলকাতার থিয়েটার-তল্লাটে 'অঙ্গনমঞ্চ' নিয়ে যে-তাত্ত্বিক বিতর্ক (না বিবাদ ?) চলছে, তাতে শ্রীসরকারের সাম্য স্থাপনের প্রয়াস যুক্তিযুক্ত ও প্রশংসার্হ। —"আমার মতে প্রসেনিয়াম ও অঙ্গন-মঞ্চের মধ্যে কোনো either-or সম্পর্ক নেই। একটির বিনিময়ে বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়" —এর পরেও যদি কেউরা এই বিবাদ-বিতর্কে লিপ্ত থাকেন, তবে তা হবে কাজের বদলে নিছকই খই ভাজা। অবশ্য খই ভাজাও একটি কাজ বটে, তবে তেমন কাজের আর কোনো দরকার নেই বর্তমান বাংলা নাট্যজগতে।

সবশেষে বলা জরুরি, মতভেদের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থটি এ'কালের বাংলা থিয়েটারের একটি মূল্যবান দলিল, যা এ'কালের ও পরবর্তীকালের প্রতিটি বাঙালি নাট্যরসিকের অবশ্যপাঠ্য।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

CENTRAL LIBRARY

প্রসঙ্গ ঃ বাংলা গ্রুপ থিয়েটার

'হীনযান'-এর প্রশ্নাবলী

১। আমাদের নাট্যগোষ্ঠী কবে স্থাপিত হয় ?

২। ক) গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা কত ? অভিনেত্রীরা কি সদস্যা, নাকি বেতনভোগী ?

খ) ক'জন পরিচালক ? নাম কী ?

গ) সদস্যদের চাঁদা দিতে হয় ? হ'লে চাঁদার হার কত ?

ঘ) শো-এর জন্যে অর্থ সংগৃহীত হয় কীভাবে ?

৩। ক) কল্-শো পান ? তা কী ধরনের ? বছরে ক'টি, কোথেকে পান ?

খ) মাসে/বছরে ক'টি শো হয় ?

গ) এ'যাবৎ কোথায় কোথায় নাটক করেছেন ? কলকাতায় কোন্ কোন্ মঞ্চে ?

৪। আপনাদের দল গঠনের বিশেষ উদ্দেশ্য কী ছিলো ? উদ্দেশ্য রূপায়নে কতোটা সাফল্য দাবি করতে পারেন ? সমকালীন বাংলা থিয়েটারে আপনাদের দলের বিশেষ ভূমিকা কী ?

৫। এ'যাবৎ মোট ক'টি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন ? —ক'টি মৌলিক এবং ক'টি তর্জমা ? (মৌলিক নাটকের নামের সঙ্গে নাট্যকারের নাম, এবং তর্জমার ক্ষেত্রে অনুবাদক এবং মূল নাটক ও নাট্যকারের নাম উল্লেখ করবেন ।)

৬। ক) তর্জমা নাটক মঞ্চস্থ করার পিছনে যুক্তি কী ছিলো ?

খ) তর্জমা কি মূল ভাষা থেকে হয়েছিলো, না কোনো তর্জমারতর্জমা ?

CENTRAL LIBRARY

গ) তর্জমার ক্ষেত্রে বিদেশী না বাংলা ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নাটককে প্রাধান্য দিয়েছেন? আপনাদের যুক্তি কী ছিলো?

৭। নাটকের অনুবাদ তার ভাবানুবাদের মধ্যে বাংলা মঞ্চে আজ কোন্‌টি জরুরি ব'লে আপনাদের ধারণা?

৮। স্বাধীনোত্তর বাংলা নাট্যমঞ্চে বিদেশী নাটকের অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদের প্রভাব কতোখানি?

৯। বাংলা মঞ্চে বিদেশী নাটকের অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ কীভাবে বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার ক্ষেত্র উর্বর করতে সক্ষম ব'লে আপনাদের ধারণা?

১০। বাংলা থিয়েটারে পূর্বসূরীদের কাছে আপনাদের ঋণ কতোটা?

১১। বর্তমানে বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতিতে অঙ্গনমঞ্চ কতোদূর সহায়ক হ'তে পারে ব'লে আপনাদের ধারণা? আপনাদের অঙ্গনমঞ্চে নাটক করার কোনো নিকট কি সুদূর পরিকল্পনা আছে?

১২। মৌলিক নাটক অভিনয়ে নাটকের শৈল্পিক মান না 'কাউন্টার ক্রাউড' আপনাদের বিবেচ্য? দলের অস্তিত্ব রক্ষায় কাউন্টারের সঙ্গে কী ধরনের কম্প্রোমাইজ আপনাদের জরুরি?

১৩। গ্রামে নাটক করার প্রসঙ্গে আপনাদের মতামত কী?

১৪। রবীন্দ্রনাটকের পাঠক হিসেবে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী?

১৫। কেন রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চরূপ নিয়ে 'বহুরূপী'র পর আর কাউকে তেমন ক'রে ভাবতে দেখা গেল না?

১৬। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'নবান্ন' যেমন পালাবদলের পুরোহিত, 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কি সেই একইরকম গুরুত্বে পরিপূর্ণ?

১৭। নাটকের দল ভেঙে দল হচ্ছে। —এই ভাঙন কি মূলত সৃজনধর্মী? এর দ্বারা নাট্যান্দোলন কী গতি লাভ করছে?

১৮। একটি নাটক মঞ্চে নামানোর যে ভাবনা, সেই ভাবনার ক্ষেত্রে 'দলগত অভিনয়' এবং 'ব্যক্তিগত অভিনয়'—এই দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টির ওপর বেশি নজর দেবার কথা ভাবেন?

১৯। বাংলা ভাষায় সার্থক নাটক লেখা যে হচ্ছে না, এর পেছনে বলার মতো কোনো কারণ খুঁজে পান? 'চাঁদ বণিকের পালা'-কে কতোটা অভিনন্দনযোগ্য মনে করেন?

২০। কাব্যনাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে আপনারা কখনো ভেবেছেন?

থিয়েটার কমিউন

এক ॥ ১ জুলাই, ১৯৭২, থিয়েটার কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুই (ক) ॥ থিয়েটার কমিউনের সদস্য সংখ্যা ২০। আমাদের গ্রুপ থিয়েটারে অভিনেত্রীরা মূলত অর্থনৈতিক কারণেই থিয়েটার করতে আসেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রধানত ছেলেরাই নাটা-আন্দোলন চালিয়ে যায়।

(খ) ॥ পরিচালক একজন। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

(গ) ॥ সদস্য হলে চাঁদা দিতেই হয়। প্রতি মাসে এক টাকা।

(ঘ) ॥ পূর্ববর্তী প্রযোজনার জমানো ভাণ্ডার থেকে।

তিন (ক, খ, গ) ॥ আমন্ত্রিত অভিনয়ের ওপর গ্রুপ থিয়েটারের অর্থনৈতিক কাঠামো অবশ্যই খানিকটা নির্ভর করে। সারাবছরে আমন্ত্রিত অভিনয়ে মোটামুটি কমবেশী ব্যস্ত থাকতেই হয়। মফঃস্বল শহর, শিল্প-নগরীসমূহ খুব বেশী ভেতরে না হলেও বেশ কিছু গ্রামাঞ্চল, প্রতিবেশী রাজ্য সমূহ ইত্যাদি জায়গায় আমরা অভিনয় করে থাকি।

থিয়েটারের schedule-টা বদলে গেছে। ষাট-এর দশকে যখন কোনো গোষ্ঠী সপ্তাহে একটি করে অভিনয় করতেন, আমরা তখন তাঁদের বেশ ব্যস্ততম দল বলেই মনে করতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু আমাদের এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে 'লিপইয়ার' বাদ দিয়ে

ফেব্রুয়ারী মাসে ২৮ দিনের মধ্যে ১৯টি দিন show করেও থিয়েটার কমিউন মনে করেছে সে খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

এ যাবৎ বহু জায়গায় অভিনয় করেছি। সব জায়গার নাম লিখতে

'দানসাগর' নাটকের একটি দৃশ্য

গেলে অনেক জায়গার দরকার হবে। কলকাতায়—একাডেমি মঞ্চে, রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, শিশির মঞ্চ, বিদ্যামন্দির, শ্রীশিক্ষায়তন, মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গালয়, অহীন্দ্রমঞ্চ, অরুনমহল, বিজন থিয়েটার, রঙ্গনা, ষ্টার, রঙমহল, বাসুদেব মঞ্চ, মিনার্ভা, প্রতাপ মঞ্চ, এইসব মঞ্চে আমাদের নাটক অভিনীত হয়েছে।

চার ॥ সময়ের সঙ্গে কৃতঘ্ন সম্পর্ক স্থাপন করবো না। আমাদের শিল্পমাধ্যম হবে—নাটকাভিনয়। তাবৎ দুনিয়ার প্রখ্যাত সমস্ত নাটাকারই 'আমাদের' নাট্যকার হবেন না। নিজেদের নাটাকার-পরিচালক-অভিনেতা-অভিনেত্রী তাবৎ কলাকুশলীকে আমরা বেছে নেবো। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের তীব্রতম স্রোতগুলিকে আমাদের চিন্তা চেতনা- অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করে নিয়ে নাট্যাভিনয়ে রূপ দেবো। সাফল্য অবশ্যই, সোচ্চার দাবী করতে পারি। হ্যাঁ, নাটক করে মানসম্মান, বাংলার নাট্য-আন্দোলনে প্রথম সারির দল হিসেবে পরিচিতি, লোভনীয় বেশ কিছু পুরস্কার অর্জন করেছি, তৎসহ গত বছর প্রযোজনার জন্য "দশবছরের নাট্য-প্রযোজনায় বিশিষ্ট অবদান"-শীর্ষক পুরস্কারে বামফ্রন্ট সরকার থিয়েটার কমিউনকে সবিশেষ স্বীকৃতি জানান। রেডিও-টি-ভিতে আমন্ত্রিত অনুষ্ঠান করা, ভারতের জাতীয় নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ—'কলকাতা নাটাকেন্দ্র'র "গালিলেওর জীবন"-এ সক্রিয় অংশ নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের কৃতকর্ম।

পাঁচ ॥ এ'যাবৎ মোট সাতটি নাটক মঞ্চস্থ করেছি।

১। বিভুর বাঘ—উইলিয়ম স্যাবোয়ানের উপন্যাস 'ট্রেসিস টাইগার' অনুপ্রাণিত ॥
নাট্যরূপ—নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত

২। পরবর্তী বিমান আক্রমণ—মূল নাটক বোশেফ হেলরের "উই বম্বড্ ইন ব্রা হ্যাভেন" ॥ অনুবাদ—তরুণ ঘটক ও নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

৩ স্বদেশী স্বক্সা--মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

৪ কিং-কিং—নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

৫। দানসাগর—মূল গল্প : মুন্সী প্রেমচন্দের 'কফন'। নাট্যরূপ দেবাশিস মজুমদার।

৬। প্রস্তুতি—নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

৭। জীবিকা—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অনুপ্রাণিত। নাট্যরূপ – নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

ছয় (ক) ॥ তর্জমা নাটক বলতে নিশ্চই আপনি অনুবাদ নাটক বোঝাচ্ছেন ? অনুবাদ, ভাবানুবাদ, ছায়াবলম্বন, কাহিনীসূত্র অনুপ্রেরণা: এই বিভিন্ন খাত বয়ে, তা সে যে নাটকই তৈরী করা হোক, তার পেছনে যুক্তি একটাই নাট্যাভিনয়কে অব্যাহত রাখা। বাংলামঞ্চে একটি অনাস্বাদিত নাট্যফুল উপহার দেওয়া। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নাট্যধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করার এক সুকঠিন ও সৎ প্রচেষ্টা। আর অন্যতম বড়ো কারণ, নাটকের বড়ো আকাল।

(খ) ॥ তর্জমা মূল ভাষা থেকেই হয়েছিলো।

(গ) ॥ অনুবাদ নাটক থিয়েটার কমিউন একটিই করেছে। তবে তুলনায় কম শক্তিমান হলেও আমরা বাংলার ও প্রতিবেশী রাজ্যের নাট্যকারদেরই ভালোবাসতে চেয়েছি। যেমন, একথা বেশ জোড়দিয়েই বলা যায় Performing Medium-এ আমরাই প্রথম মুন্সী প্রেমচাঁদকে জনপ্রিয় করেছি, যদিও 'কফন' একটি ছোটগল্প।

সাত ॥ বাংলামঞ্চে এখন যেটি সবচেয়ে বেশী জরুরি এবং অতীব প্রয়োজন সেটা হলো বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বাদের নাটকের সামাজিক এবং শৈল্পিক দায়িত্বপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন অভিনয়। অনুবাদ,

ভাবানুবাদ-এর প্রসঙ্গে বলা যায়, সেটা নির্ভর করবে মূলত নাট্যকার ও নাটকের উপর।

শেক্সপীয়র-এর নাটকের ভাবানুবাদ ভাবা যায়? ব্রেশট্-এর নাটকের ভাবানুবাদ অংশ্যই কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু অবলীলা-ক্রমে সিয়ান ও কেসি, শ্ব, চেকভ্, ওয়েসকার, পিরানদেল্লো, ক্লিফোর্ড ওডেট্স্ দিবিা ভাবানুবাদের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে তার আশ্চর্য সব শিল্পসৌকর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। বাংলামঞ্চে আজ সবচেয়ে জরুরি হলো নাটক—নাটক—আরো নাটকের অভিনয়। ভাবানুবাদ, অনুবাদ এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ৫০ বছর বাদে ভাবলেও চলবে।

আট ও নয় ॥ বাংলা রঙ্গমঞ্চের বয়স সবে একশ বছর পেরোলো। আক্ষেপ বা ব্যাজস্তুতি কোনদিকেরই পাল্লা ভারী না করে একথা বলা যায়, বাংলা মৌলিক নাটকের আজ বড় অভাব। গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলালের পাতায় পাতায় যখন আমরা নানা চেহারায় নানা ভঙ্গিমায় শেক্সপীয়রকে বিরাজমান দেখি, শ্রদ্ধেয় নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী মহাশয়ের কতিপয় নাটকে যখন মূল বিদেশী নাট্যকারের নাম উল্লেখ থাকে না, বা একেবারেই হাল আমলের বাদল সরকার মহাশয়ের কোনো কোনো নাটকে যখন মূল বিদেশী নাট্যকারের সামান্যতম Acknowledgement-ও থাকে না, তখন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হয় due acknow-ledgement জানিয়ে বাংলামঞ্চে বিদেশী নাটকের প্রভাব যদি বেড়েই থাকে, ভয় বা আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।

ক্রস্-ফার্টিলাইজেশন্ না হলে যেমন ভূমি উর্বর হয় না, ঠিক তেমনি বাংলা নাট্য-আন্দোলনও পরোক্ষভাবে উপকৃত তো হচ্ছেই। ভাবা

যায়, নান্দীকারের "নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র", কিংবা থিয়েটার ওয়ার্কশপের "ছায়ায় আলোয়", নক্ষত্রের "মৃত্যুসংবাদ" চতুর্মুখের "জনৈকের মৃত্যু", বহুরূপীর "পুতুল খেলা" এবং "দশচক্র" —আমাদের থিয়েটারের গোটা আন্দোলনটাকে ধরে কি প্রচণ্ড-ভাবেই না নাড়িয়ে দিয়েছিলো! এই শতাব্দীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিনিয়াস্ বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্ তামাম দুনিয়ার থিয়েটারী ধ্যানধারণায় যে-নতুন মাপকাঠি, মাত্রা সংযোজন করেছেন, চিন্তা-চেতনার জগতে যে ব্যাপক আন্দোলন জাগিয়েছেন, অবশ্যই নাট্যরচনার ক্ষেত্রে, নাট্যপরিচালনার ক্ষেত্রে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে, সর্বোপরি থিয়েটারের ক্ষেত্রে, তাঁর কাজ আমাদের পথ দেখাবে। তাঁকে আমরা প্রয়োজনে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে নেবো। এতে করে বাংলা থিয়েটার অবশ্যই আরো স্বাস্থ্যবান হবে—গতিশীল হবে—নতুন নতুন পথ খুলে যাবে। চার্লস্ ম্যারোভিচ্ যদি শেক্স-পীয়রকে কেটেছেঁটে "হ্যামলেট কোলাজ" করতে পারেন, তাহলে ব্রেশ্‌ট্-এর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমরাই বা রসদ সংগ্রহ করবো না কেন? তাতে তো বাংলা থিয়েটারেরই মঙ্গল।

দশ ॥ শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের ঋণকে অস্বীকার করা আর সময়ের সঙ্গে কৃতঘ্ন সম্পর্ক স্থাপন করা একেবারেই তুল্যমূল্য। তবে ঋণের পরিমাণ কতোটা তা কখনো মেপে দেখার অবকাশ পাই নি।

এগারো ॥ থিয়েটারের ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ এবং তার পরি-সরকে আরও ব্যাপ্তি দিতে অঙ্গনমঞ্চ অবশ্যই খানিকটা সহায়ক। বিশেষত থিয়েটারের আর্থিক দায় ওখানে অনেক কম। খুব স্বল্প পরিসরে হলেও ওদের আর্থিক কাঠামোর খানিকটা স্বয়ং সম্পূর্ণতা-

তো আছেই। পাশাপাশি দুটোই চলুকনা! কে কার থেকে কত বেশী লাভবান হবে, সময়ের হিসেবে তা নিজেই পরিস্কার হয়ে উঠবে। অঙ্গনমঞ্চে নাটক করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

বারো ॥ "কাউন্টার ক্রাউড্" বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন তার খানিকটা ভাসাভাসা আন্দাজ পেলেও পুরোটা বোধগম্য নয়। দর্শকবাদ দিয়ে কোন নাট্যপ্রযোজনার কথা কেউ কখনও ভেবেছেন বলে শুনিনি শৈল্পিক মানের সঙ্গে popularity-কে আমরা অভিন্ন চোখে দেখি। আর popularity মানেই কাউন্টারে তার প্রতিফলন অবশ্যই ঘটাতে বাধ্য।

তেরো ॥ দেশের আশিভাগ মানুষ যেখানে থাকেন, আমাদের নাটক নিয়ে যদি সেখানে নিয়মিত যেতে পারতাম তা'হলে নিজেদের আরও বেশী গৌরবান্বিত ও সম্মানিত ভাবতে পারতাম। এই কথাটা বলে নিজেদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার ঝোঁকটা বোঝাতে চাইছি। কিন্তু আমাদের দলীয় যে কাঠামো তাতে করে, কখনও কখনও প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায়, সেখানে গেলেও বা যাবার বাসনা থাকলেও নিয়মিতভাবে তা এক্ষুণিই সম্ভব বলে মনে করি না।

চোদ্দ ॥ দু-একটি নাটক বাদ দিলে, অপরাপর রবীন্দ্র-নাট্যের প্রযোজনার কথা ভাবতেই পারি না।

পনেরো ॥ সাহস, ক্ষমতা, শৈল্পিক উৎকর্ষ এগুলিই হয়তো রবীন্দ্রনাট্য নির্বাচনের সামনে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। সমকালীনতার প্রশ্নতো আছেই। আমাদের মনে হয় এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাট্যের ভাষাও একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের ভাবতে হবে।

ষোল ॥ যে-ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলা থিয়েটারে "নবান্নের" উন্মেষ, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যার আগমন ছিলো অবশ্যম্ভাবী, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বাইরে "নবান্ন" নাটক যে-সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে এসে হাজির হয়েছিলো, "এবং ইন্দ্রজিৎ" ঠিক সেই একই রকম গুরুত্ব কোনো মতেই দাবী করতে পারে না। নাট্য-আন্দোলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার তাগিদে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ প্রেরণায়, যে-"নবান্নে"র জমি উর্বর হয়েছিলো, "এবং ইন্দ্রজিৎ"-এর ক্ষেত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। ফ্যাশান বা রুচিবদল নিশ্চই Tradition-উদ্ভূত নয়। আজ "নবান্নের" প্রভাবে প্রভাবান্বিত বাংলা থিয়েটারে নাটকের সংখ্যা দেখুন আর ফ্যাশানের উল্লাসে "এবং ইন্দ্রজিৎ"-ধর্মী নাট্যপ্রযোজনাই বা কটি তার সংখ্যা দেখুন। জীবনের absurdity ইউরোপীয় জমিতে যতোখানি অবশ্যম্ভাবী ও নিরতিশয় বাস্তবরূপসম্মত, বাংলার মাটিতে তার আমদানী নিতান্তই ফ্যাশান তাই নয় কি ?

সতেরো ॥ বৈজ্ঞানিক কারণে যদি দল ভেঙে দল হয় তা'হলে তা সব সময়ই অভিনন্দনযোগ্য। এর ফলে আমরা একদিকে যেমন নতুন নতুন দল, নতুন নতুন প্রযোজনা, নতুন নতুন প্রতি-শ্রুতি-সম্পন্ন নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সন্ধান পেয়েছি, ঠিক তেমনিই, কখনো কখনো তাঁদের অনেকেই আবার দল ভাঙার জন্যই স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। পারস্পরিক বিদ্বেষ, অসূয়াপ্রসূত মনোভাবকে সৃজনশীলই বা বলি কি করে ? আবার পুরোনো দল ভেঙ্গে নতুন নতুন দল হওয়ায় নাট্য-আন্দোলন যে স্রোতোস্বিনীর তীব্রতা পেয়েছে, তাকেও অস্বীকার করা যায় না।

আঠারো ॥ পরিচালক নিতান্ত গবেট না হলে সব সময়ই তাঁর

দৃষ্টি থাকে টোটাল এফেক্ট-এর ওপর। আমাদের বেশীর ভাগ নাট্য-প্রযোজনাই দলগত অভিনয়-নির্ভর। ঠিক তেমনি যদি কোনো নাটক পাওয়া যায়, যা একান্তই ব্যক্তিগত অভিনয় শৈলীর ওপর নির্ভরশীল, তাকেও একই ভাবে অভিনন্দন জানাবো। তবে বলার কথা হলো এই — সময়, শিল্পীর কাছে তার প্রত্যাশা, তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবী — আমাদের নাট্য-প্রযোজনা কখনোই এইগুলি বাদ দিয়ে নয়। আর এ'কথা স্মরণ রেখেই আমাদের বলতে হবে, শিল্পীর নিজের কাছেও কিছু নিজের অনেক প্রত্যাশা থাকে!

উনিশ ॥ বাংলাভাষায় সার্থক নাটক লেখা হচ্ছে না—একথার মানে কী? সিরিয়াস গ্রুপ থিয়েটারগুলো কী নিয়ে এতোবছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে? সেগুলো তো বাংলা ভাষায়ই লেখা হয়েছে। নয় কি? আর যদি বলেন বাংলাভাষায় সার্থক মৌলিক নাটক লেখা হচ্ছে না, তাহলে বলব—হ্যাঁ, কথাটা খানিকটা সত্যি বৈকি! মৌলিক নাটকের এখন বড়ো আকাল, তবে অত্যন্ত আশার কথা এই—বিগত দশ/পনেরো বছরের মধ্যে বেশ কিছু সার্থক বাংলা মৌলিক নাটক নিশ্চয়ই লেখা হয়েছে। নাম করেই বলি—"হে সময় উত্তাল সময়", "চাক ভাঙ্গা মধু", "অশ্বত্থামা", "রাজরক্ত", "টিনের তলোয়ার", "সওদাগরের নৌকা", "মারীচ সংবাদ", "অমিতাক্ষর", "কলকাতার হ্যামলেট", "কেন্দ্র-বিন্দু", "প্রস্তুতি" ইত্যাদি আরও অনেক নাটকের নামই করা যায়। এগুলি অবশ্যই বাংলাভাষায় লেখা সার্থক নাটক। উল্লেখযোগ্য সব মঞ্চসকল প্রযোজনা। "চাঁদবণিকের পালা" অন্যতম মৌলিক নাটক হিসেবে বাংলা থিয়েটারে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের জীবনদর্শনের সঙ্গে তা মিলুক চাই নাই-ই মিলুক। সত্যকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

কুড়ি ॥ মাঝে মাঝে অনেক কিছুই ভাবি। কাব্য-নাটক, ছায়া-নাটক (shadow play), নির্বাক নাটক, কিছু পাপেট, কিছু জ্যান্ত চরিত্র ইত্যাদির পাঁচ-মিশেলে অদ্ভূত অদ্ভূত সব আইডিয়ার কথা মনে হয়। যেমন, কোথাও পাপেটগুলো পরিস্কার মানুষের গলায় কাব্যনাটকের মেজাজে কথা বলছে, আবার কোথাও মানুষগুলো পাপেটের চেহারায় মিকি-মাউসের মতো কথা বলছে। অনেক কিছুই করতে ইচ্ছা হয়। তবে বোধ হয় কোনোটাই করবো না। কিংবা, করবো কিনা এখনও জানি না।

থিয়েট্রন

১। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৪-এর শেষভাগে। কিন্তু '৭৫-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত এক নিদারুণ বন্ধ্যাত্ব আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যে-দিনটি থেকে আমরা সত্যি-সত্যিই কাজ শুরু করতে পেরেছিলাম, সেই '১৪ই এপ্রিল ১৯৭৭'-কেই আমাদের প্রতিষ্ঠা-দিবস হিসেবে মানি আমরা।

২। ক) কুড়ি জন। অভিনেত্রীরা সদস্যা।

খ) এখন পর্যন্ত দু'জন পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন—সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ সেন।

গ) সদস্যের চাঁদা দিতে হয়, তবে বাধ্যতামূলক নয়। উপার্জনশীলদের ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা, আর অন্যদের বেলায় তিন টাকা।

ঘ) ধার করে, টিকিট বিক্রি করে, আর বিজ্ঞাপনের টাকায়।

৩। ক) গ্রহণযোগ্য 'কল্-শো' এখনো পাইনি।

খ) বছরে ছয় থেকে আট। এর বেশি এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

গ) আকাদেমী, শিশির মঞ্চ, মুক্ত-অঙ্গন ও বিজন থিয়েটারে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আউটরাম ঘাটের এক প্রভাতী-অনুষ্ঠানে নাটক-পাঠ করেছি আমরা।

৪। 'ভারতীয়'-নাটক করা। এমন বিষয়, যার মর্মে পৌঁছোনো যায় অনায়াসে; এমন আঙ্গিক, যা আমাদের মাটির সঙ্গে রক্তের সঙ্গে চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অবশ্যই সেই নাটককে সৎ হতে হবে। সেই নাটকে থাকতে হবে এক শাশ্বত আবেদন এবং

মানবজীবনের কোনো গূঢ় সত্যের মুখোমুখি হবার সনিষ্ঠ প্রয়াস।
'ভারতীয় নাট্য'-এর স্বরূপ সন্ধান আমাদের ব্রত।
এখন পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র শুরুটুকুই করতে পেরেছি। উদ্দেশ্যের রূপায়ণের জন্ত আমাদের আরো অ-নে-ক পথ যেতে হবে।
যে-কোনো সময়ের নাট্যচর্চায় কোনো এক বিশেষ নাট্যগোষ্ঠীর ভূমিকা যে ঠিক কী, তা' একমাত্র একজন ঐতিহাসিকই নির্ণয় করতে পারেন। তবু হয়তো বলা যেতে পারে যে, আমরাই সম্ভবত একমাত্র নাট্যগোষ্ঠী যারা নিয়মিতভাবে কাব্যনাটক প্রযোজনা করেছি এবং ভারতীয় নাট্যের স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী।

৫। আটটি। চারটি মৌলিক, তিনটি ভাবানুবাদ ও একটি অনুবাদ।

মৌলিক	ভাবানুবাদ
চলচ্চিত্ত চঞ্চরী—সুকুমার রায়	কবয়ঃ—বনফুল
প্রথম পার্থ—বুদ্ধদেব বসু	(মনে পড়ছে না, হাতের কাছে বইটিও নেই)
সংক্রান্তি—বুদ্ধদেব বসু	সমুদ্র-সওয়ার—বিভূতি মুখোপাধ্যায়
নেপথ্য নাটক—বুদ্ধদেব বসু	(Riders to the Sea—J. M. Synge)
	প্রস্তাব—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
	(The Proposal—Anton Chekhov)

অনুবাদ
তুঘলক—চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও স্বপন মজুমদার
(তুঘলক—গিরিশ কার্নাড্)

৬। ক) ভাবানুবাদ তিনটির ক্ষেত্রে কোনো যুক্তি নয়, নেহাৎই প্রয়োজন কাজ করেছিল। 'তুঘলক' করার কারণ—ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নাটকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া (যা আমাদের কার্যক্রমের অঙ্গ)।

খ) 'কবয়ঃ' এবং সমুদ্র-সওয়ার মূলেরই তর্জমা। 'প্রস্তাব' সম্ভবত নয়। 'তুঘলক' তর্জমার তর্জমা।

গ) তর্জমা নাটকের ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয় নাটককেই প্রাধান্য দেবো, যেহেতু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নাট্যচর্চার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে উৎসুক।

৭। ভাবানুবাদ।

৮। বহুরূপীর 'দশচক্র' বা 'পুতুলখেলা' থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের কলিকাতা নাট্যকেন্দ্র প্রযোজিত 'গলিলেওর জীবন' পর্যন্ত বিদেশী নাটকের অনুবাদ-ভাবানুবাদ বারবার স্বাধীনোত্তর বাংলা নাট্যচর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এখানে বোধ হয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য নান্দীকারের প্রযোজনাগুলি। বাংলা নাট্যমঞ্চে বিদেশী নাটকের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

৯। এ প্রশ্ন কিন্তু তর্কসাপেক্ষ। (কেন ? প্রশ্নটির মধ্যে তো ছদ্মবেশী কোনো মতবাদের ছোঁয়াচ নেই, তবে তর্কটা কোথায় বা কী, সে-সম্পর্কে উত্তরদাতার যুক্তি নেই। —স হী.)। প্রকৃতপক্ষে আত্মীকরণের ক্ষমতা প্রয়োজন, যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের কিংবা বুদ্ধদেব বসুর। আজকাল কিন্তু এই আত্মীকরণের অক্ষমতায় বিদেশী গন্ধ থেকেই যায়। বিদেশী নাটকের ছায়াকে মেনে নিয়েও সার্থক ভারতীয় মৌলিক নাটক রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সম্ভবত, ভাবানুবাদের দিকে বেশী নজর দেওয়ায় মৌলিক নাটক লেখার সাহস আমাদের কমে যাচ্ছে।

১০। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি কেউই কখনো ভুঁইফোড় হতে পারে না। পূর্বসূরীদের কাছে ঋণের পরিমাণ যে কতোখানি তা' আমরা অনেকেই তেমন করে অবহিত নই। যেমন, একটি নাটক কখনোই ব্যক্তিগত অভিনয়-কুশলতার জোরে দাঁড়াতে পারে না—প্রয়োজন প্রযোজনার সামগ্রিক মান সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং সযত্ন হওয়া—এই শিক্ষা তো শিশির ভাদুড়ীর কাছে পাওয়া। শম্ভু মিত্র শেখালেন শৃংখলা, সংযম, সময়ানুবর্তিতা। সময়মত রিহার্সালে আসা, নিয়মিত আসা, সময়মত নাট্যানুষ্ঠান শুরু করা, মত্ত হয়ে মঞ্চে ওঠা যে এক জঘন্য অপরাধ—এইসব অনেক কিছুই আমরা তাঁর কাছে শিখেছি।

১১। অঙ্গনমঞ্চের অনাড়ম্বর এবং সরল প্রযোজনা-পদ্ধতি ভালোই লাগে। তবে বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতিতে এই পদ্ধতি কতখানি সহায়ক হবে এ'নিয়ে চিন্তার অবকাশ আমাদের এখনো হয়নি।
এখন পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনা নেই।

১২। অবশ্যই শৈল্পিক মান। আমরা বিশ্বাস করি সত্যিকারের ভালো প্রযোজনা, দেরীতে হলেও, একদিন দর্শকের আনুকূল্য পাবেই। দর্শকের জন্য—মানুষের জন্যই নাটক, এই কথা মাথায় রেখেই আমরা দর্শকের রুচি তৈরী করতে সচেষ্ট।

১৩। আজকাল দেখি যে কারা কারা গ্রামে গিয়েও নাটক করেন এই নিয়ে একটা ঢাক-ঢোল পেটানো হয়ে থাকে। আমরা মনে করি না যে 'গ্রামের মানুষ'- এবং 'শহরের মানুষের' জন্য আলাদা ধরনের নাটক হতে পারে। সত্যিকারের ভালো কাজ সমস্ত মানুষের জন্য। সুযোগ-সুবিধে হলে গ্রামেও যাবো নাটক করতে।

১৪। রবীন্দ্রনাথই বোধহয় প্রথম সচেতনভাবে ভারতীয় নাট্য-ঐতিহ্যকে তাঁর নাটকে বহতা রাখতে সযত্ন ছিলেন। তাঁর নাটকে যে 'ভারতীয়ানা' আমরা পাই তা' আর পরবর্তীকালে তেমন করে চোখে পড়ে না। আমাদের উদ্দেশ্য রূপায়ণে রবীন্দ্রনাট্যচর্চা প্রভূত সহায়তা করবে।

১৫। নিজেদের কথা দিয়ে বলতে পারি—সাহসের অভাব। রিহার্সাল শুরু করেই মনে হয়—থাক্, আরেকটু অভিজ্ঞতা বাড়ুক। বিশেষ করে বোধ হয় বহুরূপীর প্রযোজনাগুলির সু-উচ্চ মানের কথা মাথায় সবসময় থেকে যায় বলেই।

১৬। কি করে বলি! 'এবং ইন্দ্রজিৎ' যখন মুক্ত অঙ্গনে রাতের পর রাত চলছিল তখন দর্শক হিসেবে আমরা যতই চমকিত হয়ে থাকি না কেন, সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারে তার অভিঘাত কতটুকু! বাদল সরকার নিজেও তো নিজেকে ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে উঠলেন না!

১৭। মনে তো হয় না। প্রথমটায় মনে হয়, ভালোই তো, অনেক শক্ত-সক্ষম গ্রুপ পাওয়া গেল। ভাঙনের কারণটাও তো দেখতে হবে! আজ নাট্যগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু, আমাদের নাট্যের সামগ্রিক মান কি ষাট বা সত্তরের দশকের চেয়ে উন্নত?

১৮। একটি নাট্য-প্রযোজনাকে বোধহয় অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সবক'টি বাদ্যযন্ত্রই সেখানে নিজের নিজের ভূমিকা যথাযথ পালন ক'রে অর্কেষ্ট্রেশন্‌কে সার্থক করে তোলে। নাটকেও তাই। প্রতিটি অভিনেতাই নিজের ভূমিকাটুকু যথাযথ রূপায়িত করে 'দলগত অভিনয়'-এর ভিতটাকে শক্ত করে তোলেন।

আমরা চেষ্টা করি এই ভাবেই তৈরী হতে।

১৯। সাহিত্যিকেরা নাটক লেখেন না বোধহয় প্রকাশকদের আগ্রহ উপন্যাস, কবিতা বা ছোটগল্প সংকলন ইত্যাদির প্রতি বেশী বলে। প্রযোজক-নাট্যকাররা নিজের নিজের গোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং সাধ্য মাথায় রেখে নাটক লেখেন। আমরা প্রযোজকরা বিদেশী নাটকের অনুবাদ/ভাবানুবাদে আগ্রহী বেশী!

'চাঁদ বণিকের পালা' এই অবস্থায় একটি পরম প্রাপ্তির মতো। নাটক হিসেবে তা' কতখানি সবল বা দুর্বল, সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কারণ, একজন প্রযোজক যা চান তা হলো আসলে ভালো 'কাঁচামাল', যার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রযোজনা গড়ে তোলা যায়। 'চাঁদ বণিকের পালা'-র একটি সত্যিকারের ভালো প্রযোজনা সম্ভব—সেই সম্ভাবনা এই নাটকে আছে।

২০। আমরাই সম্ভবত একমাত্র গোষ্ঠী যারা নিয়মিতভাবে কাব্য-নাটক মঞ্চস্থ করেছি। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ' ও 'সংক্রান্তি'। কবিতা মানুষের হৃদয়কে সহজেই আন্দোলিত করে। সেই সঙ্গে যদি তার বিষয়বস্তু ভারতেরই সনাতন কাহিনীর অঙ্গীভূত হয় তবে তা দর্শকের কাছে পৌঁছোয় আরো সহজে। অথচ তারই মধ্যে লুকোনো থাকতে পারে আধুনিক মানসিকতার বীজ। 'প্রথম পার্থ' ও 'সাক্রান্তি' করার পেছনে অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে এইসব চিন্তাও কাজ করেছিল। আমরা অদূর ভবিষ্যতেই আরো একটি কাব্যনাটক প্রযোজনা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'।

সন্দীপন

১। ১৯৭৬-এর ৪ এপ্রিল।

২। ক) পনেরো জন। অভিনেত্রীরা সদস্য।

খ) একজন। কাজল চক্রবর্তী।

গ) হ্যাঁ, দশ টাকা।

ঘ) কিছুটা পুশ্-সেল ও কিছুটা কাউন্টার থেকে বিক্রিত অর্থের দ্বারা।

৩। ক) খুব কম। বছরে তিন/চারটি। সাধারণত শহর কিংবা শহরতলির রিক্রিয়েশান ক্লাবগুলো থেকে।

খ) কোনো মাসে একটি, কোনো মাসে ২টি। বছরে বারো থেকে আঠারটি।

গ) একাডেমি অব ফাইন আর্টস, মুক্তাঙ্গন, যোগেশ মাইম একাডেমি, অরনমহল, শিশির মঞ্চ প্রভৃতি।

৪। মূলত মৌলিক নাটকে নবতর মাত্রা সংযোজন করা। শুরু থেকেই আমরা মৌলিক নাটক পরিবেশন করে আসছি। তবে তা থেকে এখনই সাফল্য দাবি করা যায় না। থিয়েটার করার সময় আমরা নাটকটির সাহিত্যগুণ সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখি। তাই আমরা পুরো ব্যাপারটাকেই দু'দিক থেকে সমানভাবে দেখার চেষ্টা করি—(এক) থিয়েট্রিক্যাল আসপেক্ট (দুই) ড্রামাটিক্যাল আসপেক্ট। তাতে করে একই সঙ্গে থিয়েটার ও নাটক দুই-এর বিষয়ে দর্শক সচেতন হ'তে পারেন।

৫। চারটি। সব ক'টিই মৌলিক।—

রং বেরং রুদ্রাক্ষ ; আমরা ঘরে যাব ; এইভাবেই কাটিয়ে যাব হা-হা- ; হরি করেছে প্রতিজ্ঞা।—রচনা : কাজল চক্রবর্তী।

৬। আমরা তর্জমা নাটক করিনি।

৭। ভাবানুবাদের চেয়ে অনুবাদই জরুরি বলে মনে হয়। কারণ, অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি মূল নাটকটির কাহিনী, কাঠামো, পরিবেশ, কাল ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হতে পারি। তাতে করে দর্শকদেরও চিন্তা-ভাবনার বিস্তার ঘটতে সাহায্য করে।

৮। স্বাধীনোত্তর বাংলা নাট্যমঞ্চ ভীষণভাবেই বিদেশী নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আই, পি, টি, এ'র বিভিন্ন শাখাগুলো বিভিন্ন বিদেশী নাটকের অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ বাংলা নাটমঞ্চে পরিবেশন করতেন। তবে সেই সময়কার যাবতীয় নাটকগুলোই ছিল রাজনৈতিক ভাবনায়। তার কারণ আই, পি, টি, এ-এর প্রাথমিক এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের আপামর জনসাধারণকে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনায় সচেতন করা। তবে শুধুমাত্র বিদেশী নাটকের মধ্য দিয়েই যে তা করেছে এমন নয়। কারণ, এই সময়েই আমরা পাই ইদানিং কালের গনচেতনাসম্পন্ন মৌলিক নাটক, যা আজকের বাংলা নাট্য আন্দোলনে এক মাইলষ্টোন—বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। পাশাপাশি আসে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ।

কিন্তু এইসব বাংলা নাটকের পাশাপাশি গণনাট্যের অন্যান্য শাখাগুলো বিদেশী নাটকেরও অনুবাদ সমান তালে বাংলা নাটমঞ্চে

পরিবেশন করতে থাকলো। যেমন, ম্যাক্সিম গোর্কী, ব্রেশ্‌ট্‌, ল্যু শুন, ভি, ভি, গোগোল ইত্যাদি।

এর পরেই সংঘের বিভিন্ন সদস্যরা সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে শুরু করলেন। কারণ হয়তো ব্যক্তিগত শিল্প-ভাবনার সাথে সংঘের রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য। ফলে আলাদা-আলাদা দলগঠনের সংকল্প। গড়ে উঠলো বহুরূপী, এল, টি, জি, রূপকার ইত্যাদি। এই সময়টাই বোধহয় বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের জন্মলগ্ন। 'বহুরূপী'র মাধ্যমে শম্ভু মিত্র শুরু করলেন রবীন্দ্রনাট্যের চর্চা। পাশাপাশি করলেন সফোক্লেস, ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ। বাঙালী দর্শক রাজনৈতিক নাটকের পাশাপাশি অন্যান্য মানসিক ভাবনারও নাটক দেখতে পেলেন। আর উৎপল দত্ত মৌলিক রাজনৈতিক নাটকই করতে থাকলেন। তবে সেই সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকেরও অনুবাদ পরিবেশন করলেন। এলেন অজিতেশ ও রুদ্রবাবুরা—যেন বিদেশী নাটকের মঞ্চভাবনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আবার অনুবাদ হলো ব্রেশ্‌ট্‌, পিরানদেল্লো, চেখভ। বাংলা নাটকের বাজার সত্যিই গরম হল, কিন্তু অনুবাদে কিংবা ভাবানুবাদে।

এই অবস্থায় যারা মৌলিক নাটক লিখেছিলেন তাদের মধ্যে এক-মাত্র উৎপল দত্ত বাদে আর কেউ যেন একটা হালে পানি পাচ্ছিলেন না। স্বভাবতই বাংলা নাটমঞ্চ রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চরূপের মধ্য দিয়েই মৌলিক নাটকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ'রে রাখার চেষ্টা করতে থাকলো। এই অবস্থায় বাদল সরকার খুবই শক্তিশালী মৌলিক ভাবনার নাটক উপহার দিলেন বাংলা নাট্যমঞ্চকে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একেবারেই অন্য ভাবনার নাটক, অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদের সঙ্গে পাঞ্জা ক'ষে নিজের জায়গা ক'রে নিল বাংলা নাটমঞ্চে।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গ্রুপ থিয়েটারের সংখ্যাও বেড়ে গেছে, তুলনায় নাট্যভাবনায় কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না। মৌলিক নাটকের প্রয়োজনীয়তা কিংবা বিদেশী নাটকের প্রভাব মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে রাতদিন খেয়ে-না-খেয়ে ঘামঝড়ানো পরিশ্রমে ডুবে গেলেম সেই গতানুগতিকতায়। —আবারও ব্রেশ্‌ট্, চেখভ, গোর্কী। —অবশ্য এরই ফাঁকে এলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। কিছু মৌলিক নাটক পাওয়া গেল বাংলা নাটমঞ্চে।

কিন্তু তাতে করেও বাংলা নাটকে নতুন কোন গভীরতার সন্ধান পাওয়া গেলো না। স্বভাবতই আজ নাট্যকর্মী, নির্দেশক, অভিনেতা, সর্বোপরি, দর্শককুল সবাই যেন যুতসই কিছু মৌলিক নাটকের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। অথচ এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিদেশী নাটকের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না ক'রে আজকের বাংলা নাটমঞ্চের কর্মীরা রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে কিংবা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বারংবার বিদেশী নাটকের অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদের মধ্যেই হাবুডুবু খাচ্ছেন।

৯। বিদেশী নাট্যের চর্চা দেশীয় নাটক রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সপক্ষে নিঃসন্দেহে একটি জরুরি ঘটনা। শুধুমাত্র অনুবাদ-নাট্যের চর্চার মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে যদি ঐসব অনুবাদ-নাটকের নাট্যভাবনা বা গঠন প্রণালী সম্পর্কে আমাদের নাট্যকারেরা সচেতন হন, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় বাংলা নাটমঞ্চও কিছু ভাল মৌলিক নাটক পাবে। যথেষ্ট উচ্চমানের বিদেশী নাটকের অনুবাদ বাংলা নাটমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে, যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বেঁচে থাকার জটিলতম সমস্যা।

আচমকা কেঁপে ওঠে যাবতীয় পরিবেশটি। আমাদের শিরস্পন্দন বাড়তে থাকে। সংলাপটি দর্শককে ভাবতে শুরু করায়—সেকি কোনো ঘটনার সম্মুখীন হতে চলেছে, নাকি কোনো ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে যুক্ত? এই ভাবেই সে ক্রমশ নাটকটির কাহিনীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'তে শুরু করে।

তথাপি এমন আলোচনার পরেও বলবো, শিল্পের ক্ষেত্রে যে-কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষাই অভিনন্দনীয়। সে'দিক থেকে আগামী দিনের অঙ্গনমঞ্চ সামগ্রিকভাবে থিয়েটারের অগ্রগতিতে সহায়ক হবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে না, আমাদের অঙ্গনমঞ্চে নাটক করার এখনো কোনো পরিকল্পনা নেই।

১২। অবশ্যই শৈল্পিক মান।

আমরা এখনো পর্যন্ত কাউন্টারের সঙ্গে কম্প্রোমাইজের কথা ভাবিনি। প্রয়োজন হ'লে বেঁচে থাকার তাগিদে ভবিষ্যতে ভাববো।

১৩। কোনো প্রতিষ্ঠানের কিংবা সরকারী সাহায্য পেলে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে নাটক করতাম। হয়তো লোকশিক্ষার দায়িত্বটাও পালন করতে পারতাম। তেমন কোনো আশার আলোক এ-পর্যন্ত দেখিনি। তাই শহরে বসে গ্রামে নাটক করার ব্যাপারে কোনো মতামত ব্যক্ত করাটা কি ঠিক হবে?

১৪। কিছু রবীন্দ্র-নাটক পাঠের পর একটি রবীন্দ্র-নাটকের মঞ্চভাবনা মাথায় ঘুরছে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই নাটকটির মঞ্চরূপ দিতে পারবো। সে'কথা এখন থাক্।

১৫। সম্ভবত এর জন্য দুটি জিনিষ দায়ী—(এক) বহুরূপীর রবীন্দ্র-নাট্যের সার্থক প্রযোজনা। (দুই) রবীন্দ্র-নাটক আজকের নাট্যভাবনার গতিশীলতার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সমান তালে চলতে পারে বলে মনে হয় না।

১৬। "এবং ইন্দ্রজিৎ" বাংলা নাটকে নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নাটকটিকে ঘিরে আমাদের মঞ্চে আরো কিছু ভাল মৌলিক নাটক আসা উচিত ছিলো। নাটকটির গঠন এবং ভাবনা অতীব পরিণত। অথচ খুবই আশ্চর্যের বিষয়ে আর কেউই তেমন সচেতন হয়ে আর ভাল নাটক লিখতে পারলেন না!

তবে 'নবান্ন'কে যেন মনে হয় আজকের নাট্য আন্দোলনের প্রথম শ্লোগান। আসলে সেই সময়টাকেও আমাদের আলোচনায় আনা উচিত। সেই সময়েতো নাটক নিয়ে এত হৈ-চৈ হ'তো না। হৈ-চৈ অর্থে আমি বলতে চাইছি, এতো বেশী নাটক হ'তো না। আমাদের সময়ের মতো এতো নাটকের দলও ছিলো না, নাট্যকারও না। তাই সেই সময়ে 'নবান্ন' এক বিরাট বিস্তৃতি নিয়ে ধরা পড়েছিলো, অবশ্যই সেই সময়ে অন্যান্য নাট্য রচনার পাশে গঠনগত এবং রচনাশৈলীতে এ নাটক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পেরেছিল।

কিন্তু আজ তো পরিবর্তিত সময়ে আমরা "এবং ইন্দ্রজিৎ" পেলাম। নাট্যভাবনাও অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। নাট্যকারও অনেক, তাই হয়তো ভাবনা চিন্তাও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

১৭। মনে হয় না সৃজনধর্মী। এতে করে দু'পক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ে। মূল এবং নতুন দলটি। বিভিন্ন সমস্যার ভারে এমন

ঘায়েল হয়ে পড়ে যে শেষপর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই নাটক করাও বন্ধ হয়ে যায়।

কিছুমাত্র নয়, বরং নাট্য আন্দোলন মন্থর হয়ে পড়ছে।

১৮। অবশ্যই দলগত অভিনয়।

১৯। কারণ হিসেবে বলতে গেলে তো একটু বড় আকারের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবু যেটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায় তা হচ্ছে ইদানীং কালের নাট্য রচনার ক্ষেত্রে বড় বেশী রকমের সাহিত্যবোধের অভাব। নাটক যে সাহিত্যের একটি বিশেষ মূল্যবান শাখা, সে-বিষয়ে কিন্তু আমরা নাটকের লোকেরা যথেষ্ট সচেতন নই। তাতে করে আমাদের নাটকে দেখানো সমস্যা, যন্ত্রণা কিংবা সমাধান সামগ্রিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না। সমস্যাগুলো-হৃদয়ের পরিবর্তে স্থান পাচ্ছে কেবলই যুক্তিতে। সমস্যা যুক্তির উর্দ্ধে গিয়ে হৃদয়কে আন্দোলিত না করতে পারলে তা না পাবে শাশ্বত স্বীকৃতি, না পাবে মানুষের সনাতনী সম্ভাষণ। কারণ, কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাই চিরায়ত নয়, যুগে যুগে তা বিবর্তিত হয়েছে এবং হবেও।

সার্থক নাটক অর্থে সেই নাটকের কথাই বলতে চাইছি যার বক্তব্য আমাদের দ্বন্দ্বের গভীরতর আবর্তে ঠেলে দেয়। আমরা ক্রমশই হাতড়ে বেড়াই উত্তরণের পথ। অবশেষে আত্মোপলব্ধি—'এই সেই পথ', কিংবা 'হেথা নয়. হোথা নয়, অন্য কোথায়'। দুঃখিত, 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি এখনো পড়া হয়ে ওঠেনি, শম্ভু-বাবুর পাঠও শোনা হয়নি। তাই এ মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে পারছি না।

২০। না, আমরা এ ব্যাপারে কখনো ভাবিনি। সবকিছু মিলিয়ে আজকে নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কাব্যনাটক তেমন যেন তাল রাখতে পারছে না বলে মনে হয়। কাব্যনাটকের ভাষা যেমন, তার মঞ্চও তেমন আলাদা বোধ হয়।

পরিশিষ্ট

Rabindranath Tagore : American Interpretations.
ed Ira G. Zepp Jr

(Writers Workshop. 1981. 60.00)

এমন একটি বই, যা পড়তে গিয়ে পাঠককে সতর্ক থাকতে হবে গোড়া থেকেই—আদ্যোপান্ত। এ্যাণ্ড্রুসনের ঐতিহাসিক দলিল-গোছের বই 'রবীন্দ্রনাথ থ্রু ওয়েষ্টার্ণ আইজ' কিংবা অতি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত স্টিফেন হে-র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-ভিত্তিক রবীন্দ্রবিবেচনা 'এশিয়ান আইডিয়াজ অব ঈষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট'-এর চেয়ে বর্তমান গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, মূল্যায়নভঙ্গি অনেক বেশি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং অর্থবহ। কেবলমাত্র মার্কিনী বিদ্বজ্জনদের রবীন্দ্রনাথ-আলোচনাই নয় এ'টি, সামগ্রিকভাবে মার্কিনী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রবীন্দ্রনাথকে নতুন ক'রে বিচারের চেষ্টা হয়েছে এখানে। এখানেই বইটির বিশেষ গুরুত্ব। সম্পূর্ণ অভিনব ও উচ্চাশী এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। বং সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের ১১০-তম জন্মবর্ষে খোদ রবীন্দ্রনাথেরই শহর থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন লেখকের মোট ন'টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সবচেয়ে হতাশাজনক প্রবন্ধ মেল্‌ভিন ডি পামার-এর 'টেগোরস পোয়েট্রি ইন ইংলিশ : আ ক্যানডিড ভিউ'। গতানুগতিক-ভাবে ইয়েট্‌স্ আর পাউণ্ডের প্রসঙ্গ নিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে মেল্‌ভিন রায় দিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ না একজন শক্তিমান রোম্যান্টিক, না আধুনিক।" বস্তুত, মেল্‌ভিন সাহেবের রোম্যান্টিকতার ধারণাই অতিসরলীকৃত, তাঁর আধুনিকতার ভাবনাও রোম্যান্টিক। দুঃখের বিষয়, ভালো অনুবাদের অভাবে তাঁর জানা হয় নি যে, রবীন্দ্র-

নাথের এমন বহু সব রোম্যান্টিক কবিতা আছে যা কীট্‌স্-শেলী-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। উপরন্তু, রোম্যান্টিকতার বিকাশ কি ইংরেজি-জর্মন-ফরাশি সাহিত্যে একই রকম? —এছ বাহ্য, যে-ইয়েট্‌সকে আধুনিকতার প্রতিমূর্তি দাঁড় করিয়েছেন তিনি রবীন্দ্র-নাথের বিপরীতে, সেই ইয়েট্‌সের আধুনিকতা কি উনিশ শতকী ফরাশি প্রতীকীবাদের উপর ভিত্তিশীল নয়?—ইয়েট্‌সের কাব্যতত্ত্বই তো নব্য রোমান্টিক! এও তো আমরা জানি যে অধ্যাপক পারকিন্‌সন্ ইয়েট্‌সের কাব্যালোকে সমকালীন মার্কিনী কবিতার বিচার করলেও টেড্ হিউজ ছাড়া আর কোনো মার্কিনী কবিই ইয়েট্‌সের দ্বারা প্রভাবিত ন'ন। তবে ইয়েট্‌সের কবিতার ('Among School Children') আঁটোসাঁটো গড়নের পাশে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র বাঁধন অনেক শিথিল মনে হওয়া মেল্‌ভিনের ইঙ্গ-মার্কিনী (অ্যাংলো-আমেরিকান) মানসতারই পরিচায়ক।

প্রসঙ্গত মেল্‌ভিন সাহেবকে প্রশ্ন করা চলে যে তাঁর নিজের দেশেই সমকালীন কবিতায় যে-দু টি সমান্তরাল ধারা বহমান-'raw' এবং 'cooked'—তাদের মধ্যেও কি ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে তারতম্য নেই? যে-ব্লাই বা ডেনিস্ লেভের্টভের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি ভিন্ন প্রসঙ্গে, তাঁদের কিংবা ক্রিলি এবং এলিজাবেথ বিশপের ভাষা ও সমগ্র কারুকৃতি থেকে কি পৃথক নয় সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ্-অ্যান্ সেক্সটন-গিন্‌স্‌বার্গ-লেরয় জোন্‌স্-এর ভাষা ও সাবিক প্রকাশভঙ্গি?, দ্বিতীয় দলের, অর্থাৎ 'raw' গোষ্ঠীর, ভাব-ভাষা অনেক অগভীর, শিথিল এবং ইয়াকিং নয়?

অতঃপর, মেল্‌ভিন জানান যে, ১৯২০-র পরে মার্কিন দেশে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির ভাঁটা শুরু হয় এবং ষাটের দশকে পুনরায়

জোয়াড় এবং এখনো তা প্রাণবন্ত। কিন্তু তিনি মনে করেন, অন্য অনেকের মতোই, যে এর কারণ যতোটা-না রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎকর্ষ, তারো চেয়ে বেশি তাঁর কবিতায় প্রকাশিত প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার প্রতি মার্কিনীদের উৎসাহ। —(কী অন্যায়, সত্যি !) —মেল্‌ভিন তাই রবীন্দ্রকবিতাকে "কবিতা হিসেবে" দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ তো দূরের কথা, গীতা-উপনিষদ-তন্ত্র-বৌদ্ধ দর্শন না জানলে বৃটিশ-মার্কিনীদের পক্ষে কি পুরোপুরি বোঝা সম্ভব ইয়েট্‌স কিংবা এলিয়টের কবিতা-ই ?

যাই হোক্, কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যচর্চা করতে গিয়ে মেল্‌ভিন কোন্ যুক্তিতে দুর্বল অনুবাদের উপর ভিত্তি ক'রে মূল সৃষ্টি সম্পর্কে রায় দেন ? তুলনামূলক সাহিত্যের এই চেয়ারম্যান-অধ্যাপক কোন্ যুক্তিতে একটি মূল কবিতার (স্যাণ্ডবার্গের 'হার্বর') পাশাপাশি এক্স্‌প্লিকেশন করতে প্রবৃত্ত হন একটি অনুবাদ-কবিতা (রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র ৮৯ নং কবিতা) ? রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ ব'লেই কি তা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতা হ'য়ে গেল ? সমান্তরাল পাঠের এহেন অ্যাবসার্ড মেথাডলজি তুলনামূলক সাহিত্যের ডিসিপ্লিনে কবে থেকে চালু হয়েছে ? নাকি তিনি চালু করতে এগিয়ে এলেন ? স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন !!

তাঁর বিচার পদ্ধতির মতো বিচারের রায়ও অদ্ভুত। —তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক কবিতার যে-সকল গুণ অপরিহার্য এবং যা-সবই আছে স্যাণ্ডবার্গের কবিতাটিতে—ঐতিহ্যবিরোধ, মুক্তছন্দ, মিতভাষণ, ঋজু চিত্রকল্প, শব্দের খেলা, সজীবতা—সে'সব কেবল রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটিতেই যে অনুপস্থিত তা নয়, সামগ্রিক-ভাবে তাঁর কবিতায়ই ("টেগোরস পোয়েট্রি") নেই ! —বস্তুত,

'পোয়েট্রি' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতার (এবং সঙ্গে আরো পাঁচটি ছিলো) সঙ্গে সংযোজিত ভূমিকায় পাউণ্ড ট্রুবাডুর কবিতার স্বাদর কথা জানিয়ে ঐতিহ্যবিরোধী মার্কিনী মানসের পরিচয় দিতে পারেন নি! কিন্তু মেল্‌ভিন দিয়েছেন পাউণ্ডের ঐ 'ভূমিকা'-র উল্লেখ না ক'রে! ঐতিহ্যের স্বীকরণ ও পুনর্সৃষ্টির দরুণই টি, এস, এলিয়টের মতো একজন বিদগ্ধ ও দুরন্ত আধুনিককেও মার্কিনী কবিতার শরিক ভাবা শক্ত হ'য়ে পড়ে, মার্কিনীদের পক্ষে যেমন আমাদের পক্ষেও তেমনি। এলিয়টের তুলনায় দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিনী কবিরা যখন তাঁদের কবিতায় স্বতন্ত্র মার্কিনী মূল্যবোধের রূপায়ণে সচেষ্ট, তখন এলিয়টের কবিতাই আমাদের অভ্রান্ত স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বস্তুত মার্কিন দেশের নিজস্ব কোনো ঐতিহ্য—"পৌরাণিক ঐতিহ্য"—নেই, মূলত সে পাশ্চাত্যেরই এক শরিক, যদিও নিরন্তর আত্মানুসন্ধানে রত ভূ-পৃষ্ঠে এক ভিন্ন মহাদেশ। আর তাই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়ার দরুণই রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বিবেচ্য ন'ন, মেল্‌ভিন সাহেবের এই ধারণা নির্ভুল মার্কিনী। (অনাস্তিকে, প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার তথা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী মার্কিনী জনগণ, যাঁদের কথা একটু আগেই বলেছি, এবং রোটেনস্টাইনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেল্‌ভিন যাঁদের বলতে চান "সেন্টিমেণ্টালিস্ট্", তাঁরা খাঁটি মার্কিনী ন'ন তবে ??)

তবে মেল্‌ভিনের অন্যান্য চাহিদা—যা-সব পূরণ করেছে স্যাণ্ডবার্গের প্রাগুক্ত কবিতা—মেটাতে রবীন্দ্রকবিতা সক্ষমই কেবল নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের যোগানের ভার বহনে মেল্‌ভিন কতোখানি সমর্থ হবেন, সে'টাই ভাবিয়ে তুলেছে বর্তমান আলোচককে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন কবি, যাঁর কবিতার ক্রমবিকাশের ধারা

বুঝতে না পারলে মেল্‌ভিনের পক্ষে সঠিক উপলব্ধি সম্ভব নয় রবীন্দ্রকবিতার মহত্ত্ব, কারণ কীট্‌স্‌-শেলী-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় এই ধারানুক্রম তিনি পাবেন না। অবশ্য ইয়েট্‌সের কবিতায় প্রাথমিক ও পরবর্তী পর্যায়ন তাৎপর্যপূর্ণ। আপাতত রবীন্দ্র-কবিতার পর্যান্তর আলোচনার অবকাশ নেই ব'লে তাঁরই কস্‌-ষ্টাড্ডির জন্যে পেশ করতে চাই 'শেষলেখা'র অন্তর্গত 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটি, এবং তার প্রকাশিত অনুবাদগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদটিই (সম্প্রতি পি, লাল-কৃত) এখানে পরিবেশন করছি :

The first Sun
asked
the world's first life :
"Who are you ?"
No answer.

Years passed.
The last Sun
asked
the last question from the western ocean
on a soundless evening :
"Who are you ?"
No answer.

—এবার কি মেল্‌ভিন আর খুঁজে পাবেন সেইসব ভাঙা দাঁত, যা তাঁর স্ব-নির্বাচিত কবিতায় অক্লেশে দেখতে পেয়ে এবং আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধটি লিখে ফেলে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছেন তিনি ? এবার কি আর তাঁর ধারণা টেঁকে যে, রবীন্দ্র-কবিতা "existential" নয় ? বরং স্যাণ্ডবার্গের কবিতাটির (এমন-কি তাঁর সমগ্র কবিতার) চেয়েও এই কবিতাটির ওজন

অনেক বেশি নয় ? স্যাণ্ডবার্গেরই 'স্পীচ' কবিতার শেষ তিন পংক্তির মতোই বলতে হয় :

Thus all tongues
slowly talk themselves
into silence.

মেল্‌ভিন সাহেবের উচিত ছিলো তাঁর সন্দর্ভ লেখার আগে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ পড়া, নয়তো আরো কিছুকাল অপেক্ষা করা, যতোদিন-না রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার উৎকৃষ্ট আধুনিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি অনুবাদের জন্য অপেক্ষা করছেন জানিয়েছেন, অবশ্য স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে রাখলে ভালো করতেন কেমন ইংরেজি চাই তাঁর : Celtic, Cockney, না Yankee ?

বস্তুত, বাংলাভাষায় রবীন্দ্রপাঠ ছাড়া যে যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব নয় রবীন্দ্রনাথের সুমহান ভাবধারা, এমন-কি সম্ভব নয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর সঠিক মূল্যায়ণ, তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন আমেরিকা' শীর্ষক একটি উজ্জ্বল প্রবন্ধের লেখক স্টিফেন হে। বস্তুত, হে চেয়েছিলেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের স্বরূপ নির্ণয় করতে, কিন্তু শেষ অবধি তাঁর যথার্থ প্রতীয় হ'লো যে, মার্কিন ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বক্তৃতাদি এবং মার্কিনী দেশনায়কদের সঙ্গে আলাপনে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের কথাই ব্যক্ত হয়েছে মাত্র, প্রত্যক্ষ রাজনীতির মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। এবং সেই রাজনৈতিক আদর্শের সার কথা মানবতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। মার্কিন দেশে বিভিন্ন সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাদি, সংবাদপত্রের রিপোর্ট, এবং বিভিন্ন চিঠিপত্র

ঘেঁটে হে-র সিদ্ধান্ত—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত পর্যটক ; কখনো নতুন স্থান দর্শনে, কখনো-বা বিশ্রামের তাগিদে, কখনো-বা বিশ্ব-ভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের কারণে, আবার কখনো-বা অগণিত গুণমুগ্ধ মার্কিনী অনুরাগীজনের আতিথেয়তা গ্রহণের জন্যই তাঁর তাবৎ মার্কিনভ্রমণ, কখনোই কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়। নথিপত্র ঘেঁটে ঐতিহাসিক হে দেখিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিল কখনো হার্দ্য ও উচ্ছ্বসিত, আবার কখনো তিক্ত-কঠোর। এবং রবীন্দ্রনাথের এই মিশ্র প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ ক'রে হে-র অভ্রান্ত রায় যে, রবীন্দ্রনাথ "searched for eternal meanings behind the transient appearances assaulting his senses." এবং তাঁর ব্রত ছিলো "to urge Americans toward, and also to warn them against, what they might become in the future."। আর এই গঠনশীল সমালোচনার দরুণই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ হে-র মনে হয়েছে টোকেভিল, মার্টিনিয়ান, ডিকেন্স, ট্রোলোপস, ম্যাথ্যু আর্নল্ড কিংবা ব্রাইস প্রমুখ খ্যাতনামা ইউরোপীয় পর্যটকদের মার্কিন-সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মূল্যবান। —কেবল-মাত্র অভিনবত্বের গুণেই নয়, পাণ্ডিত্যের ভারেও নয়, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের দীপ্তিতেই এতো উজ্জ্বল ও উপাদেয় রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ বিদেশীদের হাত থেকে আগে পাই নি। হে-র 'এশিয়ান আই-ডিয়াজ অব ঈষ্ট এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট' গ্রন্থের চেয়েও এই প্রবন্ধটি অনেক বেশি স্বচ্ছ ও বিদগ্ধ।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা পল জে উইল-এর 'টেগোর, বিবেকানন্দ, এ্যাণ্ড দ্য আরলি ন্যাশনাল মুভ্‌মেণ্ট' প্রবন্ধটিও স্বচ্ছ সতেজ। তাঁর বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিবেকানন্দ

প্রত্যক্ষ রাজনীতির মানুষ না হলেও, অথবা রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনের শরিক না হ'লেও, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর ঐ দুই মহান বুদ্ধিজীবীর অবদান অপরিমেয়। বস্তুত, হিন্দু তথা ভারতীয় চিন্তা-দর্শনের "আন্তর্জাতিক মুখপাত্র" সে'দিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনেই সফল হয়েছিলেন। তবে, ১৯০৭-এর আগে রবীন্দ্রনাথ মুসলিমদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, পল-এর এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুফী ধর্ম-দর্শনের অভিঘাত, কিংবা 'গল্পগুচ্ছ'-র মুসলমান চরিত্ররা পল-এর ধারণার বিপক্ষেই রায় দেয়। আর বিবেকানন্দের সম্পর্কেও পল-এর যে-মৃদু অভিযোগ —হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কাজে তিনি তেমন অগ্রসর হন নি— তাও স্থূল বিচার। যিনি সর্বজীবে প্রেমের আদর্শ প্রচার করেন, যিনি-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-অন্ত্যজ ভারতবাসীকে ভ্রাতৃপ্রতিম সৌহার্দ্যে আলিঙ্গনের আহ্বান জানিয়েছেন সকল ভারতবাসীর প্রতি, তাঁর পক্ষে পৃথকভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংহতি-কর্ম তেমন জরুরি ছিলো? লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ঐশী দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিলো যাঁর উপর, তাঁর পক্ষে কি সম্ভব ছিলো সেই কাজে লিপ্ত থাকা যা বস্তুত দেশনেতাদের কৃত্য? তা'ছাড়াও, মাত্র উনচল্লিশ বছর জীবনের পরিসরে উল্কাবেগে যে-বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে হয়েছে তাঁকে, তাতে তাঁর ফুরসৎ-ই বা হ'লো কোথায় উক্ত সব কাজে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যোগী-হবার?—নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি বলি, কীট্‌সের ছাব্বিশ বছর বয়ঃক্রম যদি সাহিত্য সমালোচনায় বিবেচ্য হ'তে পারে, তবে এই মহাজীবনের মূল্যায়ণে তাঁর আয়ুসীমাও-বা জরুরি মনোযোগের বিষয় হবে না কেন?

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা ইরা জি, জেপ্‌-এর

'টেগোর এ্যাণ্ড গান্ধী অন্ নন্-ভায়োলেন্স্' প্রবন্ধটি বেশ ঝরঝরে হ'লেও স্বতন্ত্র কোনো মার্কিনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেলো না। প্রবন্ধের শিরোনাম বিশুদ্ধ রাজনৈতিক হ'লেও লেখক মূলত 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয়ের চরিত্রের নিরিখে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির বহু আলোচিত বিষয় উদ্ঘাটন করেছেন।

ধর্ম প্রসঙ্গে জি. নর্ডগুলেনের 'স্পিরিচুয়াল রিলিজিয়ন ইন টেগোর এ্যাণ্ড রাধাকৃষ্ণান' অতীব সুলিখিত একটি প্রবন্ধ। লেখকের বক্তব্য, বিচিত্র ধর্মীয় আচার-নির্ভর অভিজ্ঞতার মধ্যে "ultimate" এবং "spirit"-এর মেলবন্ধন বস্তুত "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের" পরম রূপ, যে-রূপের কথা শুনিয়েছেন রাধাকৃষ্ণান, আর অবিরল প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সুগভীর পর্যবেক্ষণে লেখক আরো বলেছেন যে, ঐ ঐক্যের রূপটির যথার্থ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হয়েছিলো তাঁদের অস্তিত্বের মর্মকেন্দ্রে এক গভীর অনুসৃষ্টি ("ট্রান্স্ক্রিয়েশন")। আর এই উপলব্ধির বলেই, রাধাকৃষ্ণানের ধারণা, ভেঙে ফেলা সম্ভব পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যস্থ প্রাচীরগুলি। লেখক চমৎকার দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের "আমি-তুমি"-র ব্যক্তিগত সম্পর্ক আসলে কবিতারই মতো এক অনুসৃষ্টি, যা কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতাজাত। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে নর্ডগুলেনের ধারণা যে, ভূমা-র সঙ্গে এই মিলনাকাঙ্ক্ষায়ই মানব-অন্তর ব্যাপ্ত হ'তে পারে, হ'য়ে উঠতে পারে সুন্দর ও প্রেমময়। আর এইভাবেই মানুষ তথা বিশ্ব প্রকৃত অর্থে সভ্য হ'য়ে উঠতে পারে—গ'ড়ে উঠতে পারে নতুন 'বিশ্ব-সভ্যতা'। রবীন্দ্রনাথ-রাধাকৃষ্ণানের দিগন্তপ্রসারী ধর্মচেতনা ব্যক্তিগত ভাবনার জগতে যে কী আলোড়ন তুলেছে তাও গোপন রাখেনি

নর্ডগুলেন : "The depth of experience that both attest to is attractive and it has enhanced my own spiritual life. I have sought to Hinduize my Christianity at this point I feel that they have revealed dimensions of experience that have not been exposed to me in my own tradition."

এ'ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ—সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত—মেরি লাগো-র 'দ্য ফিক্‌শনাল স্টিরিও-টাইপ ইন টেগোরস ষ্টোরিজ'। রবীন্দ্রানুরাগিনী লাগো ইতিপূর্বে আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর সুসম্পাদিত 'ইম্‌পারফেক্ট এন্‌-কাউন্টার' গ্রন্থখানি। বর্তমান প্রবন্ধে শিরোনাম থেকেই তিনি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তৎপর হয়েছেন। —'স্টিরিও-টাইপ' শব্দটি নিয়ে দু'পৃষ্ঠার ভূমিকায় তিনি আমাদের জানিয়ে নিয়েছেন যে, প্রচলিত নিন্দার্থে নয়, বরং অর্থে আধুনিক স্পষ্ট-নিখাদ ধ্বনির ('স্টিরিওফোনিক সাউণ্ড') ব্যঞ্জনা বোঝাতেই তিনি ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর আলোচনার জন্যে বেছে নিয়েছেন 'মধ্যবর্তিনী', 'স্ত্রীর পত্র' এবং 'নষ্টনীড়'-এর তিনটি নারীচরিত্র হারানসুন্দরী, মৃণাল এবং চারুলতাকে। এই গল্পগুলির পারিবারিক প্রেক্ষিতে লাগোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অভ্রান্ত ধরা পড়েছে ভিক্টোরীয় যুগের পারিবারিক চিত্র, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি বিশ্লেষণ ক'রে দেখি-য়েছেন ভারতীয় পশ্চিমী তথা নারীর তথা অবশ্যম্ভাবীরূপে রবীন্দ্র-নাথের স্বকীয়তা। লাগোর সুদৃঢ় সংযোজন যে, সে'দিনের পশ্চিমী রিয়্যালিস্ট এবং ন্যাচারলিস্ট যে-কোনো লেখকের যে-কোনো শক্তিমান গল্পের সমতুল্য উক্ত তিনটি গল্প। কিন্তু পশ্চিমীদের সে'দিন পড়া হয় নি রবীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলি, আর তা না

হওয়ার দরুণ এক হাত নিয়েছেন প্রয়াত রোটেনস্টাইনকে, যিনি সে'দিন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-পার্ষদ হ'য়েও পশ্চিমীদের কাছে তুলে ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের "বায়বীয় এবং অপার্থিব" অয়ায়ন— 'গীতাঞ্জলি' ধরনের"।

তুলনামূলকভাবে উইলিয়াম সেংকনার-এর' দ্য ফেমিনিন ইন দ্য ওয়ার্কস অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর' এ'দেশে বহু আলোচিত সব কথাবার্তারই প্রতিধ্বনি। ডোনাল্ড টাক্-এর 'ক্রিটিক অফ রিলিজিয়াস ট্র্যাডিশন্স ইন স্যাক্রিফাইস'ও গতানুগতিক একটি প্রবন্ধ।

সবশেষে বলবো, আলোচ্য গ্রন্থটি সাম্প্রতিক কালের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। মার্কিন দেশ এবং ভারতের মধ্যে এক সৌহার্দাপূর্ণ ভাব-বিনিময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে মার্কিন ভ্রমণকালে একটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "Columbus set out to find the passage to India and found the American continent. Now the West should continue the journey and complete the voyage to India"। রবীন্দ্রনাথের ১২০তম জন্মতিথিতে এ'কালের কতিপয় বিদগ্ধ মার্কিনী বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ ক'রে বস্তুত তাঁর অভীষ্ট সম্পাদনে ব্রতী হয়েছেন। বিশেষ ধন্যবাদার্হ আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক ইরা জি. জেপ। সার্থক হোক্ তাঁদের যাত্রা, পূর্ণ হোক্ পথপরিক্রমা।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

বাংলার দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের সেবায়

এবং

অনুরাগী ক্রেতাসাধারণের স্বার্থে

'তন্তুশ্রী'

কম দামে সেরাগুণমান, কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পে তৈরী

সকলরকম রেশম ও তাঁতবস্ত্রের বিচিত্র সমারোহ।

'তন্তুশ্রী'র বস্ত্রসম্ভার আপনার ঘরে সমাদৃত হোক।

বিক্রয় কেন্দ্র : কলকাতা, নয়াদিল্লী, আগরতলা ও অন্যত্র

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট

কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩

With compliments from :

Telephone : 27-9672
27-3937
27-3493
Resi. 43-2571
Gram : ASSAMCARS

South Assam Carriers (Pvt) LTD.

Regd. Office : 80/1B, PHEARS LANE, CALCUTTA-700012.

৭ বছর | হীনযান | ১ সংকলন
বৈশাখ, ১৩৮৯ সাহিত্য-সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা এপ্রিল, ১৯৮২

DETTOL

THE ONLY ANTISEPTIC

TRUSTED BY DOCTORS FOR OVER 40 YEARS

THE WORLD'S MOST POPULAR ANTISEPTIC

MADE BY

RECKITT & COLMAN OF

INDIA LTD.

৩৩-ডি, শ্রীমোহন লেন, কলকাতা-৭০০ ০২৬, থেকে প্রকাশ করেছেন
সুভাষ ঘোষাল। মুদ্রণে গ্র্যাণ্ড সাপ্লাই কোম্পানী, কলকাতা-৬১

দু টাকা

CENTRAL LIBRARY

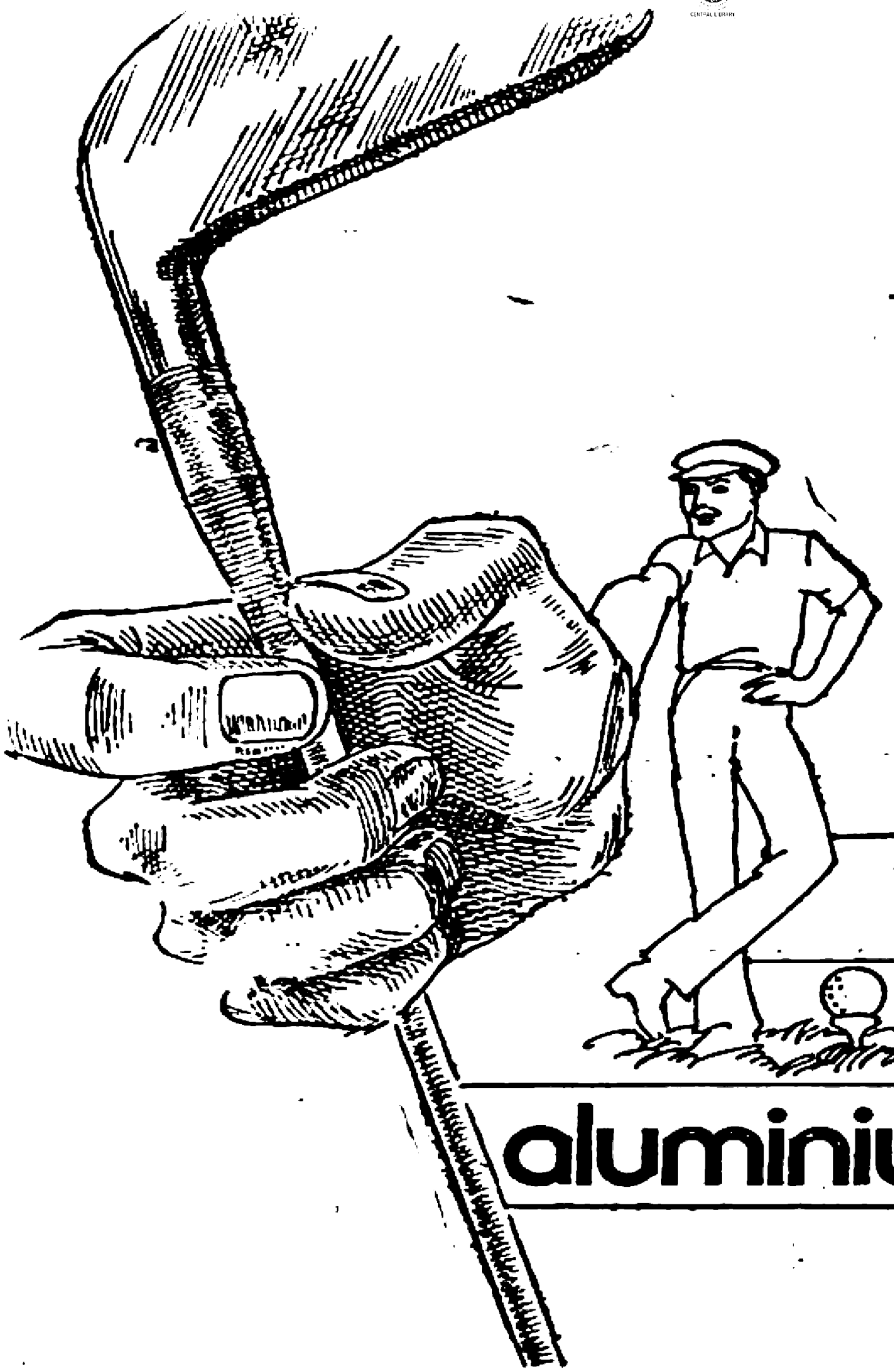

"Pass me my No 1 aluminium, plea

Not something you would have heard on the thirteenth hole some years back. But today, golf irons are being made of aluminium. The fact is, aluminium is being used, more and more, for things we had never imagined. And in India, Indian Aluminium has been the catalyst of this change.

The first to embark on aluminium production in this country, Indal has introduced almost the entire range of alloy in which rolled and extruded aluminium products are made in India. In its constant drive towards diversification, Indal has pioneered the use of aluminium in aircraft, currency, power transmission, irrigation tube transportation, packaging, housing and a host of other applications.

Indal pioneering. It's the shape of thing to come.

INDAL

Indian Aluminium Company, Limited
Anything's possible

CENTRAL LIBRARY

চেতনা

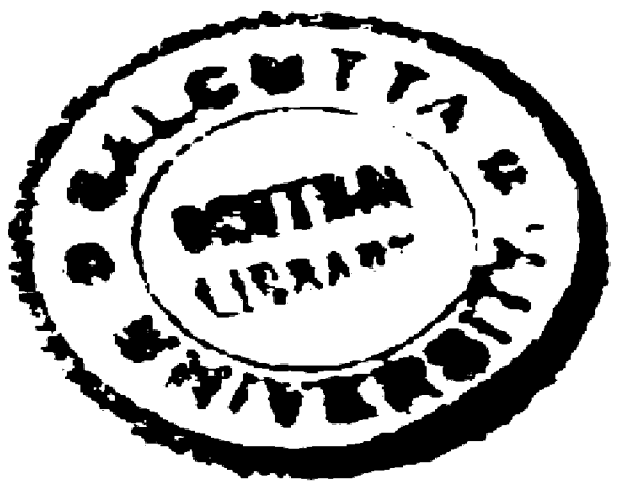

মহাবিদ্রোহ ও বাঙালী মানসিকতা

ইংরেজি কবিতা, 'পথের পাঁচালী' ও মণিকা ভাদুড়ী

(একটি সাক্ষাৎকার)

ডেভিড কফ্-এর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজ

কবিতা ★ থিয়েটার ★ ও অন্যান্য

হীনযান

৭ বছর ২ সংকলন

মারাঠি গল্প ১

আঁধারের বন্দী / বাবুরাও বাগুল

প্রবন্ধ

মহাভারত / পুরুষোত্তম লাল ২১

নীলিমা দেবী : কবির মৃত্যু / দিলীপকুমার চক্রবর্তী ২৭

মহাবিদ্রোহ ও বাঙালী মানসিকতা / রঞ্জিত সেন ৫৫

স্মৃতিচারণ ৬১

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ কৃ. ব.)

সাক্ষাৎকার ৪৩

ইংরেজি কবিতা, 'পথের পাঁচালী' ও মণিকা ভার্মা

সমালোচনা ৬৭

The Brahmo Samaj and the shaping of the modern Indian mind : David Kopf /

শ্যামশ্রী লাল

কবিতা ৭৫

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বিনয় মজুমদার কেতকী কুশারী

ডাইসন কালীকৃষ্ণ গুহ সুরজিৎ ঘোষ সুভাষ ঘোষাল

নির্মল হালদার

পুস্তক-পরিচয় ৮৫

নাটা-সমালোচনা ৮৭

বাদল সরকারের নাটক

সম্পাদনা : সুভাষ ঘোষাল

প্রচ্ছদ : সুনীল দাস

CENTRAL LIBRARY

মানসিক প্রশান্তি এবং বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা লাভ করুন

যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত ও স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আপনিও অবশ্যই মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন।

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন।

★

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩১

রেজিষ্টার্ড অফিস : "পিয়ারলেস ভবন"

৩, এসপ্লানেড, ইষ্ট,

কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

যোট সম্পদ—২৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে

★ ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান। ★

With best compliments from :

NATIONAL

TOBACCO

COMPANY

A Division of Duncans Agro Industries Ltd.

1 & 2 OLD COURT HOUSE CORNER

CALCUTTA-700 001

CENTRAL LIBRARY

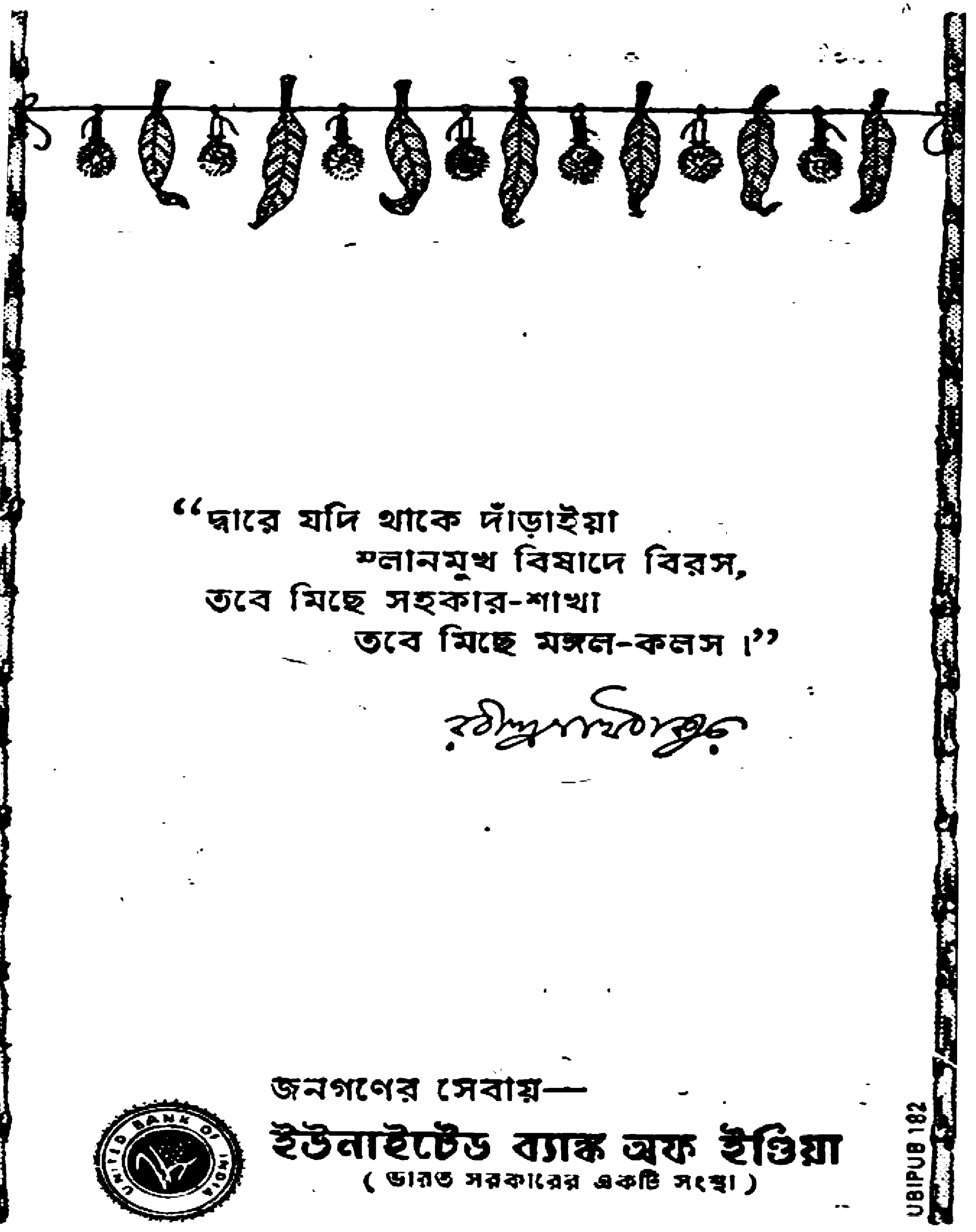

"দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণের সেবায়—

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBIPUB 182

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

মূলত জ্যোতিরিন্দ্র

চলে গেলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। অর্থাৎ এমন একজন লেখকের মৃত্যু হলো যিনি তাঁর আয়ুষ্কালে তাঁর লেখাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সাহিত্যের পাঠকেরা জানেন লেখকদের মধ্যে এই জাতীয় লেখকের সংখ্যা কতো কম। সংখ্যাটি যে আন্দামানের লুপ্তপ্রায় অথচ অবিমিশ্র জারোয়া গোষ্ঠীর মতো একটি নগণ্য সংখ্যা তা কোন গবেষণা ছাড়াই বুঝে নেওয়া যায়। যে শব্দটিকে লেখকের বিশেষণ হবার পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের অথবা সবচেয়ে ঘৃণার ব'লে তিনি মনে করতেন তা হলো 'গতানুগতিক'। তিনি সব সময়েই চেয়েছেন গতানুগতিকতা পরিহার ক'রে গতিতে পৌঁছতে। বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসেবে তাঁকে খুব ভাবালুতা-মুক্ত এবং কঠিন মন্তব্য করতে শুনেছি। আমাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র পুরুষ যাঁর লেখা নিয়ে তাঁকে দুকূলপ্লাবিত শ্রদ্ধায় অন্বিত হতে দেখেছি। মনে পড়ে পিকনিক গার্ডেনের ঘরটিতে বসে সকালের সমর্থন নিয়ে বলে উঠেছিলেন—"প্রেরণা? নিশ্চয়ই পেয়েছি। পেয়েছি বই কি। তাঁর ছোট গল্প কৈশোর বয়স থেকে আমাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের যে পরিব্যাপ্তি, 'পোস্টমাস্টার'-এর যে আন্তরিকতা তা আমাকে প্রবলভাবে আজও নাড়া দেয়।" রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে এই স্বীকারোক্তি করার সাহস তাঁর ছিলো। কিংবা বলা যায়, এই স্বীকারোক্তি না-করার উন্নাসিকতা থেকে তিনি মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বিশেষ ক'রে তাঁর ছোটগল্পে পাওয়া যাবে এই মনের মুক্তি; কী বলবো, কী ক'রে বলবো

CENTRAL LIBRARY

এইসব চিন্তার প্রতি সক্রিয় শ্রদ্ধা। এমন শ্রদ্ধা ছিলো বলেই তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখক। দেশকালের অবহেলার ছাপ ছিলো তাঁর শেষ-যাত্রায়। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে, তিনি চর্মচক্ষে দেখে যেতে পেরেছেন তাঁর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ 'আজ কোথায় যাবেন' নিয়ে 'হীনযান'-এর পৃষ্ঠায় ভাবনা।

গ্রন্থ প্রকাশনাও যে শিল্পকর্ম, সেখানেও যে পাওয়া যেতে পারে রুচির ঠিকানা, এ-কথা ডিকে-র সঙ্গে সিগনেট প্রেসের মাধ্যমে যিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেই নীলিমা দেবী আর নেই। সেই প্রোজ্জ্বল বিদুষীর অবসানে আমরা সন্তপ্ত। তাঁর একটি সঞ্চারপথ এ-সংখ্যায় অনুস্যূত করা হলো ঋণ স্বীকারের জন্ত।

সুভাষ ঘোষাল

মারাঠি গল্প

আঁধারের বন্দী

বাবুরাও বাগুল

সূর্যের স্নেহে ভরা সুন্দর সন্ধ্যাটা, সূর্য পশ্চিমের দিকে যাওয়ার ফলে কালছিটে হতে লেগেছিল। এমন এই উদাস সময়ে রামরাও দেশমুখের মৃতদেহ চিতায় পুড়ছিল। চিতাগ্নিতে খুলিটা ফেটে যেতেই এক অদ্ভুত আওয়াজ হল যা'শুনে আশেপাশে দাঁড়িয়ে লোকেরা হাহাকার করে উঠল। ঠিক তখন রামরাওয়ের ছেলে দেবরাম তার বিশাল, তীক্ষ্ণ, ইস্পাতের মত, দাপটে দেহটা ঘুরিয়ে নিল আর চিতার দিকে [redacted] স্নায়ুভরা পাহাড়ের মত শক্ত পিঠ করে দাঁড়াল। হাত মুঠো করে সেটাকে রাগের চোটে ও হাওয়ায় ছুঁড়ল আর বিড়বিড় করে বলল,—"বানে তোকে.....!"

আর বাঘের সমান ক্রূর, কঠোর স্বামীর এই বিচিত্র শোকাবেগ দেখে দেবরামের স্ত্রী কমলা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তখন শেষ যাত্রায় উপস্থিত অন্যান্য লোকজন দৈত্যের-মত-দেখতে দেবরামের শোক, আর কমলার ক্রন্দন শুনে আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকতে লাগল, কাঁদকাঁদ মুখ করে দেবরামের সেই তীক্ষ্ণ, সবল শরীরের দিকে দেখতে লাগল, আর তার দিকে তাকাতে তাকাতে তারা দেবরামকে ভয় পেতে লাগল।

কয়েক বছর ধরে যে-ভাবনা তার মনে ঘুরছিল বাপ খতম

হতেই সেগুলি স্থির হয়ে গেল আর সে বাপের বিধবা—বানুকে খুন করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাগের নেশায় বাপের জ্বলন্ত লাশ ফেলে গ্রামের দিকে রওনা হল। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ষাঁড়ের মত তার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকেছিল। খুনের চিন্তায় তার সম্পূর্ণ শরীরে এক বেগ এসে গিয়েছিল, তাই তার পিঠের উপরের আর হাতে পায়ের ছোট বড় সমস্ত পেশী থেকে থেকে সাপের মত কেঁপে উঠত।

দেবরামের এই প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখে রামরাও দেশমুখের অন্তিম যাত্রায় উপস্থিত সমস্ত লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর তার পিছন পিছন ছুটছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে গিয়ে তাকে বাধা দেয়নি। উপস্থিত প্রত্যেকে তার মেজাজি মাথাটাকে ভাল করে চিনত, আর চিনত তার শক্তি, খাসা মুঠোটাকে, যেটা দিয়ে সে হাড় পর্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে। তাইতো ভিড়ের মধ্যে একজনও জিভ নাড়াবার সাহস পাচ্ছিল না।

আর সে'ত বানুর খুন করার জন্য বালিতে জোরে জোরে পা ফেলে দ্রুত বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার পায়ের নিচের শিহি বালি তার ভার সইতে না পেরে খস্‌খস্ করছিল। ইট-পাথর তার কড়া গোড়ালির তলা দিয়ে চটপট করে সরে যাচ্ছিল, যাতে গায়ের ছাল না উঠে যায়। আর থেকে থেকে দেবরামের মাথাটা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠছিল। বানুকে খুনে খুনে গুলি করার জন্য, বাপের ভয়ে কুড়ি বছর চেপে রাখা হাত আজ নিশপিশ করে উঠল। বানুর রসাল, কচি কোমরে লাথি মারবার জন্য তার মন অধীর হতে লাগল। গোড়ালি অব্দি ওর কালো রেশমী চুল ধরে টানতে টানতে ওকে ক্ষীণ করে দেবার জন্য তার

হাত ছট্‌ফট্‌ করছিল, আর এই সবের জন্য এক মুহূর্ত দেরিও তার সইছিল না। বানু বোধহয় ওর ওপরে তুক করেছে এই ভুল ধারণা করে, চিতার দিকে একবারও না তাকিয়ে লোকজন হাঁপাতে হাঁপাতে তার পেছন পেছন ছুটছিল।

এই মস্ত বড় ভিড়ে, সবার আগে ছিল কচি কোমরের, ছিপ্‌ছিপে চেহারার, কোমল কাঁধের, রেশমী কাপড় প'রে কমলা। ও প্রাণ মুঠোয় নিয়ে স্বামীর পিছন পিছন যাচ্ছিল। দুই দিনের কান্নাকাটিতে আর উপোস-টুপোসে ও একদম ধনেপাতার মতন শুকিয়ে গিয়েছিল। তাও বানুর ভয়ে নিজেকে সাম্‌লে সাম্‌লে ও স্বামীর পিছন পিছন ছুটছিল। দেবরাম সবাইয়ের আগে—উন্মত্ত উদ্বেগে। বানু যে ওর স্বামীকে তুক করেছে এই ভাবনাটি ওকে বাঘের মতন ছিঁড়ে খাচ্ছিল, আর দেবরামের পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

কমলার বুড়ো বাপ ওর চেয়েও বেশী ঘাবড়ে গিয়েছিল। এখন কমলীর কি হবে এই ভাবনায় সে খুব চিন্তিত। বগলে পাগড়ি আর জুতো চেপে ধরে তার লাল টুক্‌টুকে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে দিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার কমজোরী পা ছোট ছোট ইট-পাথরেও হোঁচট খেত, তাই বড় কষ্টে টলমল করতে করতেও সে ছুটছে, কেবল তার মেয়ের জন্য।

আর পিছনের সমস্ত ভিড় বানুর নামে যা-তা গালাগাল দিয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যেকের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে এক রূপসী পেত্নী—তার রূপের জাল নিয়ে এসেছে সবাইকে ঠকাতে। তার পাগলা দৌলতের জন্য ওই দেবরামকে তুক করেছে, এখন দেবরাম অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে, রক্তবমি করে ছট্‌ফট

করতে করতে মরবে, এইসব কল্পনায় পুরো ভিড় যেন শিউরে উঠছিল।

হঠাৎ দেবরাম রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল আর কাঁপতে লাগল—সেই দেবরাম, যে কিছুক্ষণ আগে আবেগে উচ্ছলিত ছিল—যেন তাকে কোন অদৃশ্য হাত গিলে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনের লোকেরা যারা এতক্ষণ তার পিছন পিছন ছুটছিল তারা যাহোক্ করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টায় পরস্পরের উপর ঢলে পড়ে আর শেষকালে স্থির হয়ে দাঁড়ায় এবং চোখে প্রাণ এনে দেবরামের দিকে চেয়ে থাকে। সবাই তখন ভাবছে যে এই হয়ত দেবরাম রক্তবমি করবে, বেদনায় ছটফট্ করতে করতে নিজেরই চুল ছিঁড়বে, আর মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে হাত পা ছুঁড়ে মরে যাবে। প্রত্যেকের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল; দমবন্ধ হয়ে আসছিল। এমনকি দেবরামও গ্রামের দিকে মুখ করে, হাত পা কাঠের মত শক্ত করে, আকাশের দিকে চেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে সে আবেগে গা ঝাড়ে আর নিচে ঝুঁকে মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে ইট খুঁজতে লাগে। ইট পেতেই সে হাত উপরে তুলে, ভিড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। তেমনই গোলমাল থেমে গেল। সবাই চুপ···। নিজের মাথাটাকে ইট থেকে বাঁচাবার জন্য সবাই মাথা বাঁচিয়ে পিছনে সরে গেল। কমলা দুই হাত দিয়ে মাথাটাকে চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল আর হাঁটুর মধ্যে মুখখানি ঢুকিয়ে আগুনের মত চিৎকার করল,—"বানি, খান্‌কি, ডাইনি, তুই যে আমার সর্বনাশ করে দিয়েছিসরে···ভগবান তোরও করবে···।"

"বানি", বলে দেবরাম গ্রামের দিকে আরও জোরে হাঁটতে

লাগল। আর সে বেঁচে গেল বলে ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষ বানুকে যা-তা বলতে লাগল।

"ধরে আন পেত্নীকে। বিবস্ত্র করে রাজ্য ঘুরিয়ে আনব", কানুজি পাটিল বলল।

"না, না, তার চেয়ে বিবস্ত্র করে লাগাম দিয়ে বেঁধে, আর চাবুক দিয়ে পেটাতে পেটাতে নিয়ে আসব, আর দেব এই চিতার উপর ফেলে!"—সেক্‌রা তার কল্পনাটাকে সবাইর সামনে সাজিয়ে বলল।

"এটা ভাল বলেছ। বেশ আগুনের তামাশা দেখা যাবে। কুড়ি বছরে রেণ্ডির নথ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। আর আমার বলারও থাকবে যে, হাঁা সতী গেছে" পুলিশ পাটিল বানুর লাবণ্য দেখবার জন্য উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল।

"হুঁ, পুড়িয়ে ফেল।"—কুলকার্নি নাকে নস্যি দিয়ে বলল।

"পোড়াবই তো।"—কয়েকটি ক্ষুব্ধ আওয়াজ বলে উঠল।

"এর মত বজ্জাত মেয়েদের এরকমই শাস্তি পাওয়া উচিত, না হলে এই কলিযুগের মেয়েদের আর শিক্ষা হবে না। এই মেয়েটা ঠাকুর দেবতাদেরও কিছু রাখল না। গোটা কুড়ি বছর ধরে গ্রামটাকে নষ্ট করে দিল। দেশমুখদের বাড়ীটা ভ্রষ্ট করে দিল। ওদের বাড়ীতে একজনকেও টিকতে দিল না। রামরাওকে কক্ষণো বাড়ী থেকে বেরোতে দেয়নি। মরা অব্দি বেরোতে দেয়নি। দেশমুখ বংশের শেষ প্রদীপ—দেবরাম, তাকে পাগল করে দিল, আর নিজের পেটের বাচ্চা—তাকেও পাগল করে

ছাড়ল— সে দিনরাত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে সেখানে শোয়— রাস্তাঘাটে, পাহাড়ের কাছে, যে কোন ক্ষেতে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আবার তারই দিকে কোদাল নিয়ে তেড়ে যায়।" সুদামা চাপা গলায় বলছিল, তখন রুনঝা তাকে থামিয়ে বলল,—" আরে সুদামা, গত পোনের দিনে সেই পাগলা ছোঁড়া, দৌলত পোনের খানা ঝগড়া বাঁধিয়েছে। কালকেইতো পান্ডু বামনের নেড়ী বিধবার ঠাকুরঘরে ঢুকে খাবার জল চাইতে লাগল, আর সে দেয়নি বলে ঝগড়া করতে লাগল।

"তাহলে কি মেরে ফেলল বুড়ীটাকে?" সুদামা জিজ্ঞেস করল।

"বুড়িটা বলে দিল, মরে যাব তাও ভাল কিন্তু তোকে জল আমি দেব না।"

"তারপর?"

"আর কি? সর্বনাশ করে ফেলেছে·····তুমি বল এর মত মেথর, মহার, চামারের ছোক্‌রা কি কখনও বামুনের ঘরে ঢোকে? জাতপাত, দেবধর্ম ছোঁড়াটা সব ভেঙে চুরমার করে দিল" সুদামা নির্দোষ বানুকে গালাগাল দিতে লাগল। তার সেই ভয়ঙ্কর গালাগাল, আর বানুর সম্বন্ধে এই সব গুজব শুনে নানা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, "বাবারে, তোরা চুপ করছিস না কেন? সে চাইলে তোদের ধুতি খুলিয়ে শাড়ী পড়িয়ে ছাড়বে। থাম্‌টাদের মত করে নাচাবে—তালি মেরে মেরে। আর না হলে অন্ধ করে দেবে·····চুপ কর।"

শংকর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "নানা, ঠিকই বলেছে।"

তা শুনে সেই সমস্ত সংস্কারগ্রস্ত গাঁয়ের লোকেরা বানুর ভয়ে চুপ করে গেল। বানু গাঁয়ের লোকেদের দু'চক্ষের বিষ। তাও তারা গত কুড়ি বছর ধরে চুপ করে ছিল কেবল তার নামে এসব গুজব শুনে। না হলে রাম রাও ওকে যতই আড়াল করে রাখুক না কেন তারা বানুকে কিছুতেই সেই গ্রামে থাকতে দিত না। ও বাড়িতে আরামে থাকে, ওর কোন জিনিসের অভাব নেই। রাম রাওকে নিজের হাত দিয়ে খাওয়ায়। ওর জন্যই দেবরামের মা মরে গেল: অন্যান্য লোকেরা বাড়ি ছেড়ে চলে। দেবরামের প্রথমা স্ত্রী এই ভ্রষ্টাচার সইতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে গেল আর এল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা—তারও এই বাড়িতে কোন দাম নেই। তাইতো সে প্রিয় গ্রামটা বানুকে দুই চক্ষে দেখতে পারত না—তাকে ঘৃণা করত। তাকে মেরে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেবরাম বাঁচবে না মরবে এই চিন্তায়; আর বানুর ভয়ে তারা দেবরামের পিছনে অনুসরণ করছিল। দেবরাম গ্রামে ঢুকতেই চারিদিকে এক হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেল, গণ্ডগোল লেগে গেল। দেবরাম তেড়ে আসবার ভয়ে প্রত্যেকে তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগল। যে যার নিজের ঘরে ঢুকতে লাগল। দেবরাম কিন্তু তাদের লক্ষ করেনি। সে সোজা, কাউর দিকে না তাকিয়ে ঝড়ের মত চলছিল। প্রতিশোধের উন্মাদে সে সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তার মাথায় তখন একই চিন্তা। চোখের সামনে একই দৃশ্য। তার চোখের সামনে সমানে বানুর আর রাম রাওয়ের বন্দুকের ছবি ভাসছিল। তার কানে সে বানুর আর বন্দুকের গর্জন শুনতে পাচ্ছিল। সে অন্ধ, ক্ষুব্ধ, অত্যাচারী বন্যার মতন দৌড়তে লাগল। তাই সমস্ত গাঁয়ের লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। বানু যে তাকে 'খণ্ডবা' অথবা 'বেডার'

নামে তুক করে পাগল করে দিয়েছে এই ভেবে সব স্ত্রী-পুরুষেরা বানুকে গালাগাল আর শাপ-শাপান্ত করছিল।

আর সে'ত বাড়ির কাছে যেতেই লাফিয়ে লাফিয়ে চেঁচাতে লাগল। প্রচণ্ড বেগে পাঁচিল ডিঙিয়ে আর দুমদাম করে সিঁড়ি চড়ে সে বাপের ঘরে ঢুকল। আংটায় ঝোলান বন্দুকটা ঝট্ করে টানল আর চেঁচিয়ে বলল,—"বানে, মরবার জন্য 'তৈরী' হ!"

যে বানু রাম রাওকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছে, ওরই খাতিরে মাতৃত্বের কথা না ভেবে দৌলতকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সেই শান্তশিষ্ট স্বভাবের বানু ঘরে একা একা বসে কাঁদছিল, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সেই করুণায় ভরা অন্ধকার ঘরে ও হীরের টুকরোর মত চম্‌কাচ্ছিল। এই আঁধার আর দুঃখ ওর অদ্ভুত সৌন্দর্যকে এক বিচিত্র আভা দিচ্ছিল। আর তার সেই মনোহর রূপ দেখে দেবরামের মন সংশয়ে দুলতে লাগল। সে ভাবতে লাগল যে বানুকে গুনে গুনে গুলি করে সে তার মায়ের ব্যথিত মরণের প্রতিশোধ নেবে না কি তাকে উপভোগ করবে। প্রত্যেক মুহূর্তে বানুর সৌন্দর্য নতুন করে ফুটে উঠছিল যা দেখে দেবরামের মনে বাসনার আগুন জ্বলে উঠছিল।

আর বানু দুঃখে যেন মূর্চ্ছা গিয়েছিল। পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসেছিল। দেবরামের চোখের হিংস্রতা ও দেখেনি, তাই এটাও বুঝতে পারেনি যে সে তার মান-সম্ভ্রমের আর প্রাণের শিকারী হয়ে এসেছে। বরং বাবা মারা যাবার দুঃখে সে পাগল হয়ে গেছে এই ভেবে ওর আরও বেশী কান্না পেতে লাগল। নিজের চোখ মুছে ও দেবরামকে অত্যন্ত করুণ হয়ে বলল,—"বাবা দেবরাম, দুঃখের চোটে অমন সাহস হারাস নি। আমার দৌলত

পাগল। আমি ওর জন্য, আমার জন্য কিছু চাইব না। এই গায়ে দেওয়া কাপড় পরে আমি বেরিয়ে যাব। উদ্‌গত কান্নার চাপে ওর গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছিল না।

"তুই যেতে পারবি না·····আর তুই আমাকে দেবরাম বলে ডাকিস না। আমি তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আর·····"

"খোকা, তুই আমার বয়সের সমান হলেও, আমি যে তোর বাপের বউ ছিলাম, আর বাপের বউতো ছেলের মা'ই হয়। নাই বা হলাম তোদের জাতের।"

"তুই আমাকে খোকা বলবি না। আমি·····"

"না খোকা, আমি এখানে থাকব না, কোন ভয় নেই।"

"তোকে আমি যেতে দেব না। রাস্তা ঘাটে রুমাল নাচিয়ে বেড়ানোর চেয়ে তুই আমার কাছে থাক। আমার রেণ্ডি থাক···"

"দেবরাম! খোকা!"

"আমি দেশমুখ! এক বাজারের মেয়ের, ছোট লোকের, নিচুজাতির মেয়ের, বেশ্যার ছেলে? বজ্জাত মেয়েদের কখনও ছেলে থাকে না। থাকে শুধু বাপ।"

"দেবু!" রাগে আর ভয়ে ওর সারা দেহে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য ও চারিদিক খুঁজতে লাগল, কিন্তু

পালাবার কোন জায়গা পেল না। তখনই ওর জ্বলন্ত মন থেকে ও এক চিৎকার করে উঠল, "দৌলত !"

"দেবরাম ! দেবধর্মের জন্য অন্তত মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ। দুঃখে মাতাল হয়ে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনিস না।" ও দেবরামের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য পাগলের মত এদিক ওদিক দেখছিল, এমন সময় স্বামী মরে গেছে নাকি অন্ধ হয়ে গেছে এই ভয়েতে কমলা ঘরে ঢুকল—তেমনি বাসু চেঁচিয়ে বলল, —"কমলা, আমাকে বাঁচা·····"

"ও তোকে বাঁচাবে·····এনে, তোর কাপড় খুলছি।" "ওর খোঁপাটাকে ধরে ওকে মাটিতে ফেলবার জন্য দেবরাম ছুটে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কমলা এগিয়ে গিয়ে দেবরামের কোমরটা জড়িয়ে ধরল এই ভয়ে যে, এখনই হয়ত বাসু তুক করে ওর স্বামীকে অন্ধ করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে বাসু নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে অন্য দরজা দিয়ে অলিন্দে গেল, আর সামনের ঘরে ঢুকে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল।

"ছাড়", বন্দুকের ঘোড়া টেনেও গুলি বেরল না দেখে দেবরাম বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আর স্ত্রীর হাত কোমর থেকে ছাড়িয়ে ওকেও দূরে ঠেলে দিল।

ততক্ষণে বাসু অত্যন্ত দ্রুতবেগে সিঁড়ি নেবে গিয়ে সোজা সামনের গলি দিয়ে পালাচ্ছিল।

নিচে ভিড় করে দাঁড়িয়ে সমস্ত লোকেরা ওর ভয়ে সরে গিয়ে ওর জন্য রাস্তা করে দিচ্ছিল। ওপরে যে কি উৎপাত

হয়েছে. সে দেখবার জন্য গ্রামের উচ্চ এবং নামকরা প্রতিষ্ঠাবান লোকজন সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেল। কমলা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল আর দেবরাম বন্দুকে টোটা ভরছিল। তার যমের মত ভয়ানক মুখ দেখে কেউ ওকে কোন প্রশ্ন করেনি।

আর কুড়ি বছরে যে একবারও নিচে নামেনি সেই বানু নিজের মান সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটছিল। ঘরের দ্বারে, উঠোনে. আর গলিতে যে লোকেরা দল বেঁধে বেঁধে দাঁড়িয়েছিল তারা বানুর দিকে আশ্চর্য হয়ে দেখছিল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

"কি মাল!" বানুর সৌন্দর্য যে স্তব্ধতার আর গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছিল তা সইতে না পেরে একজন বলল। সাথে সাথে অন্যান্য লোকজনের অন্তরের বিষ উপরে উঠে এল আর তারা বানুকে ভৎর্সনা করতে লাগল। একজন যা অবস্থা করল তা দেখে বানুর গায়ে আগুন জ্বলে উঠল। সে চট্ করে আঁচলটা উপরে টেনে নিল—তেমনি ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এক নিষ্ঠুর হাসির ঢেউ উঠল।

তার দোলানি, স্নিগ্ধ কোমরের দিকে তাকিয়ে সামনের ঘরের নাম। তামাকের ঘোঁট গিলে বলল, কুঁচির ভাঁজ আর ঐ হেলিয়ে দুলিয়ে হাঁটার কায়দা দেখ···।" নামার এই বর্ণনা শুনে সুকা উত্তেজিত হয়ে বলল, —"দেবরাম, ভালয় ভালয় ছেড়ে দিয়েছে দেখছি। আমার মত কেউ হলে বিয়ে করা বৌয়ের মত ব্যবহার করে তবে ছাড়ত···।" তখন তার স্ত্রী ভেতর থেকে

বলল,—"তোমাদের জাতটাই তো জানোয়ার। অবশ্য এক বেশ্যাই বটে : তবু ক্যোন লাজ-লজ্জা, দেবধরম··· ।"

"কী বলছ গাধার মত ! ওকি আর তোমাদের মত বৌ—ও হচ্ছে এক ডাইনী···ওকে প্রত্যেকের ধরা উচিত ।"

প্রভোকে বানুকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল, ওকে ঠুকে ঠুকে কথা বলছিল। এইসব কথা যাতে ওর কানে না যায় তাই ও আগুনে ঘেরা পাখীর মত পাঁই পাঁই করে ছুটছিল। আর সেই অবহেলার আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় ও গলা চিরে চিৎকার করছিল,—"দৌলত !"

কিন্তু পাগলা দৌলত যে এসে ওকে বাঁচাবে তা ও ভাবেনি। মানতে পারেনি। কারণ দৌলত ওকে জন্মের শত্রু মেনে ওর ছায়া পর্যন্ত গায়ে পড়তে দিত না। ওর সঙ্গে কথা বললে বা আদর করে ডাকলে দৌলত ভীষণ রেগে যেত। রাগের নেশায় কতবার সে বানুর গায়ে হাতও তুলেছে। একবার তো সে বানুকে খুন করতে গিয়েছিল। ওকে পাপিনী বলে ভাবত। সেই দৌলত আমাকে এই বদমায়েশ গুণ্ডাদের দল থেকে বাঁচাবে তা বানু ভাবেনি। বরং সে এই সবাইয়ের চেয়ে বেশী করে ওর ঠাট্টা, নিন্দা আর পরিহাস করবে বলে ওর বিশ্বাস ছিল। আর হয়ত তার প্রতিজ্ঞানুসারে সে জোরে জোরে হেসে আজই আমায় খুন করবে বলে ভাবছিল। এই কল্পনায় ও শিউরে উঠল আর দৌড়তে লাগল।

"বানু বেটা তোকে···" এক ভয়ঙ্কর গালাগাল ওকে ষাঁড়ের মত গুঁতিয়ে গেল। ও লজ্জায় মাথা নিচু করল। এক

প্রচণ্ড হাসি ওকে হাতির মত মাড়াতে লাগল, আর ওর আত্মা আক্রোশ করতে লাগল, "দৌলত !"

"ছেনাল, বজ্জাত ! তোর মত মেয়েমানুষ তিনভুবনে হয়নি। এর পরে কখন হবেও না। পেটের বাচ্চা তোর সুখে বাঁধা হয়ে পড়ছে বলে তাকে পাগল করে দিলি··আর পোয়াতি হলে স্বামী ছেড়ে চলে যাবে বলে তুই ঔষধ দিয়ে পেটের ফল নষ্ট করে দিলি···ভোগ এবার সেই পাপের ফলগুলো।" এক বয়স্ক মহিলা বলল আর ওকে গালাগাল দিতে লাগল, অভিশাপ দিতে লাগল। আর বানু ঐ মহিলার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। অন্তরের আগুন বুঝিয়ে বলবার জন্য ওর ঠোঁট কাঁপছিল। যেই ও নিজের অন্তরের ব্যথা বলবার জন্য মুখ খুলল তেমনই সেই বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল—"পালা এখান থেকে। না'হলে রাক্ষসটা এসে আমার রামুকে জ্বালাবে···দূর হ !"

"এই যে পিসিমা, ওকে এমন সব কথা বলবেন না। ও তুক করে যা তা অবস্থা করে ছাড়বে।" বুড়ির বৌমা নিজের বাচ্চাকে আঁচল দিয়ে আড়াল করে বলল। আর বুড়ির গালা-গালের চেয়েও তার বৌমার ভয়ই বানুকে জ্বালাতে লাগল। সে আবার ছুটতে লাগল।

ও ছুটছিল, আর ওর সামনে ছুটছিল ওর জীবনের সবচেয়ে সুখের আর আরামের কুড়িটা বছর। এই কুড়িটা বছরে ও এক মুহূর্ত সত্যিকারের মা ছিল না। শুধু রামরাওয়ের প্রিয়া আর কামিনী ছিল। দৌলতের ছোটবেলাকার প্রত্যেকটা দিন যেন নিষ্ঠুর, দুঃখদায়ী দানবের মত ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

ওর প্রাণ দুঃখের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছিল, তাই ও চিৎকার করে উঠল,—"দৌলত !"

দ্বারে দাঁড়িয়ে সমস্ত লোকেরা ওর চিৎকার শুনছিল, কিন্তু কারও মনে কোন দয়া হয়নি। ওর চিৎকার কারও মনে আঘাত দেয়নি। বরং ও যত বেশী ভেঙে পড়ছিল, তারা উল্টে তাকে তত বেশী গালাগাল দিচ্ছিল।

আর এই প্রত্যেকটা প্রহারে ওর কাছে আরও স্পষ্ট হতে লাগল যে দৌলত পাগল নয়, বোবা নয়। দৌলতের খিট্‌খিটে স্বভাবের পিছনের সবকটা রক্তমাখা রহস্য ওর কাছে এক এক করে পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল। মা থাকতেও, অপরাধী, নিষ্ঠুর বাড়িটা আর সংস্কারগ্রস্ত এই গ্রামটা তাকে ছোটবেলার থেকে কাকের মত খোঁচা মেরে মেরে পাগল করে দিয়েছিল। অপমান শুনে শুনে তার মন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টা আর পরিহাস শুনে তার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর এই সব অত্যাচার সহ্য করেই ও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল এই সব বুঝতে পেরেই বানু সম্পূর্ণভাবে এক মহীয়সী মাতা হল। আর গরম চাটুর উপরে এক ফোঁটা জলের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগল দৌলতকে দেখবার জন্য।

"হাঁপিয়ে গেছে। খবু শালাকে। কর উলঙ্গ।" কে যেন মহাবলী বীর হনুমানের মন্দির থেকে চেঁচিয়ে বলল।

"আরে, কিন্তু সে এমন কি করেছে ? ও যদি যাদুটোনা জানত তবে প্রাণ বাঁচাবার জন্য এরকম বাইরে আসতই বা কেন ? এত খাসা রূপ থাকা সত্ত্বেও তের বছর বয়স থেকে বাপের সমান

রামরাওয়ের সঙ্গে সতী সাবিত্রীর মত থেকেছে। গুণ তার প্রচুর, তাইত সে সারা রাজ্যের বদ্‌মাইশ বুড়ো, রামরাও, সবছেড়ে এর পেছনে লাগল, যেন ওই সব। ও চাইলে গোটা সম্পত্তি সঙ্গে করে নিয়ে পালাতে পারত। দৌলতকে অমন পাগলের মত ঘুষে বেড়াত দিত না। পাঠশালায় ভরতি করত আর রাজার মত খাতির যত্ন করত। টাকার লোভে যে কেউ তাকে মেয়ে দিয়ে দিত।

"মিথ্যে কথা, ও যা ফাজিল মেয়ে, বুড়োকে নিয়ে সখ মিটলনা তাই তাকে মেরে ফেলে এখন ছেলেটাকে ধরেছে। কিন্তু ছেলেটা তেমনি ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"ঠিকই বলেছ, এদের মত মেয়েমানুষেরা প্রত্যেকটা জোয়ান সুন্দর ছেলেকেই স্বামীর মত করে দেখে।"

"ভগবানের মন্দিরে কি সব নোংরা কথা বলছ?" মহাবলীর মন্দিরের মধ্যে প্রত্যেকটা কথা ওকে কাঁকড়া-বিছের মত কামড়াচ্ছিল। ও অস্পৃশ্য সমাজের এক গরীবের মেয়ে। খণ্ডোবার নামে মানসিক করে হয়েছে বলে ওর নাম বাসু রাখা হল আর মানসিকের অনুযায়ী ওকে দেবদাসী করা হল। ওর রূপ দেখে পাগল হয়ে যাওয়া নানারকমের লোক টাকা নিয়ে ওর বাপের কাছে আসতে লাগল। কিন্তু ওর বাপ ওকে কারুর হাতে তুলে দেয়নি। মানসিকের জন্য যাতে ওর জীবনের সর্বনাশ না হয় আর ঢাক পিটিয়ে কিংবা হাজার জনকে বিয়ে করে যাতে ও বেশ্যাঘরে না যায়, তাই ওর বাপ ওর উপর প্রচণ্ড নজর রাখত। এমন সময়ে ওর সু-রূপের কথা শুনে রামরাও গেল—ধন এবং কথা দিয়ে ওকে নিয়ে এল।

যাতে রামরাও অরুচি হয়ে ওকে ফেলে না দেয়, তার মন উড়ে না যায়, নিজের উপর দেবদাসী হয়ে হাজারটা ঘরে পুজো দিয়ে, হাজারটা লোকের বাসনার তৃপ্তি মিটিয়ে পচে মরবার, বেশ্যা হবার সময় না আসে, তাই ও রামরাওয়ের কথায় কথায় নাচত আর ওকেও নাচাত। রামরাও রাগ করবে বলে ওর ছোট্ট দৌলতের যত্নের প্রতি অবহেলা করল। আর রামরাওয়ের কথা রেখে অপারেশন ও করে বসল যাতে পরে আবার ছেলেপুলে না হয়। কেবল ওর জীবনটা যাতে বরবাদ না হয় ব'লে, আর ও যাতে রামরাওয়ের বিরাট বাসনার দ্বিতীয় খেলনা না হয় ব'লে ও এই সব করেছিল।

এই ভয়ানক সত্যটা কারুর জানা ছিল না, জানাটা সম্ভবও ছিল না। কারণ গত কুড়ি বছরের মধ্যে ও কখনও কারুর সঙ্গে মেশেনি। আসলে ত লোকেদের ওর প্রতি সহানুভূতি হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সংস্কারগ্রস্ত গ্রামটা রামরাওকে ঘৃণা না করে ওকেই ঘৃণা করছিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় ফেলে দিয়েছিল।

"ধরবি নাকি রে···।" মহাবলীর মন্দিরের ভেতর থেকে একজন গলা ছেড়ে বলল।

"ধরি না।" কয়েকজন উত্তেজিত আওয়াজে বলল।

"আমি ধরবই।" যে মহাবলী বীর হনুমান সীতার জন্য লঙ্কা দহন করেছিল, সেই হনুমানের মন্দিরের মধ্য দিয়ে এক চ্যাংড়া ছোঁড়া লাফিয়ে নিচে নামল। তখন চারিদিকে শিসের এক ভয়ানক অশ্লীল আওয়াজ উঠল। সেই কর্কশ অশ্লীল আওয়াজ সারা গ্রামে বাতাস ভারি করে তুলল। চারিদিকে ছোটাছুটি

আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মহিলারা সব ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল। কয়েকজন পুরুষ ঐ ছোঁড়াটাকে বাধা দেওয়ার জন্য চেঁচাল, কিন্তু কেউ এগিয়ে গিয়ে তাকে থামাল না। শুধু এক বুড়ী তাকে জোরে জোরে অভিশাপ দিতে দিতে তার পেছনে দৌড়চ্ছিল। এক মহিলার দরজার সামনে কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে উস্কাচ্ছিল,—"কাশী, ধর ছুঁড়িটাকে. টান কাপড়। নীচু জাতির নাচিয়ে হয়ে দেশমুখ বাড়ীর বউ সেজেছিল। ধর···।"

"এসে গেছে," দেশমুখ বাড়ির দিক দিয়ে আর মোলান বাড়ির দিক দিয়ে একই গণ্ডগোল শোনা গেল। কাশীনাথ যেন সব গুলিয়ে ফেলেছে—সে পেছনে ফিরে তাকাতেই দৌলতের ছোরা তার পিঠের মধ্যে দিয়ে ঢুকে এফোঁড় ও ফোঁড় করে দিল।

"হারামজাদা বেটা কাশী!"

বানু ভয়েতে থরথর করে কাঁপছিল আর বন্দুকধারী দেবরামকে দেখে ও বাৎসলো উন্মাদ হয়ে ওর ক্ষীণ দুটি হাত আর শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে দিয়ে ডাক দিল, "দৌলত!"

"খুন! পাগলা দৌলত খুন করেছে!" মহাবলীর মন্দিরের ভেতর থেকে লোকেরা হাহাকার করে উঠল। আর দৌলতকে মেরে ফেলবার জন্য কয়েক জন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

"সরে যাও সব বাঁদর কোথাকার!" দেবরাম বিরাট গর্জন করল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই মন্দিরে ঢুকে পড়ল।

"দৌলত!" যে দৌলত অসংখ্য বেদনা আর বিষাক্ত উপেক্ষা সয়ে, অন্যায় সয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল সেই

দৌলতকে দেবরামের বন্দুকের গুলি থেকে বাঁচাবার জন্য বানু মা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দৌলত রক্তে মাখা ছুরিটা ওর সামনে তুলে ধরল, অমনি তার ভয়ঙ্কর মুখ আর চোখের হিংস্রতা দেখে তার প্রতিজ্ঞার কথা বানুর মনে পড়ল। ও এক পা পিছল। তক্ষুণি দেবরাম কাছে আসছে দেখে, কত বছরের স্নেহে আর মমতায় স্নেহশীল হয়ে বানু আবেগে এগিয়ে গেল। ও দৌলতের মধ্যে মৃত্যু আর দেবরামের মধ্যে দৈত্য দেখছিল, কিন্তু তখন আর ও কাউকেই ভয় পাচ্ছিল না। ওর ঘামে ভেজা হাত দৌলতের কাঁধে লাগতেই সে ওর গলা টিপে ওকে এক লাথি মারল। আবার নিজেকে সামলে ও আদরে ফুলে, ঢেউয়ের মত এগিয়ে গেল। তক্ষুণি দৌলত পিছিয়ে গিয়ে ছোরাটা সামনে বাড়িয়ে বলল, —"চণ্ডাল কোথাকার, পেছনে সর। আমি মরব যখন, তখনও তুই আমার গায়ে হাত দিবি না। আমি মরতে চাই!" জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধ তার সেই মুখ ও আবার ঠোঁট চেপে বন্ধ করে দিল। আর মায়ের স্নেহের জন্য, শব্দের জন্য আগ্রহী শরীর বানুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল। বানুর ভালবাসার জন্য ছোটবেলাকার ক্ষুধিত শব্দ যাতে আবার ক্ষুধিত হয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে না পড়ে তাই ও সেই হৃদয়ের জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে ফেলে দিল, আর তার এই ঘৃণায় ভরা ভয়ঙ্কর কথা শুনে বানুর প্রেমের বান এক নিমেষে উঠে গেল। ও পেছনে সরে গেল, তক্ষুণি ওর কাঁধের উপর দিয়ে দুই লাঠি সরে গিয়ে দৌলতের গায়ে গিয়ে লাগল। লোকেরা তাদের দুই মা-ছেলেকে লাঠি নিয়ে সাবধানে ঘিরে ধরল। দৌলতের সামনে তার মায়ের ইজ্জত নেবার জন্য দেবরাম বিনা সঙ্কোচে বানুর পিঠে গিয়ে ভিড়ল। ওর কোমল বগলের তলা দিয়ে তার পাঞ্জা ওর আঁচলের ভেতর ঢুকল আর দৌলত যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে ওখানে গিয়ে স্থির

হয়ে সাপের মত ছোবল মারতে লাগল। এক হাতের বগলের তলায় চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে সে ওকে চিৎকরে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। ও তার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তার কাছে বার বার মিনতি করছিল। আর সমানে দৌলতকে ডাকছিল,—"দৌলত, আমার খোকা, আমাকে বাঁচা!"

কিন্তু দৌলত পাষানের মত অবিচল রয়ে শুধু দেখতেই থাকল। তার মুখের উপরের ভাব একটুও বদলায়নি। তার চোখও নড়েনি। হাত কাঠের মত নিচে ঝুলছিল। তার কাকতাড়ুয়ার মতন নির্জীবতা দেখে দেবরাম ভাবল, এই সতের-আঠার বছরের কচি খোকাটা বোধহয় আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তাই ভেবে ওর বলাৎকার করার ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। বানুকে সে দুম্ করে মাটিতে ফেলল, তেমনি ও চিৎকার করল,—"দৌলত!"

"পাগলা, ভোলা দৌলত, দেখ এবার তোর মায়ের দিকে।" দেবরাম ক্রূর ভাবে দৌলতের বুকে ঘুঁষি মারল। দৌলত কাঠের গুঁড়োর মূর্তির মত একবার ডগ্‌মগ্‌ করে নড়ে উঠল, তারপর আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, দেবরাম নীচে ঝুঁকল ঠিক তক্ষুণি দৌলতের ছোরাটা অন্ধকারে একবার বিদ্যুৎ হেনে দেবরামের পাহাড়ের মতন শক্ত পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল আর সেই সময়ের মধ্যে পিঠের স্নায়ু, শিরা-উপশিরা ও পেশী ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে এল এবং আবার এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। দেবরামের পাশবিক বৃত্তি দেখে লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। দৌলতের ছোরা দিয়ে নিজের প্রাণ যাতে না যায় তাই ওরা সবাই মিলে তার মাথায় জোরে জোরে মারতে লাগল—ঢাকের লাঠি পেটানোর চেয়েও জোরে।

চারিদিকে তার বিদ্বেষে আর ক্রোধে ফুটন্ত রক্ত ছিটিয়ে পড়ছিল।

"আ·····," জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে কখনও মাকে "আই" বলে ডাকেনি, আজ ওর সেই ডাক শেষ করতে না দিয়ে তার ব্যথিত প্রাণ অতীতের রাত্তিরে বিলীন হয়ে গেল।

"আই·····," দেবরাম তার প্রাণের শেষ বেদনায় ভুগছিল। দেবরামের দেহের নিচে থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে বাম্বু দৌলতের চেপে-বন্ধ-করা মুঠো খুলে ছোরাটা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। ও জামা ছিঁড়ে একদম ন্যাকড়ার মত হয়ে গিয়েছিল। ওর দাঁতের তলায় চাপা আঁচলটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। খোঁপাটা খুলে যেতে, ওর কাঁধের উপর দিয়ে গিয়ে পিঠের উপর এক কালো পর্দা হয়ে গিয়েছিল। আর ওর সুন্দর কোমল হাত দৌলতের হাত থেকে ছোরাটা নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

আর সম্পূর্ণ গলিটা নিঃঝুম ছিল। গ্রামটা একদম চুপ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের দিকে মুখ করে হাত জুড়ে দাঁড়িয়ে দ.স মহাবলীর সামনের প্রদীপটা কাঁপছিল। তাই মহাবলীকে কখনও রাগী আবার কখনও উদাস দেখাত। আর রাত সেই সুদূরে পূর্বের দিকে মরণ চাইবার জন্য ছুটছিল।

মূল থেকে অনুবাদ :
বন্দনা আলাসে

CENTRAL LIBRARY

তা'ছাড়া, এ্যাক্‌শনটিও দ্রৌপদীর চরিত্রের সঙ্গে অসমঞ্জস নয়। মৌনী-আর্ত-অনুগত সীতা তিনি নন, নন সুশীলা দময়ন্তী, কিংবা আত্মোৎসর্গিতা সাবিত্রী। স্ব-নির্বাচিত ভদ্রমহোদয়গণের আধিপত্যে তিনি শঙ্কিত নন। ইরাবতী কার্ভে 'যুগান্ত'-য় বলেছেন যে, সভাকক্ষে "মহিলা পণ্ডিত"-এর ভূমিকা গ্রহণ এবং "তাঁর বয়োঃজ্যেষ্ঠ পুরুষগণেরও পক্ষে বিভ্রান্তিকর প্রশ্নাবলী বুঝে ফেলার ভনিতাই দ্রৌপদীর মস্ত ভ্রম, অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য।" তৃতীয় খণ্ডে, 'বনপর্বে', যুধিষ্ঠির তাঁকে বর্ণনা করেছেন একজন "মহিলা পণ্ডিত" রূপে, যা "মহাভারতের ক্ষত্রিয়বর্গের দৃষ্টিতে কখনোই নন্দনীয় শিরোপা নয়···একজন নবোঢ়ার পক্ষে তার জ্যেষ্ঠদের কাছে বুদ্ধিমত্তা জাহির করা এক গুরুভ্রম।"

দ্রৌপদীর "বুদ্ধিমত্তা" নিহিত রয়েছে একটি সরল অথচ অনুত্তরীয় প্রশ্নে : "পাশা খেলায় বাজি ধ'রে হেরে গিয়েও আমাকে লাভ করা কি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ন্যায় কিংবা বিধিসঙ্গত ?" নিষ্পাপ প্রশ্ন, কিন্তু এমন-কি প্রজ্ঞাবান ভীষ্মও কবুল করেন যে তিনি বস্তুত হতচকিত। প্রশ্নটি পাশ কাটিয়ে তিনি বলেন, "ধর্ম বড়ো সূক্ষ্ম"। বাস্তবিক তা নয়, অন্তত তেমন সূক্ষ্মতার প্রয়োজন নেই। বিষয়টির মর্ম হ'লো, দ্রৌপদী অকুতোভয়ে এমন প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন, যা বস্তুত হিন্দু সামাজিক প্রথার মূলে কুঠারাঘাত, বিশেষত নারীর স্থান ও অধিকার সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণে।

আর ভীষ্ম যেন ব্যস্ত হন সেই ঐতিহ্য সংরক্ষণে ; এবং স্থিতাবস্থা সমর্থন করতে গিয়ে এমন কোনো মত প্রকাশ করলেন না যা চতুর সমালোচকেরা বিষয়টি সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য স্বরূপ খাড়া করতে পারেন।

নিহিতার্থ দেখা যাক্। ইরাবতী কার্ভের মতে, "দ্রৌপদী বলতে চাইলেন যে, যুধিষ্ঠির একদা ক্রীতদাস হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁর স্বাধীনতা হৃত, এবং কোনো কিছু তাঁর স্বীয় ব'লে দাবি করার অধিকার ছিলো না ; একজন ক্রীতদাসের কিছুই থাকে না বাস্তি লড়ার মতো। তা হ'লে যুধিষ্ঠির কি ক'রে তাঁর 'দ্রৌপদীর' স্বাধীনতা অধিকার করেন ? একদিক থেকে তাঁর যুক্তি গ্রহণযোগ্য হ'লেও, [বলা চলে যে,] এমন-কি ক্রীতদাসেরও একজন পত্নী থাকা সম্ভব, এবং তার ক্রীতদাসত্বের ঘটনা কোনোভাবেই পত্নীর উপর তার কর্তৃত্ব ব্যাহত করে না। উপরন্তু, সুপ্রাচীন কাল থেকেই ক্রীতদাসের স্বীয় সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকার ছিলো। সুতরাং প্রশ্নটি ছিলো জটিল, যার মধ্যে রয়েছে একাধারে ক্রীতদাসের উপর তার প্রভুর অধিকার এবং স্বীয় পত্নীর উপর ক্রীতদাসের অধিকার বিষয়ক ভাবনা।"

আশ্চর্য নয় ভীষ্মের "গো-কর্ণ আস্ফালন" এবং তাঁর নিরুত্তর প্রয়াস। "কী উত্তর দে'য়া হ'লো সেটা বড়ো কথা নয়, [বস্তুত] দ্রৌপদীর অবস্থা নিদারুণ। যদি ভীষ্ম তাঁকে বলতেন যে, তাঁর উপর তাঁর স্বামীর অধিকার নিঃশেষিত নয়, এবং যদিও তিনি [স্বামী] ক্রীতদাস হ'য়ে পড়েছিলেন তথাপি তিনি [দ্রৌপদী] তাঁর ক্ষমতাধীন, আর সে'কারণেই [স্বামীর] অধিকার ছিলো তাঁকে [দ্রৌপদীকে] লাভ করার, তবে তাঁর [দ্রৌপদীর] ক্রীতদাসত্বই

নিঃসংশয় প্রতিপন্ন হ'তো। [আবার,] যদি ভীষ্ম বলতেন যে, ক্রীতদাসত্বের দরুণ তাঁর স্বামীর তাঁর উপর অধিকার অপহৃত, তবে তাঁর [দ্রৌপদীর] দশা হ'তো বাস্তবিকই করুন। দ্রৌপদীকে বর্ণনা করা হয়েছে 'নাথবতী অনাথবৎ'—'সধবা অথচ বিধবা-প্রতিম'—এবং যদি তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সত্যই বিচ্ছিন্ন করা হ'তো, তবে তিনি প্রকৃত বৈধব্য প্রাপ্ত হতেন। ঋগ্বেদের যুগ থেকেই স্বামী-পরিত্যক্তা পত্নীদের উল্লেখ আছে, যারা পিত্রালয়ে শোচনীয়-ভাবে জীবন অতিবাহিত করতেন। কিন্তু, রমণীর স্বেচ্ছায় পতি-ত্যাগের একটিও দৃষ্টান্ত নেই। এহেন রমণীর পক্ষে তার পিত্রালয়ে সম্মানীয় আসন তো দূর অস্ত, এমন-কি একটি নিম্ন আসন পাওয়াও অসম্ভব হ'তো।" অজ্ঞাতসারে—জ্ঞানতও মনে হ'তে পারে কাউর—দ্রৌপদী অতিশয় সজাগ মুদ্রায় পা ফেলেছেন: তাঁর শব্দরাজি হিন্দু সমাজে নারীর অসম স্থান সম্পর্কে তীব্র অভিযোগ-রোষায়িত। পঞ্চ স্বামীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক অসম-সাহসী নারীর পক্ষেই সম্ভব ছিলো এহেন অভিযোগ উত্থাপন করা। বয়োঃজ্যেষ্ঠরা তাঁর প্রশ্নের বজ্রপাতে আপত্তি না জানালেও বিচলিত হতেন না কোনোভাবেই। কেবলমাত্র বিদুর, যিনি ছিলেন ব্যাসের নিম্নবর্ণ-অবৈধ পুত্রসন্তান, ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে এক অনাম্নী অঙ্গনার গর্ভে যার জন্ম, স্বীয় নীতিবল বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সভাকক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার ক'রে বস্তুত ধর্মের অবমাননা করেছেন।

বয়োঃজ্যেষ্ঠদের নীরবতা দ্রৌপদীকে এতোটাই রুষ্ট করেছে যে সভাকক্ষ থেকে তাঁকে টেনে বের ক'রে নে'য়ার আগে তিনি একটি শেষ "কর্তব্য" সম্পাদন করেছেন: তিনি তাঁর "বয়োঃজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনস্থানীয়দের" নমস্কার করেন, এবং পূর্বে

[নমস্কার] না করার দরুন তাঁদের "ক্ষমা" প্রার্থনা করেন। মহাভারতের আঞ্চলিক পুনঃকথনে এবং পুনর্বিন্যস্ত সংস্করণগুলিতে দেখা যায়, দ্রৌপদীর পরিস্থিতির এবং "সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণের" নীতি-বিগর্হিত মুখ-বাঁচানো যথেচ্ছাচারের বিয়োগান্তক তীব্রতা ঘটাতে এই শ্লেষটি কীভাবে শাণিত ক'রে তোলা হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভিল্লির তামিল সংস্করণে দেখা যায়, দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ রজ্জুবন্ধনে টেনে তাঁকে সভাকক্ষ থেকে বের ক'রে আনছেন। "এ কি রামায়ণের সেই ঘটনারই প্রতিধ্বনি, যেখানে দেখা যায় রাবণ সীতাকে হরণ করার সময় ভূমিখণ্ড সমেত তুলে নিচ্ছেন তাঁকে, যার উপর দণ্ডায়মানা ছিলেন তিনি, পাছে তাঁকে স্পর্শনে রাবণের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণিত হয়?"— প্রশ্ন তুলেছেন এম. ভি. সুব্রামনিয়াম তাঁর ***Vyasa and Variations*** গ্রন্থে। বস্তুত, ভিল্লি দেখিয়েছেন, দ্রৌপদী সাহায্যের আশায় গান্ধারীর কাছে ছুটে যান, যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর শরীরে তার হস্ত স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করেন। গান্ধারীর "শীতল-ক্রূর জবাব, দ্রৌপদীর আত্মীয়রাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন [দ্রৌপদীকে], অতএব দ্রৌপদীর যাওয়াই বিধেয়।"

কুমার-ব্যাসের কান্নাড় সংস্করণে দু'টি গ্রন্থিল সংযোজন ঘটেছে। তিনি দ্রৌপদীর শপথে এক বিষম মাত্রা উপস্থাপন করেছেন: দুঃশাসনের ছিন্ন-উন্মুক্ত উদরস্থ শোণিতে দ্রৌপদী তাঁর কেশ ধৌত করতে উন্মুখ বিবেচনায় তাঁকে যথার্থই দুঃশাসনের অন্ত্র উদ্‌ভিন্ন ক'রে তা দিয়ে তাঁর কেশসজ্জায় রত দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় সংযোজনটি এক সূক্ষ্ম "টান, যাতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ভক্তের নিমিত্ত পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের তত্ত্বের উপর", যখন

প্রাক্-নগ্নীকৃত মুহূর্তে দ্রৌপদী তাঁর শালীনতা রক্ষার্থে কৃষ্ণের কাছে আর্ত আবেদন জানান। বাম হস্তে তিনি ধারণ ক'রে আছেন তাঁর শাড়ির এক প্রান্ত, সহায়হীন। তখন "তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ঐশ্বরিক সাহায্য প্রার্থনার সময় কোনো সংকোচ থাকা অর্থহীন;" পোষাক স্খলিত হ'লো, আর তিনি উদ্বাহু প্রার্থনারত, এবং সেই মুহূর্তেই অলৌকিক সাহায্য এসে পৌঁছোয় তাঁর কাছে।"

সাহায্যপ্রাপ্তি অনিবার্য, মূলত তিনটি কারণে। এক, কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদীর প্রার্থনা, "আমি কি নই আপনার সম্পর্কিতা? নই কি আপনার 'সখী'? আমাকে সাহায্য করতে কি আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন?" বস্তুত, কৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর দূর কুটুম্বিতা বিদ্যমান—তাঁর শ্বশ্রূমাতা কুন্তী কৃষ্ণের পিতা বাসুদেবের ভগ্নী হওয়ার সুবাদে কৃষ্ণের পিতৃস্বসা। এবং কৃষ্ণের 'সখী' সম্পর্কের অনুষঙ্গে বিষয়টি গভীরায়ত। সখা-সখী সম্পর্কের অবিরল প্রসঙ্গে ও উৎসবায়নে ভারতীয় সাহিত্য ভরপুর, যে-সম্পর্ক বিশিষ্ট হ'য়ে উঠেছে রোম্যান্টিক স্নিগ্ধতায়, দুর্মর আনুগত্যে, এবং আধ্যাত্মীকৃত যৌন-প্রেমে। নিজেকে কৃষ্ণের সখীরূপে বর্ণনা ক'রে দ্রৌপদী কৃষ্ণের পছন্দ-অপছন্দের সুযোগ না দিয়ে [বস্তুত] চাইলেন, হিন্দু বীর রূপে অনবদমিত নিষ্ঠায় কৃষ্ণ তাঁর [দ্রৌপদীর] সম্মান রক্ষা করুন। দুই, যদিও দ্রৌপদীকে সাহায্য করার বিষয়ে কৃষ্ণের কোনো শপথের কথাই মহাকাব্যে ইতিপূর্বে দেখা যায় না, কিন্তু লোকগাথায় বিধৃত আছে যে, কৃষ্ণ যখন শিশুপালের প্রতি তাঁর চক্র নিক্ষেপ করেন, তখন তিনি নিজেই নিজের একটি অঙ্গুলিচ্ছেদ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদী নিজের বহুমূল্য পোষাকের এক অংশ ছিঁড়ে নিয়ে [কৃষ্ণের] ক্ষতস্থানে বেঁধে দিয়ে রক্তধারা বন্ধ

করেছিলেন। প্রতিদানে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রকরণ মুহূর্তে, যখন তিনি ঋতুপ্রাপ্তা, [যথাস্থানে] বন্ধনের নিমিত্ত তাঁকে অন্তহীন বস্ত্রখণ্ড যোগান দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। তিন, শব্দতত্ত্বের দিক থেকে কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) এবং কৃষ্ণ (কৃষ্ণ) অভিন্ন শিকড়-উদ্ভূত, যার অর্থ "কৃষ্ণবর্ণ ত্বক বিশিষ্ট"। আধিভৌতিক প্রতীকতত্ত্বে কৃষ্ণ এবং দ্রৌপদীকে উল্টে বলা হয়েছে বিধাতাপুরুষ ও শক্তি; ঠিক যেমন কৃষ্ণ স্বয়ম্ভূ, বিষ্ণুর অবতার রূপে, তদ্রূপ দ্রৌপদীও স্বয়ংজাত, দ্রুপদের যজ্ঞবেদি-উদ্ভূত (যে'কারণে তাঁর অপর নাম যাজ্ঞসেনী), জীবজন্ম-প্রণালী বহির্ভূত।

ক্রমশ

ভাষান্তর : দি, কু, চ

নীলিমা দেবী : কবির মৃত্যু

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্যে যেমন, ভারতীয় সাহিত্যেও তেমনি একাধিক যুগল কবি-ভগ্নীর আবির্ভাব ঘটেছে। সেকালের তরু দত্ত-অরু দত্ত এবং একালে নীলিমা দেবী-মণিকা দেবী (ভার্মা)। অনস্বীকার্য, নীলিমা দেবী এঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম পঠিত, স্বল্প পরিচিত।

কিন্তু সময়ের কাছে নীলিমা দেবী ততোখানি পরাভূত হন নি, যতোটা সময় পরাভব মেনেছে তাঁর কাছে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করার অব্যবহিত পাঁচ-ছ বছরের মধ্যেই যে-অহংকার বশে কবিতার কলম বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত এবং বহির্জগতে কর্মচঞ্চল এই নারী, তাকে আত্মগরিমা ছাড়া কিছু বলা যায়? সিগনেট প্রেস থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে শীর্ণ দুটি কবিতা-পুস্তিকা মাত্র—*Hidden Face* এবং *When the Moon died*। ব্যস্, কবিতা বলতে এই তাঁর সম্বল।

কিন্তু এটুকুও কি তুচ্ছ? তুচ্ছ ছিলো কি সেকালেই? দু-তিনটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদপত্র তো উষ্ণ সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন সেদিনের এই নবীনাকে। তবে কি নিতান্তই অগভীর মন্তব্য ছিলো সেগুলি? পাঠকমহল কি তবে এতোটাই আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন তখনই যে নতুন কবির কবিতায় আর unto, thence, didst, perchance, 'twixt

প্রভৃতি শব্দ গ্রহণ করতে পারছিলেন না? মনে হয় এগুলির কোনোটিই কারণ নয়। হয়তো-বা পাঠক কবির পরিণতির অপেক্ষায় ছিলেন। পাঠকদের বিমুখ করলেন নীলিমা দেবী। অভিমান ক'রে রইলেন আমৃত্যু। লিখলেন না আর একটিও কবিতার পংক্তি, পুনর্মুদ্রণ করলেন না একটি বইও আমাদের জন্যে।

আজ যখন কৌতূহলে খুঁজে-পেতে, প্রবীণদের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে, প'ড়ে দেখি সেই কবিতাগুলি, তখন মুগ্ধ হই তাদের কাব্যিক কারুকৃতিতে। কী সজীব সব উপমা—

And was the other, Heart-Break born
When, in the folly of youth,
You snatched the young lover
From his hour-old bride,
With a jealous woman's spite?

('Post-Mortem')

অথবা,

Like a herd of dumb driven cattle they cross
The rubicon 'twixst life and death.

('To All Others')

বাস্তব জীবনের আনন্দ-যন্ত্রণার অনুভূতি যেমন, তেমনি অজ্ঞেয়জগতের প্রতি কবির এক দুর্নিবার আকর্ষণ সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে কবিতাগুলিতে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর হতাশা-ক্লান্তি-মৃত্যু-বোধের করাল ছায়া *When the Moon Died* এর কবিতাগুলির ছত্রে-ছত্রে বিধৃত।

কালো ক্যানভাসে প্রচ্ছদ চিত্রটি পুস্তকের নামকরণের সঙ্গে এতো নিবিড় সম্পৃক্ত যে সেটিও একটি অসাধারণ কবিতার ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত—বেশ কিছুক্ষণ অবশ ক'রে রাখে পাঠককে। চিত্রকল্পের ও শব্দের পরতে-পরতে উৎকীর্ণ অশুভ-আতঙ্ক-নিঃসঙ্গতা-ভয়ংকরের ছায়া। যিনি লিখতে পেরেছিলেন,

An alien, alone I stand, far more a stranger
Than a stranger from a far-away land
('The Old Red House')

তাঁর আধুনিকতায় সংশয়ী সে কোন্ আধুনিক কবি? প্রথম পংক্তিতে বড়ো অক্ষর (Capital letter) ব্যবহারের প্রাচীন প্রথা পরিহার করতে না পারলেও ছন্দোপ্রয়োগে অন্ত্যমিলের বেড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার সাহস তিনি তখনই দেখাতে পেরেছিলেন অনায়াস ভঙ্গিতে। আধুনিকতার যে-দাবি জরুরি হ'য়ে উঠছিলো তখন ভারতীয়দের ইংরেজি কাব্যচর্চায়, সে'সব শৈলীগত ভাবনা যথেষ্ট স্ফুরিত নয় বটে তাঁর সেদিনের ঐ কবিতাগুচ্ছে, Lethe কিংবা Eros-এর রশ্মিচ্ছটায় কিঞ্চিৎ-আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি তখনো, কিন্তু তবুও বলবো সেটুকু বাধা নয় কোনো। ঐ গৌণ ত্রুটিতে তাঁর শক্তিমত্তা আবৃত হবার নয় কিছুতেই। সেদিনের এই তরুণ প্রতিভার স্বেচ্ছা-নির্বাসনে বঞ্চিত মনে হবে এ'কালের মনোযোগী পাঠকদের; বঞ্চিত হয়েছে আধুনিক ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য, এ'বিষয়ে তিলার্ধ সন্দেহের অবকাশ নেই।

ক্রমেই তিনি ঝুঁকছিলেন অনুবাদ কর্মে। অনুবাদ করেছেন অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'—*The Cheese*

Doll। অনুবাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তাঁর শিল্পীমনের আঁচড়। রূপকথার মণি-মাণিক্য দিয়ে হয়তো তিনি নতুন মাত্রা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন নিজের সৃজনলোকে, কিন্তু তারও কোনো বিকাশ দেখা হ'লো না আমাদের। এ'ছাড়াও তিনি অনুবাদ করেছিলেন এক গুচ্ছ আধুনিক বাংলা গল্প : ***Best Stories of Modern Bengal***।

উল্লেখযোগ্য, তিনি বাংলা লেখাতেও হাত দিয়েছিলেন কিছুদিন। 'সঙ্ঘমিত্রা' ছদ্মনামে আনন্দবাজার দৈনিকে "নারীর কথা" লিখেছিলেন একাদিক্রমে তিন-চার বছর।

সম্প্রতি এক সাক্ষাতে কবিকন্যা শ্রীমতী নন্দিনী গুপ্ত জানান, ১৯৪৩-এ স্বামীর মৃত্যুর পর নীলিমা দেবী সিগনেট প্রেস দেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন, এবং এতোটাই ব্যস্ত থাকতেন সেই কাজে যে তাঁর লেখার কথা উঠলে তিনি বলতেন, "টাকাপয়সার হিসাব করতে করতে দিন কেটে যাচ্ছে, আর আমার লেখা আসবে না।" আরো শুনে বিস্মিত হয়েছি যে প্রকাশনার কাজে মগ্ন থেকেও মৃত্যুর আগের সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী থেকে বই পাল্টে এনে তাঁর পড়ার অভ্যেস অব্যাহত ছিলো। সম্প্রতি স্মৃতিকথা জাতীয় একটি লেখা শুরু ক'রেও দেড় পাতার পর বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। অথচ ৭৯ বছরে পৌঁছেও প্রুফ দেখার কাজ বন্ধ ছিলো না তাঁর। মৃত্যুর পূর্বদিনেও সিগনেটের স্টক চেক্ করেছেন, 'কুমায়ুন'-এর (সিগনেট প্রকাশনা) প্রুফ দেখেছেন। প্রকাশনার জগতে নিমগ্ন থেকেও নিজের লেখা প্রকাশের ইচ্ছে হয় নি! অন্যদের পাণ্ডুলিপি আর তার প্রুফ দেখার কাজই কি তবে কবির কাল হ'য়ে দাঁড়ালো?

স্মৃতিচারণ

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব)

॥ ছয় ॥

এইমাত্র 'রবিবাসর'-এর আমন্ত্রণী কার্ড পেলাম। ৺সজনীকান্ত স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ই ভাদ্র রবিবার সকাল ৯-টায়, বেলগাছিয়ার সজনীকান্ত দাসের ভবনে।

আজ (১৮ই আগস্ট, ১৯৮২) থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে এক সন্ধ্যায় কলকাতায় ২৫/২, মোহনবাগান রো ঠিকানায় 'শনিবারের চিঠি' কার্যালয়ের একতলার ঘরে আমি সজনীকান্তকে প্রথম দেখি, তাঁর মাসিক পত্রিকায় বছর পাঁচেক প্রায় নিয়মিত-ভাবে লেখার পর।

টেবিলের ওধারে দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে ছিলেন সজনীকান্ত দাস এবং কবিশেখর কালিদাস রায়। কবিশেখরের ছবি অনেক দেখা ছিল, তাঁকে দেখেই চিনলাম। সজনীকান্তকে দেখে অনুমান করলাম তিনিই সজনীকান্ত। বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। বললাম, "সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

সজনীকান্ত বললেন, "আমারই নাম সজনীকান্ত দাস।"

আমি বললাম, "আমার নাম অজিতকৃষ্ণ বসু।"

শুনে সজনীকান্ত এবং কবিশেখর, দুজনই চমকিত হলেন।

সজনীকান্ত সকৌতুক স্মিতহাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন,

"কি আশ্চর্য! তুমি এত ছেলেমানুষ তা তো ভাবিনি। বয়স্ক আর ভীষণ ভারিক্কি ভেবেছিলাম, বিশেষ করে তোমার অমন কড়া দুখানা চিঠি পেয়ে। আমার ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিলে, তাই না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। কারণ আসল ব্যাপার তো আমার জানা ছিল না।"

আসল ব্যাপারের কথা বলি। ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে আমি সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রে লিখতে শুরু করি। (সে সময়ে সাময়িকভাবে সম্পাদক ছিলেন পরিমল গোস্বামী, সে কথা আগেই বলেছি।) সজনীকান্ত তখন মেট্রোপোলিট্যান ইনশিউর‍্যান্স্ কোম্পানীর কর্ণধার সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রের সম্পাদনা-ভার হাতে নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন পরিমল গোস্বামীর হাতে। তারপর কখন 'বঙ্গশ্রী' ছেড়ে ফিরে এসে আবার তিনি 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনা শুরু করেছিলেন, আমি সে খবর রাখি নি, তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি, কারণ আমার সম্পর্ক ছিল সম্পাদকের সঙ্গে নয়, শনিবারের চিঠির সঙ্গে, তাও ডাকযোগে। তার কার্যালয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, কার্যালয়ের কাছাকাছিও কখনো যাই নি।

১৯০৬ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রূপে ('প্রাইভেট' হওয়ার, অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ক্লাসগুলিতে দু-বছর খাতায় নাম লেখানো ছাত্রগিরি না করার, অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী এক বছর গচ্চা দিয়ে) ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে আমি ঢাকায় চলে

গেলাম। সেখানে কিছুদিন বাদে কলকাতা থেকে সেজো মামার চিঠি পেলাম, "সজনীকান্ত দাস তোমাকে একটি পোস্ট কার্ড লিখেছিলেন শনিবারের চিঠি অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। চিঠিটি হারিয়ে ফেলেছি। পাঠাতে পারলাম না"

সেজো মামার চিঠি পেয়েই আমি কলকাতায় শনিবারের চিঠির ঠিকানায় সজনীকান্তকে লিখলাম, "কেন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলেন জানালে বাধিত হবো। আমি কিছুদিন ঢাকায় থেকে তারপর কলকাতায় ফিরব। যে উদ্দেশ্যে যেতে লিখেছিলেন তা যদি এখানে থেকে সাধন করা যায় তো করব।" দিন পনেরো বাদেও সে চিঠির জবাব না পেয়ে আরেকটি চিঠি লিখলাম, আগেকার চিঠির উল্লেখ করে। দুটিই পোস্ট কার্ডে। তখন পোস্ট কার্ডের দাম ছিল দু পয়সা। দ্বিতীয় চিঠিরও কোনো জবাব এক পক্ষকাল প্রতীক্ষা করার পরেও না পেয়ে আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। যাঁকে আদর্শ ভদ্রলোক বলে ভাবতাম, তাঁর এই অভদ্রতা!

১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরলাম। এবার উঠলাম মধ্য কলকাতায় মামাবাড়িতে নয়, দক্ষিণ কলকাতায় বালিগঞ্জ ২নং লেক ভিউ রোডে (বিস্তীর্ণ কৃত্রিম হ্রদগুলির অনতি-দূরে) সেজো কাকার বাড়িতে। দেখলাম সচিত্র ভারত সাপ্তাহিকে ব্যঙ্গ আর কৌতুক রসের গল্প আর কার্টুন ছাপা হচ্ছে এবং পত্রিকায় তারাই প্রাধান্য পাচ্ছে। উৎসাহিত হয়ে আমি ডাক-যোগে গল্প পাঠিয়ে দিলাম। পরপর দুটি গল্প চটপট প্রকাশিত হলো। আনন্দ পেলাম লেখাশুদ্ধ পত্রিকা হাতে পেয়ে। লেখার জন্য যে দক্ষিণাও প্রাপ্য হয়েছে তা তখন জানতাম না। বাংলা

লিখে কোনো কাগজ থেকেই তখন পর্যন্ত দক্ষিণা পাই নি, পাবার আশাও করি নি।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম এখন থেকে শুধু সচিত্র ভারতেই লিখব। প্রতি সপ্তাহেই লেখা পাঠাব, ঐ অভদ্র ভদ্রলোকের (সজনীকান্ত) কাগজে আর কখনো লেখা পাঠাব না।

'শনিবারের চিঠি' মাসিকটির ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল তার ব্যঙ্গ এবং সংশোধনী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। ভাবতাম আমাদের জাতিগত এবং ব্যক্তিগত নানরকম ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি দোষ-ত্রুটির ব্যঙ্গ-সমালোচনা করে পত্রিকাটি সমাজের হিত সাধন করছে, এ রকম একটি জোরালো সংশোধনী চাবুকের সামাজিক প্রয়োজন আছে। সজনীকান্তকে শ্রদ্ধা করতাম (তাঁকে কখনো চোখে না দেখেই) এমন একটি আদর্শ পত্রিকার কর্ণধার এবং নির্দেশক রূপে। এখন আমার মনের গহনে অবস্থিত সেই শ্রদ্ধার আসন থেকে এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে দিতে ইচ্ছা হলো তাঁকে।

মনে পড়ল দেশবন্ধুর কবিতা :

"তারিণী, নিজেরে তরা।
তোর সকল অঙ্গ মরণ-ভরা।"

যাঁর নিজের চরিত্রে অমার্জনীয় খুঁত, যিনি তাঁর পত্রিকার কয়েক বছরের নিয়মিত লেখকের আগ্রহ-ভরা দুখানি চিঠির একটি এক লাইনের প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত পাঠানো দরকার মনে করেন না, তিনি তাঁর পত্রিকায় অন্যের খুঁতকে ব্যঙ্গ করেন কোন্ অধিকারে? নিজে চালুনি হয়ে ছুঁচের ছ্যাঁদার সমালোচনা করার অপরাধকে কি ক্ষমা করা যায়?

কিন্তু যাঁকে এত শ্রদ্ধা করতাম, তাঁকে পাকাপাকিভাবে বাতিল করে দেবার আগে তাঁকে একবার আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হলো। কথায় বলে বার বার তিনবার। হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের খেয়াল গানেও একটি বিশেষ রকমের বাহার হচ্ছে 'তেহাই', অর্থাৎ হুবহু একই জিনিসের পর পর তিনবার আবৃত্তি করে তৃতীয় আবৃত্তির শেষ মাত্রায় এসে সমে ঝাঁপিয়ে পড়া।

ঠিক করলাম ঢাকা থেকে দুটি চিঠি লিখে উত্তর না পাওয়ার পর এবার কলকাতা থেকে ছাড়ব তৃতীয় চিঠি. এবং এই চিঠিই হবে শেষ চিঠি, চরমপত্র, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে আল্‌টিমেটাম (ultimatum)। সজনীকান্ত দাসকে আমার শ্রদ্ধার আসনে বহাল রাখব কি রাখব না, তা নির্ভর করবে আমার এই চরমপত্র পাবার পর তিনি কি রকম আচরণ করেন, তার ওপর। দেখা যাক চরমপত্র পাঠাবার ফল (অতি আধুনিক বিকৃত পরিভাষায় 'ফলশ্রুতি') কি হয়।

চরমপত্র ডাকে ছাড়লাম। তার 'ফলশ্রুতি' হলো বিস্ময়-কর ভাবে দ্রুত। ঢাকা থেকে পাঠানো দুখানি পত্র (কোনোটাই 'চরম' নয়) পেয়েও যিনি জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কলকাতা থেকে ডাকে পাঠানো চরমপত্রটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে জবাব দিলেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ :

"আমি অসুস্থ অবস্থায় অস্থির হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়াই আপনার আগের চিঠি দুইটির উত্তর দিতে পারি নাই। অসুস্থতাজনিত আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আপনি একদিন আসিলে সুখী

হইব। সচিত্র ভারতে প্রকাশিত দুইটি গল্পের দক্ষিণা বাবদ আপনার দশ টাকা প্রাপ্য হইয়াছে। সেই টাকাও লইয়া যাইতে পারিবেন।"

এই চিঠি (পোস্টকার্ড) পেয়ে নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা মানুষ আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। ছোট বেলায় শোনা সেই উদ্‌ভট ছড়াটি মনে পড়ে গেল :

"এখান থেকে মারলাম তীর,
লাগল কলা গাছে :
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে,
চোখ গেল রে বাবা !"

আমি গল্প লিখলাম সচিত্র ভারতে, তার জন্য প্রাপ্য দক্ষিণা আনতে যাব শনিবারের চিঠি অফিসে সজনীকান্ত দাসের কাছে ? এ কেমনতরো কথা ?

আমি পত্রপাঠ সজনীকান্তকে লিখলাম :

"সচিত্র ভারতের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আনিতে আমি আপনার কাছে কেন যাইব, ইহা আমার বোধগম্য হইল না। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্যই আপনার আন্তরিক আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি একদিন যাইতে পারি।"

এ চিঠির জবাবও এলো ফেরৎ ডাকে একটি পোস্ট কার্ডে :

"আমি আরেকবার আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বুঝিতেছি আপনাকে ঐভাবে লেখা আমার উচিত হয়

নাই। অপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি, সচিত্র ভারতের সাহিত্য বিভাগটি আমিই দেখাশুনা করিতেছি এবং আপনার দুটি গল্পের দক্ষিণার টাকা আমার কাছে আনিয়া রাখিয়াছি। শুধু ঐ টাকা নিবার জন্যই যে আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম তাহা নহে। শনিবারের চিঠিতে অনেকদিন লিখিতেছেন, এখনো আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নাই। সেই কারণেই আপনাকে আসিতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

আমি পত্রপাঠ পোস্টকার্ডে জানিয়ে দিলাম একদিন যাব। এবং এক সন্ধ্যায় গেলাম। সেই সন্ধ্যা থেকেই এই কাহিনী শুরু করেছি।

কবিশেখরও যে আমার লেখার নিয়মিত এবং ভক্ত পাঠক, তা বুঝলাম তাঁর কথা থেকে তিনি বললেন, "সজনী, এর লেখার চমৎকার। একে তুমি তৈরী করে নাও।"

"সজনীকান্ত হেসে বললেন, "ওকে আর তৈরী করবার দরকার নেই। তৈরী হয়েই ও এসেছে"

একথা যখন লিখছি, তখন মনে প্রশ্ন জাগছে শনিবারের চিঠিতে এতদিন লেখার পর সজনীকান্তর আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইচ্ছা কেন হলো? আগে কেন হয় নি? এ প্রশ্নটা, কি কারণে জানি না, তখন মনে জাগে নি, তাই তার জবাবটা আজও আমার মনে রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেছে। পরিমল গোস্বামী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তাঁর সঙ্গে তো প্রথম দেখা এবং পরিচয় হয়েছিল এরও পরে, যখন তিনি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক। অথচ শনিবারের

চিঠিতে আমার লেখা প্রথম ছেপেছিলেন পরিমল গোস্বামী। তখন তিনি অস্থায়ী সম্পাদক। তাঁর অনেক-পরে-লিখিত স্মৃতিচারণ পড়ে জানা যায় আমার 'মানসাঙ্ক' কবিতাটি ডাকে পেয়ে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এবং আমার লেখার ক্ষমতার ওপর তাঁর এমনই আস্থা হয়ে গিয়েছিল যে এরপর আমার লেখা পেলে সেটিকে তিনি না পড়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু যে লেখককে চোখে না দেখেই তার লেখার ওপর এত আস্থা, তাকে চোখে দেখার কৌতূহল তাঁর হয় নি কেন? এ প্রশ্ন পরিমল গোস্বামী দেহে থাকতে, কেন জানি না, মনে আসে নি। এখন সেই প্রশ্ন মনে জাগে, কিন্তু নিশ্চিত কোনো উত্তর পাই নি। শুধু মনে হয় তিনি ভেবে দেখেছিলেন নেপথ্যবিলাসী যে লেখককে লেখা সম্বন্ধে তালিম বা পরামর্শ দেবার দরকার নেই, লেখা ডাকে পাঠিয়েই যে খালাস, যে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসে না সম্পাদককে দেখতে বা দেখা দিতে, সে শান্তিতে থাকুক তার নেপথ্যের আড়ালে, কি দরকার তাকে তার নেপথ্যের বাইরে ডেকে তাকে বিব্রত করবার?

সজনীকান্তের দেওয়া সার্টিফিকেট শুনে আমার প্রতি প্রসন্নতর হলেন কবিশেখর। আরো প্রসন্নতর হলেন যখন তাঁকে বললাম অতি বাল্যকালে (আট বছর বয়সে) আমাকে ছন্দোবদ্ধ মিলযুক্ত বাংলা কবিতা রচনা শিখিয়েছিলেন আমার মাতামহ অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ।

সচিত্র ভারতে প্রকাশিত দুটি গল্পের দক্ষিণা দশ টাকা আমার হাতে তুলে দিয়ে সজনীকান্ত বললেন, "আশা করি সচিত্র ভারতের টাকা আমার হাত থেকে নিতে এখন আর তোমার

আপত্তি হবে না ” তারপর সচিত্র ভারতের জন্য গল্প লেখার কায়দা বাৎলে দিলেন :

“এক শীট ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজ নেবে। ওপরের বাঁ দিক থেকে গল্প শুরু করবে, তারপর তলার দিকে নামতে নামতে তলার ডান দিকে এসে গল্পটি শেষ করবে। তার এক লাইনও বেশী নয়। বেশী লিখলেও পাঁচ টাকার বেশী পাবে না। বাঁধা রেট। এর পর থেকে মনি অর্ডারে টাকা পাবে। প্রথমবার হাতে হাতে দিলাম।”

তার উদ্দেশ্যটাও মনে মনে বুঝে নিলাম। তারিখ মনে নেই রেকর্ডও করা নেই, কারণ তখন ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু সেই আশ্চর্য সন্ধ্যাটি সেই দুজন আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে এক হয়ে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের কথা বলে শেষ করা যায় না।

কবিশেখরের কথা পরে বলব এখন সজনীকান্ত দাসের কথাই কিছু বলি (পরে আরো বলব)।

সচিত্র ভারতে গল্প লেখা সম্বন্ধে তাঁর ঐ উপদেশটি আমার খুবই কাজে লেগেছিল। সচিত্র ভারতে প্রকাশিত আমার বেশির ভাগ গল্পই ঐ ভাবে এক ফুল্‌স্‌ক্যাপ শীট কাগজের সীমিত পরিসরে লেখা। ঐ সাইজের ছোট গল্পের ইংরাজী নাম 'শর্ট শর্ট স্টোরি', মানে ছোট গল্পের ছোট সংস্করণ। বাংলা ভাষায় এই ধরনের ছোট গল্পের সবচেয়ে বড় শিল্পী বোধ হয় বনফুল। বনফুলোচিত গল্প লেখার কায়দা কিছুটা হাতে এসে গিয়েছিল

সজনীদার উপদেশ মেনে সচিত্র ভারতের জন্য এক ফুল্‌স্‌ক্যাপ শীট দৈর্ঘ্যের গল্প লিখে লিখে।

উদাহরণ স্বরূপ বলি, সচিত্র ভারতে প্রকাশিত আমার 'বিদ্যাসাগর' গল্পটি লিখতে একটি ফুল্‌স্‌ক্যাপ শীটের সবটুকু জায়গাও দরকার হয় নি, কিন্তু সচিত্র ভারতের অনেক পাঠক পাঠিকার মনে সচিত্র ভারতে প্রকাশিত আমার অনেক গল্পের মধ্যে 'বিদ্যাসাগর' গল্পটিই অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

গল্পটির মূল বিষয় হচ্ছে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তিটির মুখের দিকে তাকিয়ে শিহরিত হলাম : এ কি ? বিদ্যা-সাগরের এক চোখে অশ্রু কেন ? আরেকটু মনোযোগ দিয়ে দেখে বুঝলাম ওটি বিদ্যাসাগরের অশ্রু নয়, কোনো একটি বিহঙ্গের কীর্তি চিহ্ন।

সজনীদার কাছে আমি সবচেয়ে বেশী ঋণী আমার 'পাগলা গারদের কবিতা'গুলির জন্য। পাগলদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই কবিতাগুলি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেছিলাম, তারা কয়েক-জন সম্পাদকের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছিল। একজন সম্পাদক ইঙ্গিত করেছিলেন "এই সব ছাই পাশ কেন লেখেন ?" তখন ফেরৎ আসা অছাপা কবিতাগুলি সজনীদাকে দেখাতেই তিনি উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "ভালো উচ্চাঙ্গের কবিতা যাঁরা ছাপতে চান ছাপুন, তুমি আমাকে এই ছাইপাশ কবিতাই গোছায় গোছায় লিখে দাও, আমি গোছায় গোছায় ধারাবাহিকভাবে শনিবারের চিঠিতে ছাপব" পরের মাস থেকেই 'পাগলা-গারদের কবিতা' সিরিজ গুচ্ছাকারে শনিবারের চিঠিতে ছাপা হতে শুরু করল। প্রধান শিরোনামের তলায় ব্র্যাকেটে

লেখা থাকত 'পাগ্‌লা-গারদে অবস্থান-কালে রচিত', অথবা কোনো কোনো সংখ্যায় 'পাগ্‌লা গারদে অবস্থানোচিত অবস্থায় রচিত'। মাসের পর মাস কবিতাগুলি ছাপা হতে লাগল সজনীদার উৎসাহে এবং আগ্রহে। শনিবারের চিঠির পাঠক-পাঠিকা মহলে কবিতাগুলি প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল। বছর চারেকের কাছাকাছি এই কবিতা সিরিজ ছাপা হবার পর ১৩৬০ বঙ্গাব্দে সজনীদার আগ্রহে তাঁর রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে তাঁর কবিতা-ভূমিকা সহ 'পাগ্‌লা-গারদের কবিতা' নামে একটি ১০০ পৃষ্ঠার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু সে তো পরের কথা। তার বেশ কিছু আগের কথা বলি। সম্ভবত ১৩৫৬ সালের (অথবা ১৩৫৭ ?) বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস। আমি তখন ২৮বি, পণ্ডিতিয়া রোডের বাসিন্দা, রাসবিহারী অ্যাভেনিউর ত্রিকোণ পার্কের উত্তর দিকে। সজনীদার জরুরী চিঠি এলো : "এখনো পাগ্‌লা-গারদের কবিতা পাঠাওনি কেন ? শীগ্‌গির বেশী করে পাঠাও। বৈশাখ সংখ্যায় বেশী করে, বেশ বড় এক গোছা ছাপ্‌ব। পত্রপাঠ পাঠাও।" শেষ দুটি শব্দ মোটা করে আণ্ডারলাইন করা।

আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করলাম। একটিও কবিতা হাতে নেই যে পাঠাবো। একটা মাস বাদ গেলে কিছু যাবে আসবে না. প্রতি মাসেই যে লিখতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। এই ভেবেই লিখিনি।

কিন্তু সজনীদার আগ্রহের তাড়া—উপেক্ষা করা চলে না। বেশ লম্বা এক রোল কাগজ ছিল আমার পড়ার ঘরে। ইঞ্চি দশেক চওড়া, প্রায় ছ'ফুট লম্বা। পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

লিখবার পক্ষে আদর্শ। তাই নিয়ে বসে গেলাম লিখতে। কাগজের রোলটির মাথায় বড় করে লিখলাম 'পাগ্‌লা-গারদের কবিতা'। তারপর ওপর থেকে নীচের দিকে নামতে নামতে একটির পর একটি পাগ্‌লা-গারদী কবিতা লিখে চললাম, এক বৈঠকেই কাগজের রোলটির তলা পর্যন্ত-পৌঁছে ইতি করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সজনীদার দাবি মেটানো যাবে এই ইঞ্চি দশেক-চওড়া আর ফুট ছয়েক লম্বা পাগ্‌লা-গারদের কবিতাগুচ্ছ দিয়ে। চিঠির ওপর ইংরাজীতে 'ভেরি আর্জেন্ট' লিখে দিয়েছিলেন সজনীদা। ডাকে ছাড়লে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া কাগজের রোল খামে পাঠাতেও অসুবিধা। তাই রোলটি নিয়ে নিজেই বিকেলে সটান সজনীদার কাছে চলে গিয়ে তাঁর হাতে পৌঁছে দিলাম। রোলের সবগুলো কবিতাই বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হলো। প্রথম কবিতাটির নাম 'বৈশাখী'। 'পাগ্‌লা-গারদের কবিতা' গ্রন্থে (১৩৬০) এটিই প্রথম কবিতা। কবিতাটির শুরু এইরককম :

জানি জানি জানি রে বৈশাখ,
পাস বা না পাস নিমন্ত্রণ,
দক্ষযজ্ঞে শিবের মতন
তবু যে হাজির হবি, দিই বা না দিই তোরে ডাক—
হা রে রে রে বেলাজ বৈশাখ !

ক্রমশ

ইংরেজি কবিতা, 'পথের পাঁচালী' ও মণিকা ভার্মা

দিদির মৃত্যুসংবাদ পেয়েই ছোট বোন পাটনা থেকে ছুটে এসেছেন কলকাতায়। উঠেছেন দিদির বাসভবনে, দক্ষিণ কলকাতায় একবালপুর রোডে। সেখানেই কাটিয়ে গেলেন একটি মাস। কবি নীলিমা দেবীর কনিষ্ঠ সহোদরা মণিকা ভার্মা। আধুনিক ভারতীয় ইংরেজি কবিতায় বিশিষ্ট এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ-খ্যাত মণিকা দেবী 'হীনযান'-এর জন্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর কিছু প্রশ্নের উত্তর রেখেছেন। টেপরেকর্ডারে বাংলাভাষায় গৃহীত সাক্ষাৎকারটি যথাযথ নিম্নরূপ :—

প্রঃ এলাহাবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত এক উচ্চশিক্ষিত-বনেদী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে জন্মসূত্রে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আপনার জীবন ও মন কতোখানি অধিকার করেছিলো ?

উঃ আমাদের ছোটবেলায় তো শুধু বাংলাই চলতো। কিন্তু আমার ষোলো বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের ধরন-ধারণ একটু সাহেবীয়ানার দিকে ঝুঁকে পড়ে আমি মেম্-এর হাতে মানুষ। তারপর থেকে ইংরেজি চর্চাটাই বেশি হলো। কিন্তু এমন নয় যে বাংলাটা ছিলো না ; বাঙালি মাস্টারমশায় ছিলেন, বাংলা পড়াতে আসতেন। আমাদের আমলে বঙ্কিমচন্দ্র যতোদিন-না ভালো ক'রে শেখা হতো, ততোদিন তো বাংলাটা হতোই না ! তবে এটা বলবো যে, বাংলা যা-কিছু চর্চা সেটা নিজের শখের জন্যে। এইজন্যেই যে, আমার ভালো লাগতো, তাই বাংলা পড়াশুনোটা আমি জারিয়ে রেখেছিলাম যাকে বলে।

প্রঃ ইংরেজি-শিক্ষিত জজ্ পিতা-পিতামহের উত্তরসূরী হয়ে, এবং, এমন-কি আপনার দিদি স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া

সত্ত্বেও, বিদ্যায়তনিক (এ্যাকাডেমিক) শিক্ষার দিকে আপনার পিছন ফিরে থাকার কারণ কী ছিলো ?

উঃ কারণ, আমার বাবা আমায় যেতে দিতেন না। তিনি চাইতেন না যে তাঁর মেয়ে স্কুল-কলেজে যায়। তারপর ষোলো বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন, আমার উপর কারুরই অধিকার ছিলো না বলা যায়। কাকা তখনো ছিলেন। সে আমলে পুরুষ মানুষদের কী এসে যেতো মেয়েরা কী করছে না করছে তাতে ! ধ'রে তো বিয়ে দিয়ে দেবেন ! অতএব, যা-কিছু আমি পড়েছি, এবং পরের দিকে যতো শিক্ষা হয়েছে, সবই একটা অদ্ভুত-রকম নিজের ইচ্ছা থেকেই হয়েছে, বাড়ির লোকের জোরে নয়, যে-রকম এ্যাকাডেমিক-টা হয়। তা'ছাড়া বাড়ির লোকেরাও তো কেউই রইলেন না—মা মারা গেছেন, বাবা মারা গেছেন, কাকা-বাবুও কয়েকদিনের মধ্যে মারা যান, সব, ষোলো বছরে তো সব ফুরিয়ে গেলো। দাদা তখন বিলেতে। কেউর কিছু করার নেই, একেবারে স্বাধীন আমি, হু-হু ক'রে বাড়া শুধু। তা সত্ত্বেও যে আমি পড়েছি এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

প্রঃ লেখালেখিতে ইংরেজি ভাষাকে একমাত্র মাধ্যম করলেন কেন ?

উঃ প্রথমে তো আইডিয়াই ছিলো না যে আমি লিখবো। তখন আমার বাচ্চা দুই ছেলে। আমাদের আমলে বাচ্চাদের গল্প ব'লে খাওয়ানোর প্রথাটা আমার বাড়িতেও ছিলো। ছেলেপুলেরা খাবে বা ঘুমোতে যাবে, মা গল্প বলছেন। আমিও বানিয়ে বানিয়ে কতোরকম গল্প বলতাম। আমার তখনকার এক বন্ধু রীতা রায়, আছেন এখনো, কবিতা সরকার নামে সিনেমা বিষয়ে

লিখতেন; একদিন আমাকে ধরলেন : তুমি বাচ্চাদের এতো গল্প ক'রে শোনাও তো তুমি লেখো না কেন ? আমি 'ধ্যাৎ ছাই' ব'লে উড়িয়ে দিতাম। যাই হোক্, তখন আমার কর্তা গেছেন ট্যুরে. আমি একলা ছিলাম। বাচ্চারা যখন খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়তো তখন ব'সে আমি কতকগুলো গল্প লিখে ফেলেছিলাম। তারপর সেখান থেকে আমরা বম্বে চ'লে গেলাম। রীতাও বম্বে এলো। তখন সে ধ'রে-বেঁধে আমার গল্পগুলো নিয়ে 'ট্রেন' ম্যাগাজিনে প্রথম নিয়ে যায়। হৈ-হৈ ক'রে গল্প ছাপা হ'লো। তারপর ম্যাগাজিনের ওরা এরকম গল্প আরো চাইলো। সেই থেকে আমার ইংরেজি লেখার সূত্রপাত।

প্রঃ ইংরেজিতে কবিতা লেখা কখন থেকে শুরু হয় ? ইংরেজিতে লিখতে গিয়ে কোন্ দেশের শ্রোতার কথা ভেবেছেন ? নাকি শ্রোতার কথা মনে না রেখে নিজের তাগিদেই লিখেছেন ?

উঃ আমার কবিতা লেখারও একটা গল্প আছে। আমি prose লিখতাম, খবরের কাগজেই লিখতাম। 'টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া'তে "Middle" লেখাটা আমিই আরম্ভ করি। প্রথমে ভারতবর্ষের কোনো লেখক লিখতেন না। ওঁরা সব ম্যাঞ্চেস্টার 'গার্ডিয়ান' থেকে নিতেন। আমি একদিন ওঁদের ধরলাম, আমার ভারতবর্ষের লোকেরা কেন লিখবে না ? ওঁরা বললেন, কেউ নেই। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আছে। তখন বললেন, তুমি তবে লেখো. দেখি। তখন আমিই সেই "Middle" লিখি। "Middle" থেকে prose-ই চলতো সব। তারপর রীতা ধরলো, কবিতা লেখো। আমি উড়িয়ে দিলাম কথাটা। একদিন বর্ষাকালের সন্ধেবেলা বাড়িতে বসেছিলাম। বৃষ্টি হচ্ছে তখন। সামনেই radiant sea, একপাশে একটা মস্ত বড়ো গাছ আর

তাতে হলদে রঙের ফুল। সেই ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে বারান্দা দিয়ে আমার গায়ে পড়ছিলো। সামনে বিস্তৃত মেঘলা আকাশ। দেখতে দেখতে আমার কীরকম কতকগুলো কথা মনে হচ্ছিলো। সেইসময় তো ম্যাগাজিনে, খবরের কাগজে লিখছিই। তখন একজন লেখকই আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'সবসময় সঙ্গে একটা নোটবই-পেন্সিল রাখবে, কোন্ সময় কোন্ খেয়াল আসবে, টুকে নিও।' আর তাই সেদিন ঐ কথাগুলো মনে আসতেই লিখে ফেললাম। পরে দেখি, বাঃ এতো একটা কবিতা হ'য়ে গেলো! সে'সময় শ্/ন্ ম্যাণ্ডি 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি'র এডিটর। —তো আমি সেই কবিতাটা টাইপ ক'রে শ্/ন্ ম্যাণ্ডির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ও মা, তিনি তো তক্ষুণি নিয়ে নিলেন, বললেন, বেশ লিখেছো তো! সেই থেকে আমার কবিতা লেখা আরম্ভ হ'য়ে গেলো।

প্রঃ ইংরেজি ভাষায় আপনার পূর্বসূরী ভারতীয় লেখক-লেখিকারা আপনাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছেন? ক'রে থাকলে কতোখানি, না ক'রে থাকলে কেন নয়?

উঃ আগেকার লেখক-লেখিকাদের আমার উপর কোনোরকম প্রভাব নেই। আমার মতে, ওঁরা বড্ড old fashioned, ভিক্টোরিয়ান ওঁদের ভাষা। আর আমার ইংরেজি খুবই মডার্ন। তা'ছাড়া আমার লেখাপড়াটাও খুব মডার্নভাবে হয়েছে, তাই ওঁদেরটা বড়ো boring লাগতো—বড্ড ভিক্টোরিয়ান!

প্রঃ আধুনিক ভারতীয় ইংরেজি কবিতায় আপনার বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। তবুও জিজ্ঞাসা, একেবারে হাল আমলে দাঁড়িয়ে লিখতে গিয়ে তরুণতম লেখক-লেখিকাদের ভাবনা ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে কোনোরকম প্রজন্মগত ফারাক বোধ হয় কি আপনার?

উঃ উপস্থিত youngest generation-এর সঙ্গে কোনো-রকম generation gap আমার বোধ হয় না। আমি দেখছি তারা আবার একটা রোম্যান্টিক স্টাইলে ফিরে যাচ্ছে। তারা আবার খানিকটা nature-এর দিকে, এবং কথার সৌন্দর্যের ভিতর ফিরে আসছে। বরং আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, বা এখনো আছেন, তাঁদের মধ্যে দু'একজন sexual imagery নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন (কমলা দাস, গৌরী দেশপাণ্ডের কথা বলছি, যাদের নিয়ে আমি আমার *Facing Four* বইতে আলোচনা করেছি।) যেটা unnecessary মনে হয়েছে আমার। ওই জিনিষটাই একটু অন্যভাবে বলতে পারেন, অতো কটমট ক'রে বলাটা meaningless। বিশেষ কোনো ভাব নিয়ে কিছু বলা, whether philosophical কিংবা কোনোরকম metaphor-imagery যদি বিশেষভাবে আনতে চাও তো অন্য কথা। কিন্তু শুধু শুধু মাথামুণ্ডু কতকগুলি লেখার মানে তো আমি বুঝি না। হ'তে পারে এ ব্যাপারে আমি হয়তো একটু old fashioned।

প্রঃ মহিলা লেখক হিসেবে বিশেষ কোনো সামাজিক মূল্য-বোধের যন্ত্রণা আপনার সৃজনশীল সত্তাকে আন্দোলিত করেছে?

উঃ আমি তো নিজেকে মহিলা লেখক ব'লে দেখি না, লেখক ব'লেই দেখি। মহিলা একটা by the way ব্যাপার। আর হ্যাঁ, poverty-র বিরুদ্ধে, অমানুষত্বের বিরুদ্ধে আমি তো কবিতাতেই লিখেছি। The Man, The Answer কবিতাগুলিতে গরীবের উপর আমাদের অগ্রাহ্যভাবের কথা বলেছি। আমরা যে গরীবের জন্যে হাহাকার ক'রে খুব একটা কিছু করতে পারি—poverty দূর করতে পারি—সে'কথা আমি বলছি না। কিন্তু একটা

বেদনাবোধ, মানুষের জন্যে মানুষের বেদনা, সেটা তো স্বাভাবিক ! আমরাও মানুষ, তারাও মানুষ। তাই গরীবকে একেবারে অগ্রাহ্য করার ব্যাপারটা আমার কেমন যেন লাগে !

প্রঃ নারীত্বের বিশেষ অনুভূতি কবিতায় কতোদূর বিস্তৃত হ'তে পারে ব'লে আপনার মনে হয় ? —সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ্‌ কিংবা অ্যান্‌ সেক্সটন যতোদূর যেতে পারেন, ভারতীয় নারীর প্রকাশভঙ্গি ততোদূর পৌঁছোতে পারে ?

উঃ দেখো, বিদেশী মেয়েদের, বিশেষত আজকালকার, outlook আর আমাদের ভারতবর্ষের মেয়েদের অনেক তফাৎ। অবশ্য এখানেও আছেন উইমেন লিবার্স. তারা ওরকম করেন। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষ ভারতবর্ষই, আমগাছ আমরা, আমরা কি আর অ্যাপ্‌ল্‌ অফ পেয়ার্স ? অতএব খানিকটা তফাৎ তো থাকবেই ! ওরা যতোটা এগোতে পারেন আমাদের ততোটা হবে না। ততোটা unnecessary। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে যেটা আসল জিনিষ সেটা হচ্ছে sensitivity। সেই জিনিষটা আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে যতোটা আছে. সেটা ওদের আগের জেনারেশনের মধ্যে ছিলো, উপস্থিত জেনারেশনে অনেক কম। মাঝে মাঝে দেখা যায়, এমন নয় যে একেবারেই নেই। সেটা বললে অতি অন্যায় হবে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটু উগ্রতা এসেছে, সেটা আমাদের মধ্যে আসার তো দরকার নেই ! হ্যাঁ, গলা উঁচু ক'রে বলা যায় অনেক কিছুই, কিন্তু কবির মধ্যে উগ্রতাটা আনার দরকার নেই কোনো। জিনিষটা অন্যরকম ভাবেও তো বলা যেতে পারে।

প্রঃ ***Facing Four*** বইতে আপনি মহিলা লেখকদেরই বিশেষ আলোচনায় ব্রতী হলেন কেন ?

উঃ কারণ, আমি যেহেতু লেখিকা, ওঁরাও চার-ছ'জন ছিলেন, তাই মনে হ'লো ওঁদের বিষয়ে কিছু লেখা উচিত। তা'ছাড়াও, সমসাময়িক মহিলা লেখকদের সম্পর্কে মহিলা লেখক হিসেবে আমার opinion-টা কী, তাঁদের লেখায় বিশেষ কী আছে না আছে, এবং বিশেষত মেয়েদের কথাগুলো হয়তো পুরুষমানুষেরা সব বুঝবে না, এই আইডিয়াতেই বইটি লিখেছিলাম। তা'ছাড়া পি. লাল-ই একবার বলেছিলেন যে ওদের বিষয়ে কিছু লেখা উচিত আমার। প্রথম থেকেই লাল-এর encouragement-এই আমার লেখা চলতে থাকে।

প্রঃ এবার আপনার সৃজনশীল লেখার আরেকটি দিকে—অনুবাদে—ফিরছি। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদে আপনার আগ্রহ এবং সাফল্যের কথা মনে রেখে জানতে চাইছি, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির অনুবাদে আপনি উদ্বুদ্ধ হন কীভাবে?

উঃ অনেকদিন আগের কথা···সেই ম্যাগাজিনটার নামটা ভুলে যাচ্ছি···আবারো সেই লাল [পি. লাল] ছিলো তাতে··· আর সে'সময় 'পথের পাঁচালী'টা পড়ছিলাম। তখনই আমাদের সিগনেট প্রেস থেকে 'আম আঁটির ভেঁপু' বেরিয়েছিলো, সত্যজিৎ চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন তাতে, বেশ হৈ-চৈ হচ্ছিলো তখন। 50s-এর কথা, যতোদূর মনে পড়ছে। সেই সময় ঐ ম্যাগাজিন থেকে serially অনুবাদটা রাখতে চাইছিলো। আর তখনই আমরা আবার অনেক দূরে চ'লে গেলাম। হতে হতে শেষে রাইটার্স ওয়ার্কশপই আমাকে বললো লিখতে। লাল-ই বললো, প্রথমে পুরো বইটা করুন। প্রথমে ভাবলাম পুরো বইটাই করবো, কিন্তু তখন বোঝা যায় না কার কাছে কপিরাইট আছে। শেষ পর্যন্ত ৭৮, না বোধ হয়, ৯'১০ বছর লেগে গেল সেই কপিরাইট

খুঁজতে। করতে করতে সেরকমভাবেই হ'লো। আর বিভূতি-বাবুর লেখায় এতো চমৎকার সব descriptions, বাংলাদেশের সব জায়গার, তা'ছাড়া nature-এর বিষয়ে লেখার কবিত্ব তো ওঁর আছেই, এ'সবের জন্যে ওঁর লেখা প'ড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হয়ে পড়ি। তাই করেছিলাম।

প্রঃ 'পথের পাঁচালী'র অনুবাদের ভূমিকায় আপনি আপনার অনুবাদটিকে "remodelled form" বলেছেন—দেখতে পাই কোনো-কোনো অংশে মূলের synopsis করেছেন, কোথাও-বা ডিটেল সংক্ষেপ করেছেন—কারণ কী ছিলো?

উঃ সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমি একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছিলাম। ঐ যে শব্দটাই আমি ব্যবহার করেছিলাম—"refacimento" (রিফাচিমেন্তো)—সেটা dictionary থেকে পেয়েছিলাম, কী কারণে আজ আর মনে নেই। .....'পথের পাঁচালী'তে যে খুব লম্বা-লম্বা description-গুলি রয়েছে তা বাংলায় পড়তে ভালো লাগে। কিন্তু আসলে আমি সেই audience-এর জন্যে করেছিলাম যারা বাংলাটা জানে না, কিংবা জানলেও কখনো বাংলাতে original-টা পড়বে না, পড়তে জানেও না, যাদের কেবল ইংরেজি এডুকেশন, অথবা যাদের হাবভাব ইংরেজি, মডার্ণ রাইটিং-এর দিকেই শুধু ঝোঁক, ক্ল্যাসিক্স্ পড়তে চায় না। কলেজ-টলেজ ছাড়বার পর আর ক'জন ক্ল্যাসিক্স্ পড়ে? ক্ল্যাসিক্স্-এর ভিতর সেই লম্বা-লম্বা descriptions, যেমন ডিকেন্সের উপন্যাসে পাতার পর পাতা—সে'সব স্কুল-কলেজের দিনে সব পড়ে, বড়ো হয়ে আর ক'জন পড়ে? বিভূতিবাবুর লেখায় সেইসব স্টাইলের অংশগুলি আমি synopsis করেছি। হতে পারে সেটা আমার না করা উচিত

ছিলো। আমার উদ্দেশ্যটা ছিলো, বাঙালি পাঠক উপন্যাসটি বাংলায় প'ড়ে যে-আনন্দ পায়, অবাঙালি পাঠক ইংরেজিতে প'ড়ে যাতে ঠিক সেই স্বাদটা পায়। আমি স্বাদটা দিতে চেয়েছিলাম। আর সেটা দেয়ার জন্যেই আমি condensed করেছিলাম।

প্রঃ অনুবাদেও উপন্যাসটির নাম 'পথের পাঁচালী' রেখেছেন কেন ?

উঃ ও তো বিশ্ববিখ্যাত 'পথের পাঁচালী'। সব জায়গাতেই 'পথের পাঁচালী' বলেই জানে। এমন হেন দেশ নেই যেখানে সত্যজিৎ রায়ের ছবির পর 'পথের পাঁচালী' নামটা লোকেরা না জানে। তাই ঐ নামটাই রেখেছি, দরকার ছিলো না বদলাবার।

প্রঃ UNESCO-র অনুবাদটা কেমন লেগেছে আপনার ?

উঃ মোটেই ভালো লাগে নি। প্রথমত ওদের criticism-টা বড়ো pedestrian। বিভূতিবাবুর ভাবটা ভদ্রলোক [ক্লার্ক] ইংরেজিতে আনতে পারেন নি। তারপর, ওরা যে বন্ধ ক'রে দিলে হঠাৎ, কারণ কিনা বিভূতিবাবু "was a naive genius", এরকম অপমান আমার অসহ্য। সত্যজিৎ তো দুটো ফিল্ম করলেন, তাতে উনি নামও বদলে দেন। ফিল্ম কিংবা প্লে করার সময় যে করে তার পুরো অধিকার আছে একটু বদলে নেবার। কারণ, সে তো একটা বই থেকে অন্য জিনিষ—আরেকটা ফর্ম, ফিল্ম-ফর্ম বা থিয়েটার-ফর্ম—তৈরি করছে। কিন্তু যে অনুবাদক সে কী মুখে বন্ধ ক'রে দিলে ? —যে লেখক সে জানে না কী করছে, তার থেকে আমি ভালো জানি, অতএব আমি এখানে বন্ধ করছি ! —This is ridiculous !

প্রঃ আপনার 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদের প্রেরণা কী ছিলো ?

উঃ 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদের কারণ একটা বেশ মিস্টিক ব্যাপার, তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা শক্ত। তবে তখন খুব বাংলা চর্চা করছিলাম। আমার জামাই ডিকে-র [দিলীপ কুমার গুপ্ত] সঙ্গে আলোচনা চলছিলো বৈষ্ণব বিষয় নিয়ে। হতে হতে 'গীতগোবিন্দ'র কথা এলো। তিনি বইটই কতকগুলো এনে দিলেন আমাকে. সেগুলি পড়লাম টড়লাম। তারপর কলকাতা থেকে ফিরে গেলাম। তখন এলাহাবাদে ছিলাম। কবিতার একটা বই তখন তৈরি করছি. এবং তখনই 'গীতগোবিন্দ'র একটা সর্গ, তাও আবার সর্গের খানিকটা মাত্র, অনুবাদ ক'রে লাল-কে দেখাই। তারপর অনেক ক্রিটিক বললেন, খুব চমৎকার হয়েছে। বেশ কয়েকটা রিভিউও হয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকা তো একটা পুরো পাতা জুড়ে খুব প্রশংসা ক'রে রিভিউ করেছেন। তারপর লাল বললেন বইটা পুরোটা অনুবাদ করতে। তখন আমার মনটাও বৈষ্ণব দিকে ঝুঁকেছে। সেই সুবাদে করাও হয়ে গেলো। পরে সাহিত্য আকাদেমির সেক্রেটারী আমাকে বলেছিলেন : বইটা আমাদের দিলেন না কেন? UNESCO এটা বের করতো। —সত্যি বলতে কি, আমার মাথায় তখন এসব আসে নি। তবে লাল করেছেন সেটাই যথেষ্ট আমার।

প্রঃ আপনি যে আধুনিক ইংরেজিতে 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদ করেছেন সেখানে অনেক সময় ইংরেজিরই ভাষাগত ছন্দোপতন ঘটেছে দেখতে পাই। —এরকমটা কেন হয়েছিলো?

উঃ এটা বলা আমার পক্ষে মুস্কিল। একটা অদ্ভুত জিনিষ হয়েছিলো আমার। —আমি সংস্কৃতটা নিয়ে পড়তাম, আর সোজা লিখতাম। সেই mss. আমি রেখে দিয়েছি, দেখাবার জন্যে যে তাতে একটাও correction নেই। আমার কাছে এর

উত্তর নেই। কেন যে এরকম হলো, সেরকম হলো, তা জানি না। গড়গড়িয়ে লিখে গেছি। সংস্কৃত থেকে সোজা যেমন ইংরেজি মনে এসেছে আমি তাই ক'রে গেছি। তাতে ছন্দ থাক্ বা না থাক্ সেদিকে তাকাই নি। লক্ষ্য ছিলো যে, পুরো ভাবটা যেন আসে। আইডিয়াগুলো তো পুরোটা এসেছে — যেটা সংস্কৃতে আছে সেটা ইংরেজিতে তুমি পাচ্ছো, তাতে ছন্দ যদি কোথাও ভেঙে থাকে তাতে কী এসে যায়? তা'ছাড়া, সংস্কৃত ছন্দটা তো আর আমি ইংরেজিতে আনতে পারি না!

প্রঃ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় কখনো সীরিয়াস্‌লি কিছুই লেখেন নি কেন?

উঃ এটা আমার দুঃখ। লিখতে যখন আরম্ভ করি তখন দিদিকে জিজ্ঞেস করি: বাংলায় লিখবো কি ইংরেজিতে? দিদি বললেন: ধোৎ, তুই আবার বাংলায় লিখবি কী? আজকালকার লোকেরা কী চমৎকার বাংলা লিখছেন। তোর বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, কিছু জানিস না, লেখাপড়া করিস নি। .....তখন লাল, শন্ ম্যাণ্ডি, এবং আরো অনেক ইংরেজি লিখিয়েরা বললেন: তুমি ইংরেজিতে লেখো, আমরা সঙ্গে আছি। তারপর ইংরেজিটাই চলতে থাকলো।

প্রঃ সম্প্রতি আপনি অধ্যাত্মজীবনের দিকে যে ঝুঁকেছেন, তার পিছনে বলার মতো কারণ আছে কিছু?

উঃ আমার কুড়ি-বাইশ বছর বয়স থেকেই ফিলজফি খুব ভালোভাবে স্টাডি করি, যদিও আমার জীবনটা অন্য ধারায় ছিলো — আমার স্বামী আর্মিতে ছিলেন, খুব মডার্ণ লাইফ ছিলো। কিন্তু আমার ওদিকের যে একটা টান ছিলো সেটা বন্ধ হয় নি কখনো।

তা'ছাড়া আমার একটা প্রতিজ্ঞা ছিলো, আমার বয়স যখন চল্লিশ হবে, যখন অন্য কাজ একটু ক'মে আসবে, তখন খুব ভালোভাবে আমি সমস্ত শাস্ত্রগুলি পড়বো এবং দেখবো ব্যাপারখানা কী। এই জিজ্ঞাসাই কারণ।

প্রঃ এই অধ্যাত্মমুখিতা আপনার জীবনবোধকে নতুন কোনোভাবে নাড়া দিয়েছে, কিংবা ইদানীংকালের লেখায়, মানে অপ্রকাশিত রচনায়, তার কোনো প্রতিফলন ঘটেছে ?

উঃ আমার অপ্রকাশিত লেখা কেন, প্রকাশিত লেখার মধ্যেই পাবে। আমার 'SPACE' ইত্যাদি অনেক আগের কবিতাতেও পাবে। মেটাফিজিক্যাল জিনিষটা বরাবরই আমার লেখায় আছে। এতো উপনিষদ সব পড়েছি যে সবসময় এখানের বাঁধন ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার, একটা বিরাটের খোঁজ ইত্যাদির প্রকাশে ঔপনিষদিক ভাষা মডার্ণ ইংলিশে এসে গেছে।

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী

মহাবিদ্রোহ ও বাঙালী মানসিকতা

রঞ্জিত সেন

[৫৭-র মহাবিদ্রোহ কেন বাংলাদেশে সাড়া জাগাতে পারল না তার উত্তর দেওয়া হয় সহজ দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পাশ্চাত্য শিক্ষা। এ উত্তর নির্ভুল। কিন্তু একথা বলে নীরব থাকলে ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রয়োজন সমকালীন বাঙালী মানসিকতায় যে-প্রবণতাগুলি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল তার বিশ্লেষণ। বাঙালী মানসিকতায় রাজনীতি সচেতনতা কীভাবে এসেছিল তা নিয়ে কিছু কিছু লেখা হয়তো হয়েছে, কিন্তু কোন্ কোন্ প্রবণতা মহাবিদ্রোহের আগে সেই সচেতনতার অগ্রগতিকে রোধ করেছিল, তা পর্যালোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্তমান লেখাটি একটি খসড়া যার মধ্যে এই প্রবণতাগুলিকে বোঝার একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয়েছে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' গ্রন্থে যে-বঙ্গদর্শন লিপিবদ্ধ করেছেন, মূলত তার ভিত্তিতে এ খসড়া রচিত। এটি কোন গবেষণাপত্র নয়, গবেষকের চিন্তার খসড়া মাত্র। —র, সে,]

এটি একটি বিস্ময় যে, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বাংলাদেশে শুরু হলেও বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। মহাবিদ্রোহের সরকারী ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করলেও স্থানীয় জনগণ তাদের কোন সমর্থন করে নি [*Eighteen Fifty Seven*]। একথাটি

সর্বৈব সত্য নয়। কিন্তু কথাটিকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত করার মত যথেষ্ট উপাদানসহ প্রামাণ্য গবেষণাগ্রন্থ আজও রচিত হয়নি। শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর নীলবিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহ নিয়ে রচিত গ্রন্থ দুটিতে তথাসহ নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণ করেছেন যে, বাংলাদেশে বিপ্লবের পরিমণ্ডল ছিল, কিন্তু সেই পরিমণ্ডলে বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ স্ফুরণ যে কেন ঘটল না তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। সুকুমার মিত্র তাঁর '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মহাবিদ্রোহের প্রভাব সমকালীন বাংলাসাহিত্যকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু যে দেশে বিদ্রোহ জনমানসকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারল না সে দেশের সাহিত্যে মহাবিদ্রোহের প্রভাব একটা বড়ো মাপের শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এমন কথা বলার মত যথেষ্ট প্রমাণ কি শ্রীমিত্র তাঁর গ্রন্থে রাখতে পেরেছেন? বাংলাদেশে যেমন নীলবিদ্রোহ হয়েছিল সেই রকম আমরা 'নীলদর্পণ'-ও পেয়েছিলাম। এইরকম কোন বড়োমাপের সাহিত্য বাংলাদেশে রচিত হয়নি—যার মুকুরে মহাবিদ্রোহ প্রতিফলিত হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' রচিত হয়েছিল নীলবিদ্রোহের সাথে সাথেই। নীলবিদ্রোহ ঘটেছিল ১৮৫৯-৬০ সালে, 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে। অথচ মহাবিদ্রোহের আগে-পরে এক দশকের মধ্যেও বাংলাসাহিত্যে এমন কোন গ্রন্থ রচিত হ'ল না যার মধ্যে আসন্ন বা বিগত বিপ্লবের কোন ছায়া পড়তে পারে।

বাংলা সাহিত্যে মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বের ও পরের কালটি হ'ল মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল। মাঝখান থেকে মধুসূদন দেখা দিলেন ১৮৬২ সালে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় "...আবার দেশে পলাইয়া আসিলেন"। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন

বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২১১]। বিদেশে ব্যর্থ, ও স্বদেশে প্রত্যাগত—মধুসূদন সম্বন্ধে শিবনাথ লিখছেন ঃ "কিন্তু হায় দেশে আসিয়া কি পরিবর্তনই দেখিলেন! ...নব্যবঙ্গের রঙ্গভূমিতে নূতন একদল নেতা আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভাবগতি অন্য প্রকার"। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মধুসূদন কী লিখলেন? ১৮৫৮ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক থেকে শুরু করে 'পদ্মাবতী' হয়ে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। ইতিমধ্যে মহাবিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহ! উত্তীর্ণ। মধুসূদন লিখলেন 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য'—সাল ১৮৬০, যে-বছর 'নীলবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত। রোম্যান্টিক কবির কাছে সমকাল বড়োই রূঢ়। ১৮৬১ সালে তিনি "ব্যারিষ্টার হইবার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করিলেন"। এলো বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। ১৮৬৪ সাল—'দুর্গেশনন্দিনী' মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। এর পরেই এলো 'কপালকুণ্ডলা'-র "যে তুলিকা দুর্গেশনন্দিনীর নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুণ্ডলার গাম্ভীর্যরস সম্পূর্ণ ভাব সৃষ্ট করিল! লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল" [রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃঃ ২৫৩]। এ হ'ল বাঙালীর সজল-সরল-বিরল মানসিকতার বিস্ময়, যে-মানসিকতায় strangeness ও beauty-র রস ঘনীভূত হয়ে রোম্যান্টিকতার মায়া রচনা করে। এই হ'ল মহাবিদ্রোহোত্তর বঙ্কিম-স্বপ্নগর্ভ, পলাতক ও অতীতচারী। ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝিতে বঙ্কিমের যে-প্রভাব শিবনাথ লক্ষ করেছিলেন তার মধ্যে বিপ্লবী বাংলা কতটুকু আছে? বরং শিবনাথ-কথিত দীনবন্ধুর প্রভাবের মধ্যে যেন বাংলার পরিমণ্ডলের বিদ্রোহ মূর্ত হয়ে উঠেছে: "...১৮৬০ সালের শেষভাগে 'নীলদর্পণ' নাটক হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক

কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কিনা, সে বিচার করিবার সময় রহিল না, ঘটনা সকল সত্য কিনা অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না, 'নীলদর্পণ' আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল। ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।" [রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃঃ ২২৪]

নীল নিয়ে যে-সচেতনতা তা প্রত্যক্ষ রাজনীতি-সচেতনতা নয়, তা সমাজ-সচেতনতা। রামমোহন রায়-এর সময় থেকে বাংলাদেশে যে-সমাজ-সচেতনতা শুরু হয়েছিল তা প্রায় পাঁচ দশক বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল। সামাজিক প্রগতি ও অর্থ-নৈতিক সুস্থিতি—এই ছিল তখন বাঙালী মধ্যশ্রেণীর মূল লক্ষ্য। তাই বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরাজদের সাথে চেয়েছিল সমঝোতা ও সহযোগিতা—Collaboration। ১৯-শতকের বাংলার সামাজিক আন্দোলন ইংরাজদের আদর্শে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তাদের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল। বাঙালী মধ্যশ্রেণীর ধারণা ছিল এই সহযোগিতা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সংগতিও প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অন্তর্পটে যে-রাজনৈতিক চেতনা ছিল তা এই আত্মপ্রতিষ্ঠার সুবিধাবাদী দর্শকের বিপরীত। ফলে মহাবিদ্রোহের সাথে একাত্ম হওয়ার মত সাহস বাঙালী মধ্যশ্রেণীর তখন ছিল না। অতএব বিদ্রোহের সাথে যে বাঙালীর কোন ভূমিকা নেই তা প্রমাণ করার জন্য ১৮৫৮ সালে দুই বাঙালী—

কিশোরীচাঁদ মিত্র ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [মতান্তরে কৃষ্ণদাস পাল]—'হিন্দু' এই ছদ্মনামের অন্তরালে দুটো বই লিখে ফেল্লেন, যার উদ্দেশ্যে প্রমাণ করা যে. হিন্দু বাঙালী মধ্যশ্রেণী বিপ্লবের সাথে কোনভাবেই যুক্ত নয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ কি মুসলমানদের কাজ? তবে 'হিন্দু' এই ছদ্মনাম কেন? বিদ্রোহ থেকে হিন্দু স্বাতন্ত্র্যের মানসিকতা শুধু যে সমকালীন তা নয়. পরবর্তী অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক এই মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, ৫৭-র মহাবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে সমাজবিরোধী. নীচশ্রেণীর মানুষদের কীর্তি। এ বিষয়ে মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত মুসলমান নেতা সৈয়দ আহমদ খান। বিদ্রোহের দ্বারা বিক্ষত, বিক্ষুব্ধ ইংরাজ রাজশাসনের রক্তচক্ষু থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য হিন্দুরা রাজশক্তির কাছে আবেদন জানালেন: "It is well known, your Excellency's Lordship, that we, the Bengalees, are a cowardly people." [Charles Bell. *History of Indian Mutiny*, vol. I, p. 612]। যারা সরব হয়ে রাজশক্তির ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন, আর যারা নীরব থেকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই।

মোটের উপর বাঙালী জাতি যে collaborationist—সমঝোতাকামী—একথা আজ আমরা যতই খণ্ডন করার চেষ্টা করি না কেন, সমকালের কাছে অজানা ছিল না। "বাঙালী ইংরেজের দক্ষিণহস্ত—সিন্দুকের চাবি, অঙ্গুরীর হীরা, ব্যঞ্জনের লবণ"—তার থেকেও বোধ হয় কিছু বেশী—"বাঙালী ইংরাজদের গুপ্তচর,

গুপ্তমন্ত্রী" । সুকুমার মিত্র '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩ । একথা অকপটে স্বীকার করেছেন জনৈক বাঙালী। উত্তর ভারতের মহাবিদ্রোহীরা তা জানত বলেই তাদের শ্লোগান ছিল : "মার, ধর, বাঁধ বাঙালীকে" ।

বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষার হঠাৎ আতিশয্যকে এড়াতে পারেনি । সে আতিশয্য সাহিত্যেও রূপ নিয়েছিল । চিরাবলম্বিত রীতিকে ভেঙে ফেলার মধ্যে যে-বন্ধন-অসহিষ্ণুতা ছিল তা সমকালীন বাঙালী মানসের এক বিশেষ প্রবণতার ইঙ্গিতবাহী । রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ইয়ংবেঙ্গল, চিরাচরিত সমাজরীতিকে ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন । এ চেষ্টা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরাও । সাহিত্যে বিদ্যাসাগরীয় মার্জিত-সংস্কৃত-ঘেঁষা চলতীভাষার শৃঙ্খল ও রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালী' ভাষার গ্রাম্যতা থেকে বের হয়ে আসার যে-প্রবণতা, অথবা সংস্কৃতের পয়ার ভেঙে অমিত্রাক্ষরে যাওয়ার যে চেষ্টা তা সবই এই বৃহত্তর বন্ধন-অসহিষ্ণু সমাজচেতনার প্রতিফলন মাত্র । কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে সামাজিক বন্ধন-মুক্তির চেতনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র নারীমুক্তির আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল । সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, নারী-শিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে পরাভূত, বন্দিনী নারীসত্তা বা 'Captive Lady'কে পুনরুদ্ধারের আকূতি ছিল, যে-আকূতি পুরুষরা দেখিয়েছিলেন ইংরাজ সাহচর্যে নিজেদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার মধ্যে । বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ইংরাজী শিক্ষা নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে যে-শান্তি এনেছিল তার পটভূমিকায় এসেছিল রেনেশাঁস । অতএব রেনেশাঁসের কবি দান্তের

মত রেনেশাঁস-জাগ্রত বাঙালী পুরুষও দেখেছিল বাংলার বিয়াত্রি-চেকে, যিনি বাগানবাড়ী, বাঈজী, ঈশ্বরগুপ্তীয় কালচারের বাইরে কামিনী-ভামিনীদের সারি পেরিয়ে রমণী হতে পারবেন, যার স্পর্শে তৃপ্ত হবে পুরুষের তৃষিত মন। 'নবকুমার'-বাঙালী কি থাকতে চায় দেহদুর্গে বন্দী? দেহদুর্গকে ভেঙে কোন্ নন্দিনীকে সে চেয়েছিল? বাঙালীর সমস্ত সমাজচেতনার মধ্যে ছিল এই নন্দিনী-আকৃতি। সে যুগের লীলাবতীরা হলেন এ যুগের পদ্মাবতী, গার্হস্থ্যের শর্মিষ্ঠারা হলেন নতুন যুগের পুরুষের ধ্যানের শর্মিষ্ঠা। অন্তর্পটের এই নারীচেতনাই পরবর্তীকালে আরও প্রকট হয়েছিল। "মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন?"-এর দর্শন একক নারীকে দেশরূপী সমষ্টিচেতনার মধ্যে মিশিয়ে ফেলার দর্শন, যার পরিণতি 'বন্দেমাতরম্' পুরুষভোগ্যা নারীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে-ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর তাকে জীবনে সংস্থাপিত করে-ছিলেন। বঙ্কিম তার লোকায়ত রূপকে করলেন লোকোত্তর। এই লোকোত্তর শক্তি পরবর্তীকালে মহাকালের সাথে অভিন্ন হয়ে বিপ্লবীদের আরাধ্য 'মহাকালী' হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯-শতকীয় বাঙালী সমাজচেতনার এই হ'ল নীট ফলশ্রুতি।

নারীমুক্তি যে-কোন দেশের পক্ষে বাঞ্ছিত ও প্রগতিশীল আন্দোলন। এই আন্দোলনের বাড়াবাড়িটুকু বাদ দিয়ে হয়ত বা তার সৌকর্য বজায় থাকত। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর আবেগ এমন প্রপাতের মত সমাজচেতনাকে আচ্ছন্ন করল যে আন্দোলনের লজিক গেল হারিয়ে। ৫৭-র মহাবিদ্রোহের কিছুকাল আগে থেকে নারী-আন্দোলন বাড়ছিল। ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এক

বিধবার পাণিগ্রহণ করলেন। নিঃসন্দেহে শিক্ষিত বাঙালীর মন রাজনীতির বাইরে সমাজসংস্কার-চিন্তায় মগ্ন হ'ল। নারী-আন্দোলনের সাথে সাথে রসপিপাসু বাঙালী নাট্য-আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। "সে সময় (১৮৫৬৫৭ সালে) শহরে ইংরাজদের একটি প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় ছিল। তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় দেখিতে যাইতেন। দেখিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই কেন বলিয়া ক্ষোভ করিতেন" [রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃঃ ২৩৩] "ইতিমধ্যে ১৮৫৪ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ভবনে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' স্থাপিত হয়। তাহাতে দেশীয় শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়া গেল। রঙ্গালয়ে অভিনয় একটা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইল। স্কুলের ছেলে-ছোকরারা স্বীয় স্বীয় দলে ছোট ছোট রকমের ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতির অভিনয় আরম্ভ করিল।" [রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃঃ ২০৩] ৫৭-র মহাবিদ্রোহের আগে এটি ছিল দ্বিতীয় প্রবণতা যা বাঙালী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকে রাজনীতি বিমুখ করে তুলেছিল। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের বছর সিমলার ধনী ব্যক্তি ছাতুবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়। এরপরেই পাইকপাড়া রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বেলগাছিয়াতে নাট্যালয় স্থাপিত হয়। সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হ'ল। বাঙালী হ'ল আরো রাজনীতি-বিমুখ।

বাঙালীকে যিনি ১৮৫৭-র ঠিক আগে প্রভাবিত করেছিলেন তিনি হলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর প্রভাব কী ছিল তা লিখেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী: "ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল

করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যে-কেহ সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি ইংরাজীতেই করিতেন" [ঐ]। মূল কথাটা হ'ল বাঙালী পত্রপত্রিকা তখন রাজনীতি চর্চার মত যথেষ্ট ম্যাচুরিটি অর্জন করে নি ম্যাচুরিটি যতটুকু ছিল তা ইংরাজী পত্রপত্রিকার। যারা ইংরাজী জানতেন তাদের সংখ্যা কতটুকু ছিল? আর তারা ইংরাজ শাসন প্রদত্ত সুস্থিতিকে ঈশ্বরীয় শান্তি ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। যারা নীল-অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছিলেন তারা যে খুব কৃষকদের দুঃখে কাতর হয়ে লিখেছিলেন তা নয়। আসলে British Justice সম্বন্ধে তাদের একটা অতিরঞ্জিত ধারণা ছিল। তারা মনে করতেন নীল সাহেবদের কার্যাবলীর ফলে সেই British Justice মার খাচ্ছে। বার্ক যখন হেস্টিংস-এর সমালোচনা করেছিলেন তখন এই British Justice-কে চোখের সামনে রেখেই করেছিলেন। দাদাভাই নওরঙ্গীও এই British Justice-কে স্বীকার ক'রে নিয়েই তাঁর ***Poverty And Un-British Rule In India*** লিখেছিলেন। অতএব একথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, নীল নিয়ে উত্তেজিত-হয়ে-ওঠা বাঙালীরা খুব রাজনীতি-সচেতন ছিল।

উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ৫৭-৫৯ মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে যে-সকল প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে কোনটিকেও পরিচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক প্রবণতা বলা যাবে না। বাঙালী মধ্যশ্রেণীর, বিশেষত ডিরোজিও-গোষ্ঠীর, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে ১৮৩৬ সালের মে মাসে Englishman পত্রিকা যা লিখেছিল তা স্মরণীয়: "In matters and Politics, they are all radicals, and are followers of Benthamite

principles··· They think that toleration ought to be practised by every Government···With respect to the question relating to political economy, they all belong to the school of Adam Smith." । ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের আগে রাজনীতি কি বাঙালী জনমানসে কোন নির্দিষ্ট প্রবণতার সৃষ্টি করতে পেরেছে ? বোধ হয় না। রাজনীতি যদি সুনির্দিষ্ট প্রবণতা'রূপে দেখা দিত তবে কেশবচন্দ্র সেন, যিনি ১৮৬০-এর দশকের বাঙালী যুবসম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা, ১৮৫৬ সালে হিন্দু কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম, নারীপ্রগতি আন্দোলন ও সমাজসংস্কার-চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গেলেন কী করে ? মহাবিদ্রোহের কোন প্রভাব কি তাঁর উপর পড়েছিল ? আসলে ১৮৭০-এর দশকের আগে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা এসেছিল ব'লে মনে হয় না। কীভাবে সেই রাজনৈতিক সচেতনতা এলো এবং কাদের প্রভাবে এলো তা লিখতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "১৮৭৪ সালে একদিকে আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ফিরিলেন, অপরদিকে সেই সময়ই বা কিঞ্চিৎ পরেই সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন। ইঁহারা উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হাজার হাজার যুবক ইহাদের কথা শুনিবার জন্য ছুটিতে লাগিল, এবং হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল; যুবকদল যেন ব্রাহ্মসমাজের দিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইল" [রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃঃ ২৭৪]। বাঙালী মধ্যশ্রেণী এর দু'দশক আগে 'রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে' মুখ ফেরায় নি। নারী আন্দোলন, রঙ্গ-

শালা নিয়ে উৎসাহ, বাঙালী পত্রপত্রিকায় রাজনীতি-বিমুখ চিন্তার আধিক্য এবং সাহিত্যে অতীতচারিতা কিংবা 'নীলদর্পণ' যে-অর্থে সমকাল-সচেতন সে-অর্থে সমকাল-বিমুখতা বাংলাদেশে এমন এক মানসিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে মহাবিদ্রোহের তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে পারে নি।

The Brahmo Samaj and the shaping of the modern Indian mind : David Kopf.

(Princeton University Press, U. S. A. দাম লেখা নেই)

বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। তিন বছর কেটে গেছে তারপরে. অথচ একটিও উপযুক্ত সমালোচনা ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় ছাপানো হয়নি, অন্তত আমার চোখে পড়েনি। ইংরিজীতে লেখা দুটি সমালোচনা পড়েছি, দুটিই দিল্লী থেকে প্রকাশিত সমালোচনা-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। কলকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে, বাংলা ভাষায়, কেন কেউ বইটি সম্পর্কে কোনই উচ্চবাচ্য করলেন না, জানতে কৌতূহল হয়। ইংরিজী সমালোচনায় একটি, লক্ষ করলাম, অধ্যাপক স্থূমত সরকার করেছেন। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিকের মন্তব্য পেশ করেছেন তিনি. যেখানে আমেরিকার গবেষকমাত্রেই হয় সন্দেহভাজন নয় তাচ্ছিল্যের বস্তু প'ড়ে আরও মনে হয় যে, অধ্যাপক বোধহয় সামনের, মাঝখানের, আর শেষের দু'একটি ক'রে পাতায় চোখ বুলিয়ে, নথের ডগা দিয়ে বইটি ঠেলে সরিয়ে, তাঁর রায় লিখতে বসেছিলেন। অধ্যাপিকা অপর্ণা বসুও বইটিকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দিতে পারেন নি, অথবা দিতে চান নি, তাঁর লেখা সমালোচনাটিতে। তিনি বাঙালী না হ'লেও, বাংলার নবজাগরণ-উদ্ভূত সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত, এখানকার শিক্ষাজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক দিনের। অথচ অমন ভাসা-ভাসা কয়েকটি কথায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ ক'রে, ক্লান্তিজনক ও বহুব্যবহারে জীর্ণ একটি 'ক্লীশে' —ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে আলোচনা করার আর কি প্রয়োজন, তার যা

শক্তি ছিল তা ভো করে ক্ষয় হয়ে গেছে ! —বসিয়ে দিয়ে তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছেন।

'হীনযান' পত্রিকা আমাকে আমার বক্তব্য পেশ করতে সুযোগ দিলেন, আমি একজন বিদগ্ধ সমালোচক ব'লে নয়, একজন সাধারণ কৌতূহলী পাঠকের যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ বই পাঠের পরে একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবার অধিকার আছে ব'লে। সেই সুযোগ আমি সাগ্রহে নিলাম, কারণ বইটি আমার অসাধারণ লেগেছে, আর যে-কোনও আগ্রহী পাঠককে—বিশেষত তিনি যদি বাঙালী হন—বইটি মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করব ব'লে।

সূচীপত্র, ভূমিকা থেকে শুরু ক'রে শেষের বিস্তারিত টীকা, গ্রন্থবিবরণী ও ইন্‌ডেক্‌স্‌-সহ বইটি ৩৯৯ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। —আর উৎসর্গ পৃষ্ঠার সাদা পাতাটিতে শুধু ছোট দুটি পংক্তি—To Calcutta, Ex Oriente Lux। ভূমিকার শেষ ছত্রেও কলকাতার প্রতি একই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, যা সামান্য কয়েকজন বিদেশী ভারতপ্রেমিকের ভাষায় বা উচ্ছ্বাসে রূপায়িত হয়েছে। যাঁরা মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডেভিড্‌ কফ্‌কে কলকাতায় ঘুরতে ফিরতে দেখেছেন, তাঁরাই জানবেন যে এই শহর ও তার বাসিন্দা বাঙালীদের সম্পর্কে কফ্‌-সাহেবের উৎসাহ ও কৌতূহল কতটা গভীর আর অকৃত্রিম। বইটির প্রতিটি পাতা সাক্ষ্য দেয় আধুনিক বাংলা সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের বহু বছরের অভিনিবিষ্ট গবেষণা এবং আন্তরিক ঔৎসুক্য।

ভূমিকায় কফ্‌ শিবনাথ শাস্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন

করেছেন, তাঁর ১৯১২ সালে প্রকাশিত ***A History of the Brahmo Samaj*** বইটির জন্য। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শিবনাথ লিখেছেন, "I was deterred by the thought that, having been one of those who had a leading hand in the organisation of a·····movement, I was not the proper person to write a history of the Brahmo Samaj, and that it should be left to out-side observers." কফ্ নিজেই পরে স্বীকার করেছেন যে তাঁর এই বইটি খানিকটা যেন শিবনাথের প্রেরণায়, তাঁরই আদেশ মেনে নিয়েই লিখতে শুরু করা হয়েছিল। শিবনাথের বইটি সম্পর্কে কফের মন্তব্য, "·····it is a monumental descriptive work of the highest quality:"। আমার মনে হয় ডেভিড্ কফের আলোচ্য বইটি সম্পর্কেও এই একই কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে। বইটির চিত্তাকর্ষক ভূমিকার পরেই একটি ঐতিহাসিক 'ক্রনোলজি'র সূচী সাজানো হয়েছে, যা প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠককেই উৎসাহিত করবে, ভাবিয়ে তুলবে। এটি আরম্ভ হয়েছে ১৮১৩ সালে রামমোহন, দ্বারকানাথ ও এ্যাডামের Calcutta Unitarian Committee-র স্থাপনা দিয়ে, আর শেষ হয়েছে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে। মাঝে আছে তিনপাতা জুড়ে ব্রাহ্ম ইতিহাসের নানা অর্থপূর্ণ ঠাঁনামা, নানা রুতিহ, সমস্যা বা ভাবনার মোড়-ফেরা। লেখক যে কতটা চিন্তা সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন, প্রতিপাদ্য বিষয়ের কতটা গভীরে পৌঁছেছেন, তা বইটি না পড়লে বোঝা অসম্ভব।

সমস্ত বইটি চারটি অসমান ভাগে বিভক্ত—প্রথম অংশ, Reformist modernism, যার মধ্যে চারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম

পরিচ্ছেদে হিন্দু সমাজসংস্কারে Unitarianism-এর অবদান বিষয়ে বিশদ আলোচনা। দ্বিতীয়টিতে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম-নিরপেক্ষতা-বোধ, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং মানবতাবোধের প্রতি আস্থা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, Bhadra-lok Reformer নামে, বিশিষ্ট ক'জন ব্রাহ্মনেতার জীবনাদর্শ, ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও মানসিক 'identity crisis' নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, ঔপনিবেশিক আবহাওয়ায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেমনভাবে এই আদর্শবাদী যুবগোষ্ঠীর পরিবারগত, সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত সমস্যায় নাড়া দিয়েছিল, তারই বিস্তারিত ও জীবন্ত বিবরণ। প্রথম অংশেই আমরা পরিচিত হই কয়েকটি একসময়ে - বিখ্যাত-অথচ - এখন - প্রায় - বিস্মৃত বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে। তাঁরা সকলেই যে ব্রাহ্ম তা নয়, কিন্তু তখন তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের সকল চিন্তাধারার সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ ক'রে কাজ ক'রে গেছেন। রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, ডিরোজিও, শিবনাথ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, আনন্দমোহন—সকলের আগমন ও প্রস্থান নাটকীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। এর পরে অক্ষয় কুমার দত্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক চিন্তাধারা, রাজনারায়ণ বসুর যুক্তিবাদী স্বাদেশিকতা, জগদীশচন্দ্রের গভীর ধর্মবোধের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানচেতনা, সীতানাথ তত্ত্বভূষণের বেদান্তদর্শন, সবই খুব সূক্ষ্ম ডিটেলে বর্ণিত হয়েছে। এরই মাঝে মাঝে বর্ণনা প'ড়ে আশ্চর্য হই, কী কঠোর-ভাবে সমাজের রক্ষণশীল দলপতিরা এই তরুণ সংস্কারকদের শাস্তি দিয়েছেন, কত অপমান ও দুর্ভাগ্য তাঁরা মাথা পেতে নিয়েছিলেন। সব বিস্তারিত বিবরণই টীকায় আদি সূত্রের বিশ্লেষণে বোঝানো রয়েছে। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ

কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের বিদ্রোহী তরুণেরা, আধুনিক সমাজহিতৈষী বুদ্ধিজীবীদের অনেক আগেই পদদলিত জনগণ ও নিগৃহীত নারীজাতির জন্য যুদ্ধ ক'রে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। দ্বারকানাথের স্ত্রী কাদম্বিনী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম ক'জন মহিলা গ্র্যাজুয়েটের ভিতরে অন্যতমা, ও প্রথম মহিলা ডাক্তারদের মধ্যেও তাই।

দ্বিতীয় অংশে, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধর্মীয় নীতি নিয়ে ভাবী কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা পাওয়া যায়। এইখানেই সমাজ-সংস্কারকদের সমস্যা শুরু হয়— স্বদেশপ্রেমের জন্য সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-অন্যায় সবই কি নীরবে মেনে নেব, কোনও আপত্তি তুললেই কি তাঁদের সন্দেহ করা হবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী-দের চর ব'লে? খৃষ্টিয়ধর্মোন্তরীদের সঙ্গে ব্রাহ্মদেরতাদের বিরোধ এখানে বর্ণনা করা আছে। Bhadralok Reformer-রা এবারে সংকটময় মুহূর্তে এসে পৌঁছলেন। 'জাতীয় সংস্কৃতির' কষ্টিপাথরে তাঁদের ঘ'ষে পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে। এইখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাটকীয় যাওয়া-আসা অতি-নিপুণ, সূক্ষ্ম টানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তৃতীয় অংশটিকে Synthesis নাম দেওয়া আছে। কয়েক ব্যক্তিগত বক্তব্য আর ঐতিহাসিক চেতনা যেন এই অংশ-টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে-আপাতকঠিন ব্যবধান বা বিরোধ নিয়ে জগতের বিদ্বৎকুল সর্বদাই তর্কে ব্যস্ত, তার এক সহজ সমাধান ধীরে গ'ড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মসমাজের উত্থা-নের সঙ্গে—এটাই যেন লেখকের মত। উদাহরণস্বরূপ, এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন হিসাবে, তিনি শেষে তুলে

ধরেছেন দুটি অসাধারণ মানুষকে—কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। তৃতীয় অংশের গোড়ায়, তিনি পরপর সাজিয়েছেন কেশবের ম্যাক্সমুলারের কাছে একটি মন্তব্য—"that I will preach the union of Eastern and Western theism, the reconciliation of Europe and Asia". এর নিচেই তিনি তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর স্বপ্নাদর্শ—"we seek to establish a living relationship between East and West···to fulfill the highest mission of the present age—the unification of mankind"। এই অংশে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ ধর্মচেতনা ও মানবতাবোধ প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মননশীল উপনিষদ-চেতনার সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মীয় ভক্তি ও প্রেমাবেগের বৈপরীত্য একযোগে কী সমস্যা বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল, তারও ইতিহাস পাওয়া যায়।

লেখকের একটি মস্ত গুণ, এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও এতগুলি মানুষের চরিত্র সম্পর্কে লিখেও তিনি তাঁর রসবোধ হারান নি। প্রতিটি চরিত্র দোষে-গুণে সরস-সজীব মানুষ। তাঁদের eccentric বিশেষত্বগুলিও লেখকের চোখ এড়ায় নি। নারীমুক্তি বা স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রাহ্মনেতাদের তর্কাতর্কি নিয়ে ভারী মজার কিছু তথ্য কফ্ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

শেষে রবীন্দ্রনাথকে Reformer ও Universal Humanist হিসাবে অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আর 'গোরা' উপন্যাসটিকে কোনও বিদেশী যে এমন আন্তরিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তা না পড়লে বিশ্বাস করতাম না। সমাপ্তিতে কফ্ ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে "Bengal's legacy to

20th Century India" বলে অভিহিত করেছেন। বইয়ে অনেকগুলি মূল্যবান চার্ট ও তালিকা আছে, ছবিগুলিও কৌতূহল জাগায়। তবে বেশীর ভাগই কেশবচন্দ্রের পরিবারের। রবীন্দ্রনাথের ছবি তো একটা দেওয়া যেত, অন্তরাই বা কেন বাদ পড়লেন? আধুনিক ভারতে Marxism সম্পর্কে খুব মন দিয়ে শোনার মত কিছু বক্তব্য লেখক সাহস করে লিখেছেন।

একটা বড় ত্রুটি বারেবারেই চোখ ও মনকে পীড়া দেয়—অত্যন্ত পরিচিত নামগুলির মারাত্মক ভুল বানান ও উচ্চারণ।

শ্যামশ্রী লাল

ক
বি
তা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সীমাশুল্ক

নিজেকে দায়ী করেছি এই প্যাস্টোরাল
প্রান্তরের ধ্রুপদী ধৈবতে ;
মাল্লারা বিলিয়ে যায় শরৎকাল
হ্রদে ও সৈকতে ;
ছুটির দম্পতির আমার কথা দিয়েছে
উত্তরাধিকার
শহরে নিয়ে যাবে, মিনেসিঙ্গারেরা
উৎসর্গের তেজে
গান শুনিয়ে চলে গেল, তবু ও ছেঁড়া
একটি কবিতার
বুভুক্ষু উৎপ্রেক্ষা একা শূন্যে অনাথ
খুইয়েছিল আত্মপরিচিতি :
নিজেকে তাই দায়ী করেছি। অস্ট্রিয়া আর সুইজারল্যাণ্ড
সীমারেখায় দাঁড় করিয়ে লক্ষ্য করে আমার গতিবিধি ॥

চালচিত্র

কুয়াশার হাতে ধ্বস্ত গির্জে-চূড়া
ফুটিয়ে তুলেছে অল্প তুলির টানে
নতুন দেবতা, অসহায় ; আমি তাকে
আশ্রয় দেবো, দেবায়তনের থেকে
ঝুলে নিয়ে গিয়ে দেখাবো খাদের নিচে
বামনেরা সুখে বাস্কেট-বল খেলে ॥

বিনয় মজুমদার

আজকে দোসরা ভাদ্র

আজকে দোসরা ভাদ্র তেরোশ উননব্বই অষ্টাবক্রা তিথি।
এখন সন্ধ্যায় চাঁদ পৃথিবীর থেকে দেখা যায়: না মোটেই,
তবুও এখন সূর্য চাঁদের পূর্ণিমা দেখে চাঁদের পুরোটা দেখে আর
শুক্লপক্ষে সপ্তমীতে যখন পৃথিবী চাঁদ অর্ধেক দেখবে
তখনো এ সূর্য কিন্তু দেখবে সমগ্র চাঁদ—চাঁদের পূর্ণিমা।
আসলে ব্যাপার হল পৃথিবী সারাটা মাস নানারূপ চন্দ্রকলা দেখে,
সূর্য কিন্তু সর্বদাই চাঁদের পূর্ণিমা দেখে সারাক্ষণ পূর্ণিমাই দেখে;
কেবল চন্দ্রগ্রহণ হবার সময়ে সূর্য পূর্ণিমা দেখে না।
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হয়
আর পৃথিবী ও চাঁদ একত্রে সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

এই পথ দিয়ে আমি

আমার বাড়ির ঠিক উত্তর পাশের পথ চলে গেছে সোজা পূর্ব দিকে।
এই পথ দিয়ে আমি হেঁটেছি আজকে সন্ধ্যাবেলা।
পন্থার উত্তরপাশে ছিল দীর্ঘ শস্যক্ষেত পন্থাটির পাশ বরাবর।
অনেক ছন্দিত শস্য ফলেছিল পন্থাটির পাশে সন্ধ্যাবেলা।
সম্প্রতি এসব ক্ষেতে মানুষ বসতবাটি নির্মাণ করেছে।
যে পথে শস্যের দিকে যাওয়া যেত এককালে সেই পথ দিয়ে
এখন ঘরের মধ্যে যায় লোকে সারি সারি বাড়ীর ভিতরে চলে যায়।
এই দৃশ্য দেখলাম আজকে সন্ধ্যায় আমি পথ দিয়ে গিয়ে ফিরে এসে।

কেতকী কুশারী ডাইসন

তুমি আসবে ব'লে

তুমি আসবে ব'লে আজকে সকাল থেকে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে,
তুমি আসবে ব'লে।

আজকে ছাদে টালি খ'সে পড়ছে,
দরজার ছিটকিনি খুলে যাচ্ছে,
উলটে যাচ্ছে ডাস্টবিন,
উড়ে যাচ্ছে খবরের কাগজ,
তুমি আসবে ব'লে।

আকাশে যত মেঘ ছিলো সব ফুটিফাটা হয়ে যাচ্ছে :
আমি অনেক দিন দেখি নি
বুনট ছেঁড়ার আর সেলাই খোলার এমন সমারোহ।

আমার যত কাপড় কাচার ছিলো
সব কেচে একে একে মেলে দিলাম।
তারা কাঠের ক্লিপসুদ্ধ পালিয়ে যেতে চায়
দস্যি হাওয়ার ভালোবাসায়।

মরা এল্‌ম্ গাছগুলো ভেঙে পড়বে,
ওদের কঙ্কালগুলো দুমড়ে যাচ্ছে :
শুকনো হাড় থেকেও যে এমন মর্মর উঠতে পারে
খেয়াল ছিলো না আমার।
হয়তো ট্রেনের জানলায় চোখ রাখলে তুমি।

উঠানে আসার সময় রান্নাঘরের দরজাটা খুলে রাখার চেষ্টা করি।

দড়াম ক'রে বন্ধ হয়ে যায়।
যদি হঠাৎ তোমার ফোন আসে, শুনতে পাবো না।
অবশ্য তুমি এখনও অনেক দূরে।
আজকে আদৌ তোমার ফোন প্রত্যাশা করছি না।

তুমি আসবে ব'লে আমি চাইকভ্স্কির ষষ্ঠ সিম্ফনিটা
সতেরোবার বাজালাম।
যদি তুমি মাঝপথে মন বদলে ফেরত চ'লে যাও,
তা হলে এই আলেগ্রো ভিভো,
আলেগ্রো কন্ গ্রাৎসিয়া
প্রভঞ্জনের পাখায় তোমাকে হরণ ক'রে আনবে।

আমার বক্তৃতা আর কর্তব্যগুলো পুরোনো হয়ে যাচ্ছে,
কিন্তু অনুভবগুলো এখনও পুরোনো হলো না।
সুরগুলো মাঠের উপর দিয়ে দুরন্ত এঞ্জিন,
ঘাসের ফ্রস্ট চাকার দাপট ধ'রে রাখতে চায়।

আমাকে একজন লিখেছিলো,
"মেয়েদের আমি পুরোপুরি ভালোবাসতে পারি না
যদি তোমাকে পুরোপুরি ভালোবাসতে পারতাম,
তোমার জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চ'লে আসতাম।"
আমি তাকে লিখে দিয়েছিলাম, "সর্বনাশ, তুমি নারী বা পুরুষ
বা ঈশ্বরের জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে যেও না;
ডুবে মরবে, কারণ অলৌকিক উদ্ধার ব'লে কিছু নেই।
যীশুকে ক্রুশ থেকে ঝুলতে দেখেও
ঈশ্বর কিছু করতে পারেন নি।"

আমার সতেরোটা ক্রিসমাস কার্ড ডাকে দেবার কথা ছিলো।
ডাকঘরে যাবার সময় নেই একেবারেই।
ডিসেম্বরে আমার বাগানে ওয়ালফ্লাওয়ার ফুটেছে।
অলৌকিক কিছু নয়, প্রকৃতি যে সুযোগ খোঁজে
সেই বীজ বোনার তাগিদেই।

এই ষষ্ঠ সিম্‌ফনিটা প্রথম বাদিত হবার দশ দিন বাদেই
মারা গিয়েছিলেন চাইকভ্‌স্কি।
অথবা আত্মহত্যা করেছিলেন। সঠিক জানা যায় না।
অমন একটি সংগীতাংশ রচনা করার পর
আর কী-ই বা করতে পারতেন তিনি, ঝড়ের মুখে মানুষ,
মৃত্যুর সীলমোহর-মারা লেফাফা?

প্রস্তুতিতে থাকি : সৃষ্টির পরে মৃত্যুর..
মৃত্যুর আগে সৃষ্টির, মৃত্যুর আগে মিলনের
প্রাকৃত চক্রান্তের।

কালীকৃষ্ণ গুহ

শুদ্ধ কল্যাণ

শুদ্ধ কল্যাণ রাগে বেজেছে সেতার।
আমাদের পাপের ভিতর থেকে বেজে উঠেছে কি?
পুণ্যের ভিতর থেকে?
নাকি পাপপুণ্য অতিক্রম ক'রে ওই সেতার বেজেছে?

বৃষ্টির বিকেলে আজ যার শুদ্ধ-কল্যাণ মুখ নিষ্পলক দাঁড়িয়ে দেখেছি
তাকে কোন্ সংকেত পাঠাবো?

প্রৌঢ়

এইভাবে কেন কাঁদলে আজ ? একা ব'লে ?
এর আগে এইভাবে কখনো কাঁদো নি।
তোমার নিজস্ব গান গাওয়া হয় নি ব'লে এরকম ফুপিয়ে কেঁদেছো ?
কান্নার বিশ্রামে কেন ব'লে উঠেছিলে— চ'লে যাবে ?
কান্না শেষ হ'য়ে এলে ঘুম এলো। আর তক্ষুণি
সংকেত পাঠালো এক ডানা-কাটা পরী। তার কাছে যাবে ?
সে তার বাগানে রোজ নীল আলো জ্বেলে ব'সে থাকে—
দুঃখ আছে তারো।

বালক পুত্রের পাশে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে থাকি প্রতিদিন
প্রৌঢ়তার পথে।

সুরজিৎ ঘোষ

সারারাত

তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাত হলো।
কখন নিভেছে দীপ, দীপ নির্বাণের গন্ধ চিনতে পারিনি,
অন্ধকারে এখন কেবল মোমের মতন সাদা হাতে
এক টুকরো জ্যোৎস্নাকে গৃহবন্দী সাজিয়ে রেখেছো !
স্বাতী নক্ষত্রের কান্না, অরুন্ধতী বিশাখার আলো
স্নিগ্ধ মমতা হয়ে সারারাত জীবনের দুপাড়ে ছড়ালো।

বিষ

যতটুকু জেনেছে শরীর, তারও চেয়ে বেশি বিষ
নেমে গেছে শিকড়ে শিকড়ে। বালকের ফুটবলমাঠ
ভরে গেছে মরা ঘাসে, ধূসর পাণ্ডুলিপি
নিষিদ্ধ করেছে খেলা, ঘরের চৌকাঠে
শুধু নিষেধের আয়োজন।

এই ঘর গৃহস্থালী, যদি একে তাই বলো, লাল রঙ মেখে
পড়ে আছে। মন্দির চূড়ার মতো বর্শাফলকের প্রতিচ্ছবি
অপরূপ মৃত্যু হয়ে বিঁধে আছে কার্নিসের বুকে।
বিপদ সঙ্কেত আর বারণ নির্দেশ নিয়ে ম্লান হাসিমুখে
দাঁড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যা, যেন কোনো হতভম্ব ট্র্যাফিক পুলিশ।
"ফেলে দে ফেলে দে মুক্তি, ওই দ্যাখ্ লেগে আছে বিষ,"
সমস্ত জীবন ধরে এই ক্রুদ্ধ জননী-শাসন
আমাকে রেখেছে বেঁধে মূর্খ ভয়ে, চৌকাঠের লক্ষ্মণ-গণ্ডীতে।

পোকা লাগা ব্যর্থ মাঠের, হয়তো বলবার মতো কিছু ছিল
ভীরু বালকের দল অন্ধকারে ফিসফিস প্রতিবাদ
জড়ো করে এনেছিল, রেখেছিল আমার শিয়রে।
তবু কোনো আর্তনাদে জাগাতে পারিনি গান। শুধু
নিজেকে কুণ্ডলী করে গুটিয়ে নিয়েছি, আর
যতো বেশি গুটিয়েছি, ততো বিষ জমেছে শিকড়ে।

CENTRAL LIBRARY

সুভাষ ঘোষাল

বাস্তবিক

আমার একজনই অধ্যাপক আছেন
যিনি অলৌকিক।
হাত
গোপন কুয়াশাগুচ্ছের ভিতর দিয়ে
পিঠের ওপর নামিয়ে এনে
যিনি বলে উঠতে পারেন—জয় হোক।

আমি কখনও কখনও সসাগর পাখীদের সঙ্গে
তাঁর পংক্তিভোজের কথা ভেবেছি।
আমি কখনও কখনও আনন্দের অনুবাদে হাত দিতে গিয়ে
ভ্রমণের মধ্যপথে তাঁকে সংগ্রহ করেছি।

সংসার থেকে

এসো আমরা আপ্রাণ হলুদের কথা বলি।
হলুদ হয়েছিল দিগন্ত
দিগন্ত মানে
তুমি যেদিকে বেজে ওঠো বারবার
আমি যেদিকে দৌড়ে যাই।

এসো আমরা ধরে ধরে ব্যক্তিগত কথা বলি।
কোন এক পূর্ণিমার পর প্রায় পূর্ণ দুহাজার বছর

আর এই প্রাচা গোধূলিতে
আমাদের মধ্যে থেকে
আমাদের সঙ্গে হাঁটছে
শিশু।

দিগন্ত মানে
তুমি তারই অঙ্কুরিত হাত ধরেছো
আমি তারই অঙ্কুরিত হাত ধরেছি।

নির্মল হালদার

শিশু, ভারতবর্ষ

ফুলের গভীর গৃহে
ও যাক। ওর মা মরেছে বাপ মরেছে
চালাও গেছে আমাদের ঝড়ে
একটি ফুলের ফুটে ওঠা ধ্বনি ওর গৃহ ওর পোশাক।
কোল দেবো কোল দেবো ক'রে মেয়েরা ডাকলেও
ও কোল-কাঁখ সইবেনা আর
ফুলের গভীর গৃহে ওর সাধা সূর্যের সাতরঙ

ফাঁপা নই কাঁপা নই

বলছো তুমিও
হাড়ে সুর নেই হাড়ে বাতাস
তুমি তাই সৌন্দর্য্য হারিয়েছো তুমি তাই ফাঁপা।

CENTRAL LIBRARY

হীনযান

একটা নদীর কাছে দাঁড়ালে, মনে হয়
প্রতিদিনের উৎসব
তুমি উৎসবের গতি-প্রকৃতি নিয়ে
নিজেকে করো জমকালো।

আমরা ফাঁপা নই কাঁপা নই
নদীর ছল্‌ছল্‌ গানে শরীর গড়বো, গঠনের দিনগুলি
কাঁচালঙ্কার সবুজ আমাদের করবে আলো।
ধামবাটি থেকে তুলবো থৈ থৈ আনন্দ

পুস্তক-পরিচয়

Mainly in the Winds : Taposh Chakraverty
(Writers Workshop. 1982)
An Outline : Subrata Sinha (Samet 1981)
Broken Fingers : Kishore Chatterjee (Same. 1982)
Angeldust : Shomi Mukherjee
(Tulika Mukherjee. 1982)

ভারতীয় ইংরেজি কবিতায় চারজন নতুন লেখকের প্রথম কবিতা-সংকলন উক্ত বইগুলি।

প্রথম চালেই কিস্তি মাত করেছেন তাপস চক্রবর্তী। ৭৬ পাতার সংকলনভুক্ত কবিতাগুচ্ছ ভারতীয় ইংরেজি কবিতায় অনন্য। 'Cardiographia Suburbia' এবং 'I am a Mountain' কবিতা দু'টি এই শাখায় তো বটেই, পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার সাহিত্যে পরম সম্পদ। চেতনার গভীরতায় ও আঙ্গিক কৌশলে দ্বিতীয় কবিতাটি সব গভীরতাসম্পন্ন কাব্য-রসিককে কয়েক প্রস্থ আবিষ্ট করে রাখবে; সন্দেহ নেই। পরন্তু; পদার্থ-বিজ্ঞানের কিছু ধ্যান-ধারণা ও শব্দাবলীর সঙ্গে জীবন ও শিল্পের সংশ্লেষ সম্পাদনে এই তরুণ কবি এক নতুন রশ্মি সঞ্চার করেছেন; যেমন বাংলা ভাষায় বিনয় মজুমদারের কবিতায় লক্ষ্য করা যায় গাণিতিক ব্যঞ্জনা। আলোচ্য বইয়ের প্রথম পর্বে দু'তিন পংক্তির কবিতাগুলিও সার্থকভাবে 'আধুনিক' কবির ব্যঞ্জনায় মূর্ত। ওয়াকিবহাল কবিতা পাঠকদের উন্নাসিকতার কবিতার কথা মনে পড়বে।

তরুণ কবি সুব্রত সিংহ সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত্রি-

হয়েছে. যে-সব কৌশলে কাহিনীটি বাঁধা হয়েছে. এক কথায় তা বাংলা নাটকে অভূতপূর্ব। —শুরুতে পর্দা উঠতেই দেখা যায় খুশিতে ডগমগ এক সচ্ছল যুব-দম্পতি দুর্যোগপূর্ণ এক রাত্রিতে অতর্কিতে এসে উঠেছে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত প্রায়-পরিত্যক্ত এক বিধ্বস্ত গৃহে. যেখানে আবর্জনা-সদৃশ জীর্ণ আসবাবে উৎকীর্ণ নিরবচ্ছিন্ন কালের আঁচড়। এবং প্রথমে আড়াল থেকে (সংলগ্ন ঘরে) এবং একটু ক্ষণ বাদেই মঞ্চে উপস্থাপিত ডেরায় নিরুপদ্রব-ভঙ্গিতে কথা ব'লে চলেছে বৃদ্ধ গৃহকর্তা, যার পরিচয়ের মতোই ভাষাও অসংলগ্ন, যার মাধ্যমে সংযোগ ঘটিত হচ্ছে অতীত ও বর্তমানে, অতীতের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে অকল্পনীয় কামনার। এমন-কি ভবিষ্যতে নাটকের পরিসরে যা ঘটতে চলেছে তারও সঙ্গে। পরিণতিতে পৌঁছোবার আগেই দেখা গেছে, পড়নের কাদামাখা শাড়িটি পাল্টে আশ্রিত যুবতী-স্ত্রী গৃহকর্তার দে'য়া শাড়ি পরে নেয়। একটি চমৎকার মোটিফ্ এ'টি, যা দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হ'লো স্ত্রী-চরিত্রটির আসন্ন মেটামরফসিস্-এর। প্রসঙ্গত আরো বলার যে, প্রথম থেকেই স্ত্রী-চরিত্রটি এই গৃহে এসে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এমন-কি পরিবেশের রহস্যময়তায় কখনো-কখনো তার আড়ষ্টতা প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় এক জগতের প্রতি তার আসক্ত অনুভূতির পরিপূরক. অর্থাৎ এই নতুন পরিবেশে সে তার প্রতিদিনের এক গোপন সত্তাকেই অনুভব করছে। এবং সেই অনুভবের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই সে বৃদ্ধের মধ্যে খুঁজে পায় তার একান্ত চাওয়া, তার অতীতের প্রেমিক রঞ্জনকে।

স্ত্রী-চরিত্রটি চাইছিলো মুক্তি, শেষ অবধি সে পেলো। দেহপিঞ্জর থেকে দেহাতীতে, কাল থেকে কালাতীতে মুক্তির ব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত। এমন-কি মহামিলনের স্রোতে নিঃসাড়ে কীভাবে

ভেসে চ'লে যায় সামাজিক বৈষম্যের বেড়াজাল—দরিদ্র বৃদ্ধের কাছে বিত্তবান সমাজের স্ত্রী-চরিত্রটির নিঃশর্ত আত্মদানে তাও দেখিয়ে দিলেন নাটকার। কোনো বক্তৃতা-শ্লোগানের প্রয়োজন হয় নি তাঁর। সব দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় "থিয়েটার অফ লিবারেশন"-এর এক অনুপম দিগ্‌দর্শন এই বাংলা নাটকটি।

নাটকটির প্রযোজনায় ষ্টাডি সার্কল্ চমৎকার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। শংকর ভট্টাচার্যের নির্দেশনা অসাধারণ। মঞ্চ-সজ্জায় ও আলোর ব্যবহারে নাটকের যথাযথ আবহ গ'ড়ে উঠেছে। স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী লালের অভিনয় (বিশেষত তার মুখমণ্ডলের প্রকাশভঙ্গি) অসাধারণ। বৃদ্ধের চরিত্রে তপন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সুদূরের প্রকাশ এক অপার্থিব স্বরায়নে তাৎপর্যমণ্ডিত। বাচনভঙ্গিতে শম্ভু মিত্রকে অনুকরণের চেষ্টা না করলেই ভালো হতো। স্বামীর ভূমিকায় শংকর ভট্টাচার্যের অভিনয় বড়ো আড়ষ্ট লাগলো। তবুও নবীন গোষ্ঠীর তরুণতম অভিনেতা-অভিনেত্রী-দের কৃতিত্বে প্রযোজনাটি উজ্জ্বল।

শ্রোতা চক্রবর্তী

CENTRAL LIBRARY

Phone : 46-9519

M/s. KALI INDUSTRIES

13/1, N. N. GHOSH LANE,
TOLLYGUNGE, CALCUTTA-700,040

(Mechanical, Structural & Fabrication Engineering Works
on approved list with Railway & Govt. & Defence)

British Paints (India) Ltd.

CALCUTTA-700 071

CENTRAL LIBRARY

৭ বছর হীনযান ২ সংকলন
আশ্বিন, ১৩৮৯ সাহিত্য-সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা সেপ্টেম্বর, '৮২

আমরা আশা করি

★ লেখা-টেখা নয়, লেখা।

★ সুযোগসন্ধানী লিপিকার নয়, অনামী অভিজাত এবং আত্ম-সন্ধানী তারুণ্যের পাণ্ডুলিপি।

★ সমালোচকের নর্ম নয়, সমালোচনার ধর্ম।

★ অনুবাদের অনুবাদ নয়, অনুবাদ ও অনুসৃষ্টি।

★ বিদেশের আত্মা নয়, আত্মস্থ বিদেশ।

★ অসংখ্য পাঠক নয়, নির্মীয়মাণ গ্রাহক।

14 JAN 1983

হীনযান

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৩৩-ডি, শ্রীমোহন লেন, কলকাতা-৭০০ ০২৬ থেকে সুভাষ ঘোষাল কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রাফ সাপ্লাই কোম্পানী, কল-৬১ থেকে মুদ্রিত।
২·৫০

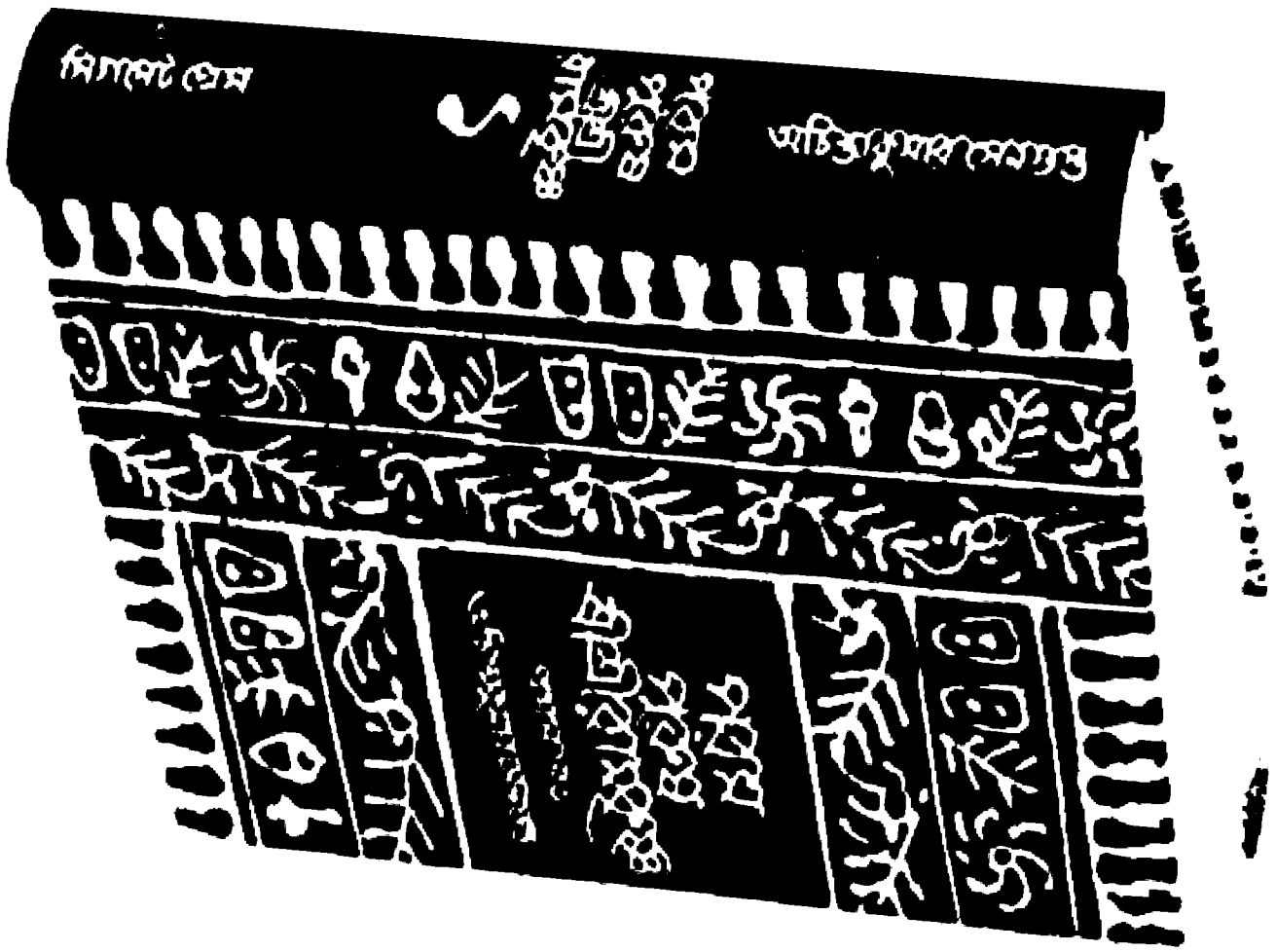

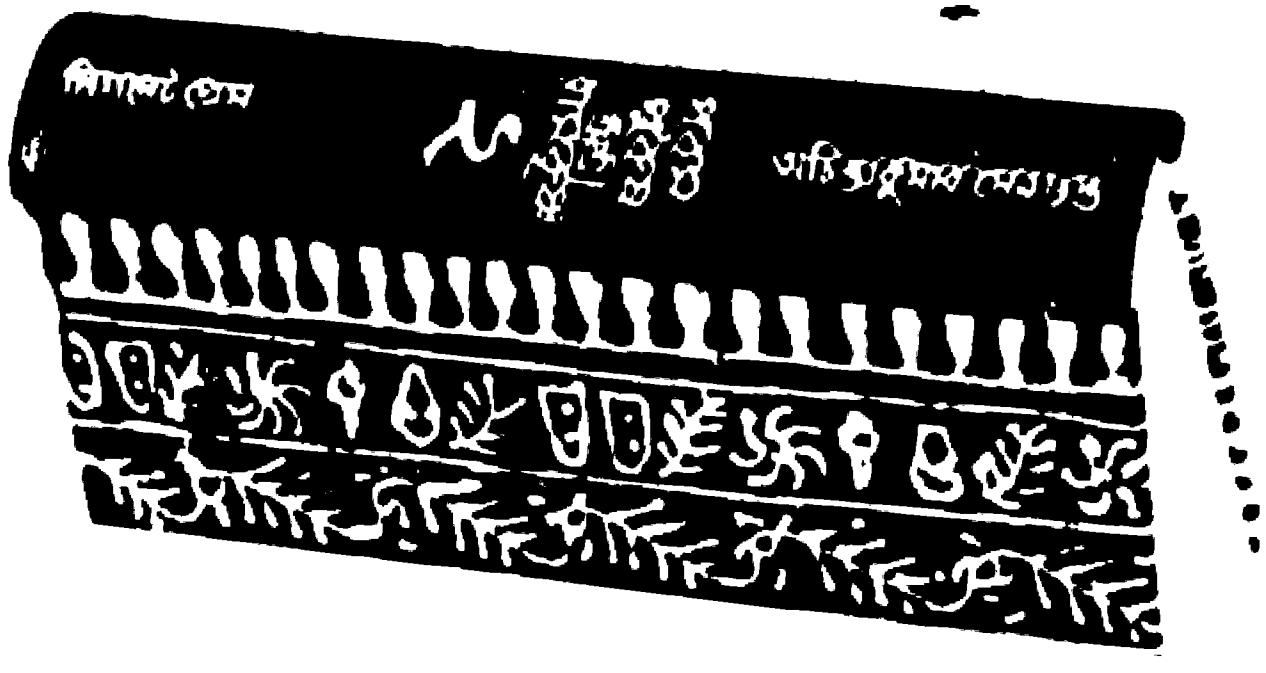

CENTRAL LIBRARY

বৈশাখ, ১৩৯০ **হীরামন** মে, ১৯৮৩

গল্প : ১ সংকলন

কবিতা : ১০ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সুভাষ ঘোষাল মুকুল চট্টোপাধ্যায় পতঙ্গকুমার মণ্ডল
৪৭ কবিকুল ইসলাম পার্থসারথি চৌধুরী

১ ডিকে-র প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র চিঠি

স্মৃতিচারণ : ৩৩ অজিতকৃষ্ণ বসু (অনুবা)

প্রবন্ধ ও সমালোচনা :
৫৯ 'বলাকা'-র ছন্দ-বৈচিত্র্য / অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়
৮৯ 'মহাভারত' / সুকুমারঞ্জন দাশ
৩১ নাস্তিকতার প্রতিবর্ধনী / স. ঘ.
৫১ বাংলা থিয়েটারের গান / অমিত মজুমদার
৫৬ প্রবাসের মনে স্মৃতি-মাটির চাপলেখ / নিলীনকুমার চক্রবর্তী
৯০ কবিতার পাঠকে / নিমাই ভাদুড়ী
৯৭ একই সময়ে চার চলচ্চিত্রকার / নিলীনকুমার চক্রবর্তী

সম্পাদনা : সুভাষ ঘোষাল
প্রচ্ছদ : সুনীল দাশ
প্রচ্ছদে দুটি ছবির অনুকরণ : সত্যজিৎ রায়

তিন টাকা

CENTRAL LIBRARY

মানসিক প্রশান্তি এবং বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা লাভ করুন

যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত ও স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আপনিও অবশ্যই মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন।

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ অঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন।

★

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯৩২

রেজিষ্টার্ড অফিস : "পিয়ারলেস ভবন"

৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯

মোট সম্পদ—৩২৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে

★ ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান ★

With compliments from :

★

DUNCANS AGRO INDUSTRIES LTD.

31, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA

Telephone : 22-6831

CENTRAL LIBRARY

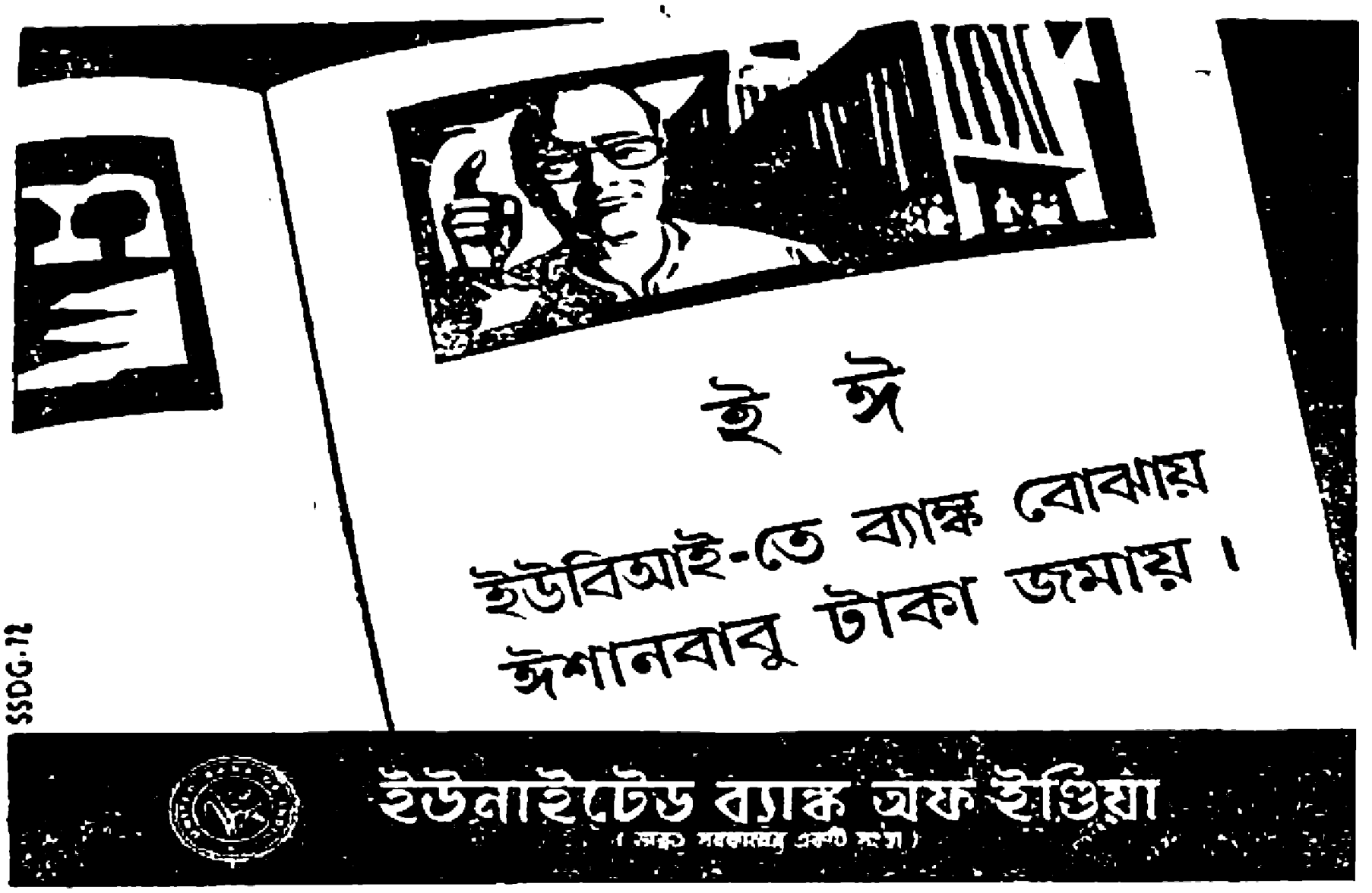

Phone : 46-951

M/s. KALI INDUSTRIES

13/1, N. N. GHOSH LANE,
TOLLYGUNGE, CALCUTTA-700040

(Mechanical, Structural & Fabrication Engineering Work
on approved list with Railway & Govt. Defence)

॥ সি. এম. ডি. এ কি কি করে ॥

মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ১ কোটি ৩ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

চলাচলের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ব্রীজ, ফ্লাই-ওভার, সাবওয়ে, বড় রাস্তা ইত্যাদি বানানো হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালানর্দমা খুঁড়ে জল-মগ্নতার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলীর ব্যবস্থা হচ্ছে।

তিনটি জায়গায় নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

এছাড়া সি. এম. ডি এ নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, বর্তমান স্কুলগুলির সংস্কার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, উদ্যান এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন দুগ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসানের কাজ কিছু কিছু করে থাকেন।

গত দশ বছরে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। সব কিছু জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসরি লিখুন জনসংযোগ বিভাগ, কালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ) ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস কলকাতা-১৭।

সম্পাদকীয়

পঁচিশের দিকে

'কল্লোল'-এর এক প্রধান সুরকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শেষপর্যন্ত সমস্ত কল্লোলের পারে যে-জ্যোতির্ময় দাঁড়িয়ে তাঁর কথা ভাবতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধিবাদী অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধি দিয়েই একদিন বুঝতে পেরেছিলেন—'Reason was the helper, reason is the bar'—শ্রীঅরবিন্দের এই বাক্যটি কতোটা অকাট্য। আর এই সচেতনতার ফলেই পাঠক একদিন লাভ করেছিলেন 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', যা বোধ হয় অচিন্ত্যকুমারের সবচেয়ে অভিনন্দিত সৃষ্টি। সিগনেটের প্রবাদপুরুষ দিলীপকুমার গুপ্তের কাছে লেখা অচিন্ত্যকুমারের পত্রগুচ্ছের দ্বারা শাণিত হয়ে উঠেছিলো বইটির প্রস্তুতিপর্ব। এতোদিন ধ'রে অপ্রকাশিত এই পত্রগুচ্ছ দিলীপ-কুমারের সহধর্মিণী নন্দিনী গুপ্তের অসামান্য ঔদার্যে এ-সংখ্যায় ছাপানোর সুযোগ পাওয়া গেলো। শ্রীমতী গুপ্তের কাছে 'হীনযান' কৃতজ্ঞ রইলো গভীরভাবে। এবারের প্রচ্ছদপটে ব্যবহৃত দুটি ব্লক বইটির প্রথম দুটি মুদ্রণের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হতো। ডি. কে. যেভাবে অচিন্ত্যকুমারের পত্রগুচ্ছ বিন্যস্ত করে রেখে গেছেন বর্তমান মুদ্রণে ঠিক সেই বিন্যাস আমরা রেখেছি। ফলে কালক্রম রক্ষিত হয়নি।

★ ★

বাংলা কবিতার মানচিত্রটিকে সমসাময়িক ক'রে তুলতে তুলনাহীন

পরিশ্রম ক'রে গেছে বিষ্ণু দে। মনে আছে, কলেজ-জীবনে শুনেছিলাম তাঁর কণ্ঠে সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখী'। সেই আবৃত্তি থেকেই এমন এক নিজস্ব দার্ঢ্য বেরিয়ে এসেছিলো যা একান্তভাবে আরোহীর। কিন্তু যাঁরা বলেন তাঁর কবিতায় অভিমান নেই, তাঁর কবিতা অনর্গল অভিযানের, তাঁদের সঙ্গে মিলতে পারি না। বরং তিনি তাঁর অভিযানগুলিকে এমন এক অভিমান দিয়ে বেষ্টিত ক'রে রেখেছিলেন যা দয়িতেরই সম্পদ। তাঁর বহু স্মরণীয় ছত্রকে পার ক'রে একটি ছত্রই এই মুহূর্তের প্রতিনিধি হয়ে বেজে উঠছে— "আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ" তিনি এমন একজন কবি যাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি চলে যাবার পরে তাঁর কবিতাই সার্থকভাবে বহন করবে।

অল্প দিনের ব্যবধানে আবু সয়ীদ আইয়ুবও তর্পণীয় হয়ে গেলেন। তিনিই তো বলতে পেরেছিলেন—"সত্য বহুরূপী, জৈন দার্শনিকদের পরিভাষায় সত্য অনেকান্ত। সাংবাদিক সত্য, ঐতিহাসিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, সত্যের এক-একটি অন্ত (aspect); সাহিত্য আর একটি অন্ত।" তাঁর মতো প্রস্তুত মানস বাংলাচর্চায় নিয়োজিত থাকার ফলে বাংলা প্রবন্ধের পরগণায় ঘটেছে নিসর্গবিস্তার। তাঁর মূল বিশ্বাসের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন হয়তো সবসময়েই সম্ভব হয় না; কিন্তু স্বীকার করি, যে স্বচ্ছ তেজে যে প্রসন্ন গতিতে তিনি রবীন্দ্র-ভূমিতে নেমেছিলেন তা স্বতন্ত্র। "মূলত ও সর্বোপরি প্রেমেরই কবি রবীন্দ্রনাথ"— তাঁর এই আবিষ্কার অবিরত রবীন্দ্রপ্রেম ছাড়া সম্ভব হতো না। তাঁর ক্ষেত্রেও সান্ত্বনার কথা, তিনি গত হলেও তাঁর রচনাকে স্বাগত জানাবেন পাঠক।

★ ★

দশদিক অস্থির হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধ'রে পত্রিকার মূল্য দু' টাকায় স্থির ছিলো। কেবলমাত্র গত সংখ্যায় পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি ঘটে। এ-সংখ্যায় আরো পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি ঘটিয়ে পত্রিকার

CENTRAL LIBRARY

সাধারণ সংখ্যার মূল্য এবার থেকে তিন টাকাই ধার্য হলো। পাঠক, আশা করি, বুঝবেন মূল্য বৃদ্ধি না ক'রে আমাদের আর উপায় থাকছে না। শুধু স্বদেশেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ ছোটকে বড় ক'রে দেখানোর যন্ত্রগুলি যখন পূর্ণ বেগে কাজ ক'রে চলেছে তখন অযান্ত্রিক লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন যিনি অনুভব করবেন, তিনিই প্রকৃত সাহিত্যপ্রণয়ী। তাঁদেরই সমর্থনে, জানিয়ে রাখি শেষে, 'হীনযান' পঁচিশতম সংখ্যার সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুক্তাঙ্গন

যে-কোন সাহিত্যপ্রণয়ীর কাছে বহু বছর ধ'রে রাসবিহারীর মোড় ও রমাপতি ভট্টাচার্য সমার্থক ছিলো। তাঁর পত্রিকার স্টলটিকে আলো ক'রে রমাপতিবাবু ব'সে থাকতেন।

লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের মূল্য সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন এই মানুষটির দেহান্ত ঘটায় আমরা, বি মূ ঢ়। 'হীনযান'-এর পক্ষ থেকে এই সজ্জনের আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ডিকের প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-

হীনযান

ওঁ

আসামসোল

১৩. ১. ৫২

দিলীপ,

জায়গায়-জায়গায় ঘুরে ঘুরে ইলেকশন করে বেড়াচ্ছি। বইয়ের কতদূর কি হল না হল কোনো খবর করতে পারছিনা।

১৬ ও ১৭ জানুয়ারি কলকাতা থাকব তখন একবার আমার বাসার ঠিকানায় জানিও কি হল না হল। আসানসোলে আবার ফিরতে হব ২১ তারিখ থেকে।

রেডিওর চেক এখনো আসেনি। ৬ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো Talk এর বন্দোবস্ত হবে কিনা জানিও।

সম্ভব হলে বাংলা তারিখযুক্ত একটা ইংরিজি ক্যালেণ্ডার পৌঁছে বা পাঠিয়ে দিও রেজেস্ট্রি ডাকে।

আশা করি সমস্ত কুশল।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

৫. ২. ৫২

রাত

দিলীপ,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার suggestionটা ভালো—

তিনটি কোটেশন পাঠালাম, তিনটিই ব্যবহার কোরো। তিনটিই বেশ লাগসই। বিবেকানন্দ থেকে অনেক উজ্জ্বল কোটেশন দেওয়া যায়, তবে বেশি জায়গা নেবে। সেগুলো পরবর্তী খণ্ডে ব্যবহার করা যাবে। সংস্কৃত শ্লোক দুটোতে যেন ছাপায় ভুল না থাকে। বরং প্রুফ পাঠিয়ে দিও পত্রপাঠ।

বই ঠিক দিনে বেরুবে জেনে ভালো লাগছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি,—আর মোটে দু সপ্তাহ বাকি।

তোমাকে যে 'পরিশিষ্ট' বা রেফারেন্স বইয়ের লিস্টি পাঠিয়েছি তা পেয়েছ আশা করি।

এবারের টুকরো কথায় 'পরম পুরুষ' সম্বন্ধে অন্যভাবে কিছু গেলে পারত।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

২৯. ১২. ৫১

দিলীপ,

আজ দৈনিক কাগজে পরমপুরুষের বিজ্ঞাপন দেখলাম। বেশ ভালো হয়েছে। সবাইর দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক এই প্রার্থনা।

এইসঙ্গে রেডিওর জন্যে অনুমতি-পত্র পাঠিয়ে দিলাম। যথাবিহিত ব্যবস্থা কোরো।

আমি আগামী রবিবার কলকাতায় যাচ্ছি। দিন আষ্টেক থাকব। প্রুফ এলে ভবানীপুরের বাসায় পাঠিয়ে দিও। "দেশে"ও

দাও আমার "পরমপুরুষের"। খুব ভাল হয়, যদি সব "দৈনিকে" কালপর্ভ'র মধ্যে বেরিয়ে যায়।

কি কর না কব জানাও।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

৬. ১১. ৫১

দিলীপ,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। প্রথম খণ্ডে ৪ টি পরিচ্ছেদই যেতে পারবে এতে ভালো লাগলো। তাহলে মোট কত পৃষ্ঠা বা কত ফর্মা হবে আন্দাজ করো? এবারের টাইপিংটা বেশ মানানসই হয়েছে। এটাই চালিয়ো।

পরিচ্ছেদের মাথায় সংখ্যাই দিয়ো যদি তাতেই ভালো খোলে। ভিন্ন পাতায় নতুন পরিচ্ছেদ শুরু করিয়ে কাজ নেই যদি matter যথেষ্ট আছে বলেই মনে করো। কিন্তু এক পরিচ্ছেদের শেষ ও অন্য পরিচ্ছেদের আরম্ভের মধ্যে ভদ্র ব্যবধান রাখতে হবে। যেন খুব ঘেঁসাঘেঁসি না হয়।

টাইটেল পেজের লে-আউটটা ভালোই লাগছে। একটা ভূমিকা অবশ্যই লিখে দিতে হবে। সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই লিখে পাঠাচ্ছি। ৪৬ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যাবে এর ভিত্তিতে ভূমিকা লিখতে হবে। ভূমিকা সংক্ষিপ্তই হবে মনে হচ্ছে। টাইটেল পেজের সঙ্গে ভূমিকা পরে ছেপে নিতে হবে। আগে আসল বই ধরো। প্রুফ কবে নাগাদ পাব?

ঠিক ছয়ুই ফাল্গুন যাতে বই বেরোয় সে ব্যবস্থা করা চাই।

লে আউটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

১৪. ২. ৫৭

দিলীপ,

"পরমপুরুষ"-এর এ বইটাতে প্রথম খণ্ড তার একটা স্পষ্ট নির্দেশ বইয়ে কোথাও থাকা দরকার। বইয়ের শেষ ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে কিনা জানিনা। যদি না হয়ে থাকে, সমাপ্তির জায়গায় "প্রথম খণ্ড সমাপ্ত" এই কথাটুকু বসিয়ে দিও। কিংবা, টাইটেলপেজ ছাপা না হলে টাইটেলপেজে কোথাও "প্রথম খণ্ড" উল্লেখ কোরো। বইয়েতে একান্তই সম্ভব না হলে বিজ্ঞাপনে প্রথম খণ্ড ঘোষণা করতে ভুলোনা। অন্তত এ বইই যে সম্পূর্ণ নয় এর একটা স্পষ্ট আভাস থাকা উচিত। ঠাকুরের ব্যাপারে কোথাও এতটুকু অপলাপের স্পর্শ যেন না থাকে।

বিজ্ঞাপনের কার্ডটা পেলাম। চমৎকার হয়েছে।

পত্রপাঠ নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্ড ছেড়ো।

1. Jitendra Kumar Sengupta
   5, Shyamananda Road, Bhawanipur, Cal-25
2. Dhirendranath Dasgupta
   14, Southern Avenue, Kalighat, Cal-26

3. D. L. Neogy
   14, Southern Avenue, Kalighat, Cal-26
4. Satindranath Chaudhury
   36V, Russa Road, Calcutta
5. Dr. Niranjan Chatterjee
   9, Mati Jheel
   Dumdum, (24 Parganas)
6. Dr. Parimal Sen
   C. M. O.
   Bilaspur C. P.)
7. B. N. Dasgupta
   45, Girish Chandra Bose Read, Calcutta-14.
8. Debtulya Mukherjee
   Pleader
   Asansol
9. Sj. Bankim Ch. Chatterjee
   9, Mati Jbeel
   Dumdum (24 Pgs.)
10. Samarendranath Bagchi
    Munsif
    Midnapur
11. J. K. Gupta Ray
    S. D. O.
    Midnapur

CENTRAL LIBRARY

হীনযান

12. S. C. Banerjee
S. D. O.
Dinbata
Coochbehar

ইতি
অচিন্ত্যমামা

ওঁ
আসানসোল
১৫. ২. ৫২

দিলীপ,

তোমাকে কাল এক চিঠি লিখেছি। আজও একটা লিখেছি খানিক আগে, পোষ্টকার্ডে।

মন বড় চঞ্চল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, প্রথম খণ্ড "পরম পুরুষ" অর্থাৎ যে বই সম্প্রতি ছাপছ সেই বইয়ে "প্রথম খণ্ড" কথাটির উল্লেখ ঘটেনি। বিজ্ঞাপনে "প্রথম খণ্ডের" ইঙ্গিত নেই, কিন্তু বইয়েও যদি না থাকে, তাহলে ঘোরতর অন্যায় হবে। অন্যায় আমার প্রতি, পাঠকসাধারণের প্রতি, আর যাঁর পুণ্যকাহিনী লিখছি তাঁর প্রতি। আশা করি এ অন্যায় ঘটেনি। যদি জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক এই অন্যায় ঘটে থাকে, তবে অবিলম্বে তার সংশোধন করতে হবে। নতুন করে টাইটেল-পেজ বা শেষ পৃষ্ঠা ছাপিয়ে নিতে হবে—যাতে "প্রথম খণ্ড" কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। এখুনিই যদি সংশোধনের উপায় না থাকে, তবে যতদিন না নতুন করে টাইটেল-পেজ বা শেষ পৃষ্ঠা ছাপিয়ে নিচ্ছ ততদিন "প্রথম খণ্ড" লেখা একটা স্লিপ দপ্তরির দোকান থেকে paste করিয়ে নিতে হবে।

আচ্ছা, আমি যে একটা reference এর লিস্টি পাঠিয়েছিলাম তা হুবহু ছাপা হয়েছে তো? তাতে আমি প্রথম খণ্ড কথাটি উল্লেখ করেছিলাম—সে কথাটায় হস্তক্ষেপ হয়নি তো?

দয়া করে পত্রপাঠ অবস্থাটা জানাও। আমার সন্দেহ যদি অমূলক হয়, তবে তো কথাই নেই—জয় প্রভু রামকৃষ্ণের।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

২৫. ১. ৭২

দিলীপ,

ভোটাভুটির ব্যাপারে নানা জায়গা ঘুরে এখানে এসে রোগশয্যা নিয়েছি। তোমার চিঠি পেলাম। রেডিওর চেক আগেই এসে গেছে।

বই যাতে ৬-ই ফাল্গুন ঠিক-ঠিক বেরোয় তার সব বিলি-ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা শৈথিল্য না হয়। খবর পেলাম চক্রবর্তী চ্যাটার্জীর বই বেরিয়ে গেছে। বইর নাম দিয়েছে "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার অমৃতবাণী"। এ নাম শুধু প্রচ্ছদপটে ও টাইটেল-পেজেই আছে, অন্যত্র নাম "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"ই। বইর চেহারা আমি দেখিনি—তুমি দেখো। কত দাম করেছে তাও জানিনা। ও-বইর সমালোচনা প্রসঙ্গে কাগজে যাতে নামচুক্তির কথাটা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয় তার ব্যবস্থা কোরো।

যাই হোক, ৬ই ফাল্গুন বা ১৯শে ফেব্রুয়ারি আমার বই বের করা চাইই। সেই অনুসারে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু কর এখন থেকে।

৬ই ফাল্গুন তারিখটা বাঙালী প্রতি গৃহস্থের ঘরে বিঘোষিত হোক। বইর প্রকাশ দীপ্ততর অর্থ পাক। এ তারিখটার সুযোগ তুমি হারাবেনা নিশ্চয়ই। বইর টাইটেল পেজেও প্রথম প্রকাশ—'৬ই ফাল্গুন' দিতে ভুলো না। রেডিওতে বক্তৃতার আর স্পৃহা নেই। যদি ঠিকমত বিজ্ঞাপন দিতে পারো ও বিজ্ঞাপন-অনুযায়ী বই ৬-ই বের করতে পারো, তা হলেই কাজ হবে।

বাড়তি প্রুফ (মানে, ডুপলিকেট সেট) পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাকি অংশের প্রুফ সত্বর পাঠিয়ে দিও। এক জায়গায় ছুটো জরুরি সংশোধন দরকার।

ভূমিকাটা কি কম্পোজ হয়েছে ? কভারই বা কতদূর ? সময় তো খুব কাছে এসে পড়ল !

চিঠি লিখো তাড়াতাড়ি।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

২০. ২. ৫২

দিলীপ,

তোমার চিঠি ও রেডিওর নিমন্ত্রণ পেলাম।

ঠাকুরের জন্মদিন সম্বন্ধে আমার অভিমত স্পষ্ট জবাব-দিহিও সরল। ঠাকুরের জন্মদিন ৬ই ফাল্গুনই ঠিক। সে দিনটি দ্বিতীয়া তিথি ছিল। এ বছরে সে তিথি ২৭শে ফেব্রুয়ারি পড়েছে। গত বছর অন্যদিন পড়েছিল, পরের বছর আরেকরকম দিন পড়বে।

প্রতিবছর যা বদলায় তাকে লোকে সহজে ধরবে কি করে? ঠাকুরের আবির্ভাবের এমন একটা স্থির তারিখ থাকা উচিত যা প্রতি বৎসর বাঙালীর ঘরে-ঘরে নির্ভুলভাবে পালিত হবে। এবছর ঠাকুরের জন্মতিথি ২৭. ২. ৫২ পড়লেও মুখ্য মিশন সেই আবির্ভাবের উৎসব করছেন ২রা মার্চ। (পাঁজি দেখ।) যে মিশনের যেমন সুবিধে সে তেমনি দিন উৎসব করছে। এ কি একটা ব্যবস্থা? তিথি যাই হোক, একটা বিশেষ স্থায়ী ও স্থির দিনও থাকা আবশ্যক। ঠাকুর সহজের পন্থী তাই তাঁর আবির্ভাবের দিনটিও সভ্য ও সহজ করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন কবে? একই স্থির পঁচিশে বৈশাখ। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন কবে? একই স্থির ২রা অক্টোবর। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন কবে? একই স্থির ১৫ই আগষ্ট। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন কবে? একই স্থির ২৩শে জানুয়ারি। বছর-বছর এ তারিখের কি বদল হয়? ঠাকুর সম্বন্ধে কি একটাও অপরিবর্তনীয় তারিখ থাকবেনা বাঙালীর ঘরে-ঘরে?

যদি ঠাকুরের জন্মদিন বলে কোনো একটা দিন ছুটি দিতে হয় তবে কি একটি নির্দিষ্ট দিন খুঁজে পাওয়া যাবেনা? ই ফাল্গুনই কি সে দিন নয়? সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর মনে-জ্ঞানে কি একটি বিশেষ স্থির দিন চিহ্নিত থাকবেনা?

আমার মনে হয় আমার যুক্তি অখণ্ডনীয়। ভাবের দিক থেকে তো বটেই, সত্যের দিক থেকেও। অন্তত এ যুক্তিতে প্রচুর শক্তি যে আছে তা অনস্বীকার্য। আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধ করবার জন্য তিথি দরকার, কিন্তু স্মরণ মনন চিন্তন অনুধ্যানের জন্য ঐ প্রথম ও নির্দিষ্ট ৬ই ফাল্গুনই প্রশস্ত। ঐটিই জীবের জগতে ঠাকুরের আসল জন্মদিন। তোমাদের পরিশ্রম গভীর ফলপ্রসূ হবে।

যদি বলো তো এই নিয়ে কাগজে লিখি। Controversy হয়তো হবে, কিন্তু আমার মতটা সাধারণ্যে প্রচার হওয়া দরকার।

রেডিও টক দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। ছুটি ও permission এর দরখাস্ত করে দিলাম। ঠাকুরের দয়ায় ছুটিটা পাই তবেই হয়। যদি কোনো বাধা জোটে, বিচলিত হয়ো না। ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন।

"প্রথম খণ্ডের" জন্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম বলে ক্ষমা চাচ্ছি। ওটা আর কারু সন্দেহের ছায়াপাত। সেজন্যে অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত আছি।

সর্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকো। ঠাকুরের প্রসাদ অকৃপণ, অফুরন্ত। তোমাদের কুশল চাই ইতি।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

৮. ৩. ৫২

দিলীপ,

এ সপ্তাহের "দেশ" দেখলাম। দেশ নয় যেন দ্বেষ! মণিলালের বইয়ের সমালোচনাটি কার লেখা? স্বয়ং সম্পাদকের, না, যারা তোমাকে সেদিন "বাড়াবাড়ি হচ্ছে" বলেছিল তাদের কারুর? মণিলালের ঐ লেখা যে সতেরো বছর আগে বসুমতীর "শতবার্ষিকী" বিশেষ সংখ্যায় বেরিয়েছিল তা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু তখন যে তার নাম ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যপ্রকাশ", "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" নয়—সেই সত্যটুকু গোপন করা হয়েছে। সতেরো বছরের আগের লেখা ঠিক এই সময়টিতেই বেরিয়েছে তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

হীনযান

নাম-পরিবর্তন কেন হল এই প্রশ্নটুকু "দেশ" সম্পাদককে করা চলে। যদি সঙ্গত মনে কর এ সম্বন্ধে সম্পাদককে একটা চিঠি পাঠাও।

প্রাণতোষের কাছ থেকে ঐ "শতবার্ষিকী" সংখ্যাটা চেয়ে বা কিনে সংগ্রহ করো। ও যদি না দেয় অন্য কোথা থেকে ওটা সংগ্রহ করা দরকার। ওই ডকুমেণ্টটা হাতে রাখতে হবে।

আমি কাল "চিত্তরঞ্জনে" যাচ্ছি ঠাকুর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে, পশু আমার বক্তৃতা হবে "কুলটিতে"।

এখন তোমাকে আরেকটা কথা লিখছি। টাকার কথা।

"পরমপুরুষ" ছাপতে দেবার আগে তোমার কাছে advance চেয়েছিলাম। তুমি তখন বলেছিলে বই বেরুলে পর দিতে পারো। এখন আমার অনুরোধ কিছু মোটারকম আমাকে দাও—আমার রয়্যালটির প্রাপ্যমধ্যে। আশা করি এতে তোমার কোনো অসুবিধে হবেনা। বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুবার আগেই প্রথম সংস্করণের রয়্যালটি মিটিয়ে দেবে। মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বোলোনা—অন্তত "পরমপুরুষ" সম্পর্কে। অন্যান্য বইয়ের হিসেব যথারীতি মে-তেই দিও।

তোমার চিঠি ও চেকের জন্যে প্রতীক্ষা করব ইতি।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

১৮. ৩. ৫২

রাত

দিলীপ,

তোমার চিঠি ও চেক পেয়ে খুশি হলাম।

টাকা চেয়েছি বলে, মনে হচ্ছে, তুমি বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু এ বিরক্তির পিছনে, ভেবে দেখো, আদৌ কোনো যুক্তি নেই। তোমার বিজ্ঞাপনের কথা-মতো "৫০০০ কপি নিঃশেষিত,"—আর এই ৫০০০ হাজারের জন্যেই প্রথম সংস্করণ। সুতরাং প্রথম সংস্করণ "নিঃশেষিত" হয়ে যাবার পর গ্রন্থকার যদি তার প্রথম সংস্করণের দরুন প্রাপ্য রয়্যালটি চায়, তাহলে কি সেটাকে টাকার জন্যে "অকারণ অস্থিরতা" বলবে? সে দাবিটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত—হাটের শেষে বিক্রির মুনাফা নিয়ে বাড়ি ফেরার মত। বই যত তাড়াতাড়ি কাটে গ্রন্থকারও তত তাড়াতাড়িই তার পাওনার হকদার হয়। এই "অস্থিরতাটা" অকারণ বা অন্যায্য হবে কেন? আমার তো মনে হয় দ্বিতীয় সংস্করণ বাজারে বেরুবার আগে নিঃশেষিত প্রথম সংস্করণের হিসেব সম্পূর্ণভাবে চুকিয়ে দেয়াই সমীচীন হবে।

বইয়ের প্রকাশ ও প্রচারের জন্যে তোমরা যা করেছ তার তুলনা নেই। অকুণ্ঠ অকার্পণ্যের সঙ্গে অর্থব্যয় করেছ। তার দ্রুত ফল যেমন আছে, সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাও অফুরন্ত। তাই প্রথম সংস্করণে একটু কষ্ট হলেও পরবর্তী সংস্করণে আর ক্লেশ থাকবেনা। এখন একটু পাখা চালিয়ে যাও। পরে আপনা হতেই বইবে মলয় হাওয়া।

তুমি যে প্রবন্ধ লিখতে বলেছ তা আমার হাতে কেমন হবে বুঝতে পারছিনা। তাছাড়া, প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে, প্রথম খণ্ডের উপরই আলোচনা থাকা উচিত। যেসব ঐতিহাসিক চরিত্র পরে আসবে তা এখুনি এসে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে প্রবন্ধ লেখা ভালো দেখাবেনা। সবগুলি খণ্ড বেরিয়ে গেলেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা সঙ্গত হবে। বইয়ের বিজ্ঞাপনে

এমন একটা ভাব থেকে যাচ্ছে যেন গোটা বই-ই বেরিয়ে গেছে—তার প্রথম খণ্ড শুধু নয়—এতে অজ্ঞ পাঠক বিভ্রান্ত হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, মাসিক বসুমতীতে লেখা বন্ধ হয়ে গেল নাকি, কিস্তি শেষ হবার আগেই কি গোটা বই বেরিয়ে গেল? আমার মনে হয় "প্রথম খণ্ডই শুধু বেরিয়েছে"—বিজ্ঞাপনে এ ইঙ্গিতটা, অন্তত সত্যের খাতিরে, থাকা উচিত। "সমস্ত বিখ্যাত বাঙালিকে একত্রিত করা হয়েছে এ গ্রন্থে"—মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর এ কথা কি বলা চলে? আমার মনে হয়, প্রকৃত তথ্যেও এতটুকু চ্যুতি যেন কোথাও না ঘটে আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখা দরকার।

রবীন্দ্রপুরস্কার পাবে এ ভরসা আমার নেই। যদিও শুধু নীহার রায়ের নজিরে এ বইয়েরও পাওয়া উচিত। তবে নানারকম কল-কাঠি থাকলে এ নিদ্রিত পুরীর দ্বারোন্মোচন অসম্ভব।

তোমাদের কাছে টাকা চেয়ে তোমাদের সাধুতার উপর সংশয়-কটাক্ষ করেছি এ মনে কোরো না। রাশি-রাশি বই বিক্রি করার যে অদ্ভুত রোমাঞ্চ তোমরা পেয়েছ তারই একটু স্বাদ নেবার জন্যেই এই প্রার্থনা। আশা করি বাকি টাকাটা অত্যল্প কালের মধ্যেই পাঠিয়ে দিতে পারবে।

আশা করি সমস্ত কুশল। চিঠি লিখো ইতি।

অচিন্ত্যমামা

পুনশ্চঃ নামাবলীর বুশ-শার্টই হোক বা ফ্রক-কোটই হোক, এ বই ঠাকুরের ইচ্ছায় প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে ঠাঁই পাবে এতে সন্দেহ নেই। "নামাবলীর বুশ-শার্টে" রসিকতাটা কোথায়?.....অ

হীনযান

ওঁ

মেদিনীপুর

২২. ৪. ৫২

দিলীপ,

নানা হুজ্জুতে পড়ে ঘোরাঘুরি করে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এখনো অন্ন পথ্য হয়নি অনেক বকেয়া কাজ সারতে বাকি : তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা রচনার সময় পাব এমন ভরসা করিনা। সুতরাং নির্ঘন্ট থেকে আমার নাম নাকচ করে দিও।

"পরমপুরুষের" কথা বলো। তৃতীয় মুদ্রণ কবে পর্যন্ত বেরুবে ঠাহর করছ? মাস্তুল কি দেখা যাচ্ছে? না, কি মাস্তুলের মাথার পাখিটিই দেখতে পাচ্ছ?

গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সে দেখি একেবারে খড়্গহস্ত। সে বলে সিগনেট প্রেস বেশি বই নিয়ে আবার অন্য দোকানে বিলি করে মুনাফা মারে। আমি বলেছি আমার বই সম্বন্ধে সিগনেটকে একটু সুবিধে দিতে হবে, কেননা ওরাই ভালো বেচনদার, আর ওরা ভালো বেচলেই আমার বইয়ের দ্রুত সংস্করণের সম্ভাবনা। কিন্তু আমার পরামর্শ সে শুনবে এমন প্রত্যয় আমার নেই। আমরা সাবধান হতে পারি মাত্র, সংশোধন করি কি করে?

তাড়াহুড়োয় "পরমপুরুষের" ফোল্ডার খুঁজে পাচ্ছিনা। দয়া করে আরেক কপি পাঠিয়ে দিও।

আশা করি সমস্ত কুশল ইতি।

অচিন্ত্যমামা

হীনযান

ওঁ

মেদিনীপুর

২২. ৫. ৫২

দিলীপ,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম. তৃতীয় মুদ্রণ থেকে খান তিনেক বই পাঠিয়ে দিও।

দু মাসে তিন মুদ্রণের বিজ্ঞাপনের মধ্যে কত কপি বিক্রি হল সেটার উল্লেখই বেশি দরকারী। কেননা এ যে বাজারের এক হাজারী বা পাঁচ-শতী সংস্করণ নয়, সেটা যেন না লোকে ভুল করে।

তৃতীয় মুদ্রণ যখন বেরিয়ে গেছে তখন দ্বিতীয় মুদ্রণ বাবদ সম্পূর্ণ হিসেব চুকিয়ে দিও। সঙ্গে অন্যান্য বইয়ের হিসেব। এখন এরই জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকব। চিন্তামণিই চিনি জোগাবেন। শুভ মে মাস যেন না কাবার হয়।

আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা অভিনব বই লিখছি। এ সম্বন্ধে তোমার সাহায্য আশা করতে পারি?

মেদিনীপুরে কাজকর্ম অনেক বেশি, তবু মনে হচ্ছে, ঠাকুরের কৃপায় এখানে বোধ হয় বেশি লেখা সম্ভব হবে। আকাশে-বাতাসে একটা সৃষ্টির সুর বাজছে

সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি ইতি।

অচিন্ত্যমামা

হীনযান

ওঁ

মেদিনীপুর

১৮. ৬. ৫৩

দিলীপ,

রাজাপাট তুলে দিচ্ছি এখান থেকে। আগামী শনিবার অর্থাৎ পশু কলকাতায় গিয়ে উঠছি। ডেরা কোথায় মেলাবেন ঠাকুর জানেন।

রবিবার অর্থাৎ ২১।৬ তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। চেক তখন নেব. যতদূর সম্ভব স্ফীতকায় করবার চেষ্টা কোরো।

মফস্বল থেকে বহুবৎসর পর আবার রাজধানী। নতুন কোন কাজের আয়োজন হবে কে জানে।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

মেদিনীপুর

১৫. ৪. ৫৯

দিলীপ,

কাল রাত্রে ফিরেছি।

"পরমপুরুষ" প্রথম খণ্ডে আরেকটি সংশোধন দরকার। সেটি নোট করে নাও।

৩০ পৃষ্ঠায়—শেষ লাইনের এক লাইন আগে, অর্থাৎ ৩৬ লাইনে :

হীনযান

...“শূদ্রাণী” কেটে “অব্রাহ্মণী” বসাবে, ও “শূদ্রাণীর” কেটে “অব্রাহ্মণীর” বসাবে।

তা হলে ৩৬ লাইন দাঁড়াবে এইরকম :
“না, নেই। তুমি রানি হলে কি হবে, তুমি অব্রাহ্মণী। অব্রাহ্মণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার।”

সংশোধনটি ঠিকমত হল কিনা জানাবে।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

মেদিনীপুর

১. ৪. ৫৩

দিলীপ,

বিশ্ববিদ্যালয় “কবি শ্রীরামকৃষ্ণ” ছাপবার অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে বইটি বের করে দেওয়াই সমীচীন হবে। কাগজ জোগাড় করো।

১৪।৪ দশটা-এগারোটা নাগাদ তোমাদের বাড়ি যাবো। কটা বই জোগাড় রেখো

রবীন্দ্রনাথের “সঞ্চয়িতা”
“মানুষের ধর্ম”
“নবীন”
আর
“বসন্ত”

২০

কালীপ্রসন্ন সিংহের—"হুতোম প্যাঁচার নক্সা"
প্যারীচরণের—"আলালের ঘরে দুলাল"।

প্রথম কথনা "কল্লোলযুগ ও রবীন্দ্রনাথ" সম্পর্কে লাগবে। শেষের দুখানা "শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্পর্কে।

অচিন্ত্যমামা

ও

আসানসোল

১৫. ২. ৫২

দিলীপ,

পত্রপাঠ জানাও প্রথম খণ্ড "পরমপুরুষে" প্রথম খণ্ড এই কথাটি কোথাও উল্লেখ করেছ কিনা। যদি না করে থাকো, অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করো। নতুন করে টাইটেল-পেজ ছাপিয়ে নাও। কিংবা "প্রথম খণ্ড" কথাটা টুকরো করে ছেপে (যতদিন না নতুন টাইটেল-পেজ ছাপা হয়) দপ্তরিকে দিয়ে paste করিয়ে নাও। "প্রথম খণ্ড" উল্লেখ না থাকলে বড়ই অন্যায় হবে। দ্রুত চিঠি চাই।

অচিন্ত্যমামা

ওঁ

আসানসোল

২১. ২. ৫২

দিলীপ,

তোমার তার ও খামের চিঠি পেলাম। বেশ তো,

কাগজওলারা যদি ২৭।২ ই ঠাকুরের আসল জন্মদিন মানে, তবে সেই দিনের কাগজেই আমার বইয়ের সম্বন্ধে কিছু লিখুক না। স্থায়ী ও স্থির জন্মদিন ৬ই ফাল্গুনই—বইয়ে ঐ তারিখের উল্লেখটাই সবদিক থেকে শুভ হয়েছে।

রেডিওর permission পাওয়া নিয়েই একটু সময়ের প্রশ্ন। খুব চেষ্টা করছি। প্রার্থনা করছি ঠাকুরের ইচ্ছেয় সব হয়ে যাক।

কুশল চাই।

অচিন্ত্যমামা

CENTRAL LIBRARY

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

দুটি কবিতা

অছিলা

শিলা তার আসলে অছিলা।
দেবতার যন্ত্র নিতে গিয়ে
সে আগে নিয়েছে তার
নিজের লোলুপ যন্ত্র,
বোকা ঈশ্বরকে সে
ঠায় পথে বসিয়েছে
যেভাবে ভিক্ষুক বসে
টুং টাং শব্দ হয়—কনিষ্ঠ মুদ্রায় জমে
মানুষের করুণার কণা।

মানুষ এখনো বড় প্রাচীন পাথর ভালবাসে
ভয় পায় পাথরের দেবতাপদ্ধতি,
জানু নত হয়, স্বল্পবয়সিনীদের
আভূমি ধনুক দেহ আর
স্ফীত কিছু মাংসল উন্নতি দেখে মৌন মজা লাগে।
হে জীবন, এভাবে কি ডাকলেই আকাশও উপুড় হবে
যখন তখন!
না হ'লে এখনো দুঃখ এতো নীল কেন
কেন শিলার অছিলা দিয়ে
ডেকে আনা সময়ের দৈব সমর্থন?
ঘুমন্ত পাথর নিংড়ে
বারবার আদায় করা বিশ্বাসের নোংরা ভাত ডাল।

এখনো

এখনো কি দেয়াল লিখনে তুমি বিপ্লব ফোটাবে ?
দেশোদ্ধার খুব সোজা অঙ্কের দেয়ালে লিখে নিজের রটনা।
এই শতকরা চুয়াত্তর নিরক্ষরের দেশেও বলা যাবে
অন্তিমে আমিই ভালো, বাকি যারা—কালো প্রবঞ্চনা।

দূরের পাখিটি এসে বসে ওই দেয়ালেরই ওপরে
টইটম্বুর নীল ভরা ডানা থেকে
তার কিছু অপার্থিব আজো ঝরে পড়ে,
পাখিদের কোনো বিশেষ স্বদেশ নেই
ইনক্লাব জিন্দাবাদ নেতাবদল নেই
তারা গাছ চেনে, মানুষ চেনেনা, তারা খুশির প্রাঞ্জল
রৌদ্রে ঐসব রোগা, খল,
অক্ষরকংকাল ছেড়ে ফের উড়ে যায়
কেবল হাভাতে রাজনীতিই থাকে দেয়ালের কাছাকাছি ; হায়
যে দেয়ালের ভিতর চরিত্র তার নিজের সংসার গড়ে তোলে
সে দেয়ালেরই বাইরে বিপ্লব ভুল বানানের অপটু কৌশলে
গড়ে তোলে.ছন্ন ছোট বাসী হিংসা।

হায় দেশ—স্বদেশবাসনা
তোমাকে দেয়াল থেকে বারবার মুছেও ঠিক বোঝানো গেলোনা ॥

CENTRAL LIBRARY

সুভাষ ঘোষাল

রাতের ওপর দিয়ে

শীতের রাত এ'থেন্সের রাত।

পথের অন্তর্গত হয়েছে বরফ
বরফের অন্তর্গত হয়েছে পথ।
পা নিঃস্ব ক'রে
পথের ওপর দিয়ে
বরফের ওপর দিয়ে
এবং রাতের ওপর দিয়ে
হেঁটে যাচ্ছেন সক্রেটিস।

আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না।
তবুও আড়াই হাজার বছর বাদে
টেবিলে হাত রেখে
টেবিলের তলায় পা রেখে
রাত্রিকে একমাত্র প্রণিধানরূপে রেখে
দেখি বিষ ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে।

সেই মৌন সত্যজিৎও

আমরা এসেছি একটি চিতার চত্বরে
এ-সব জানে না কোন সার্থক মানুষ

হীনযান

দৈবাৎ যদি রাণী বল্লম ধরে
তবে চারিদিকে সেই নিতোর রূপ।

কিছু কূল ধ'রে কিছু ভুল ক'রে এসেছি
বলা দরকার পোষাকে নেমেছে ক্ষয়
এবারেও যদি বিচার্য হয় স্ত্রী
নগ্নের পাশে নগ্ন কি বড়ো নয় ?

চিতার জমিতে আছি বলে চিত্রিত
আমাদের সেই মৌন সত্যজিৎও
তার গন্ধেই বলে ফেলি জোর দিয়ে
আগুনের পাশে আজও সম্ভব বিয়ে।

দৈবাৎ

গোধূলিতে আমি কি করি তোমাকে নিয়ে
শব্দ কি জানে এতোখানি সন্ন্যাস
কল্পনা বহে পরিচিত পথ দিয়ে
মলয় বাতাসে কেঁপে ওঠে বটগাছ।

যেখানে ঘোড়ারা প্রত্যেকে প্রতিহাবী
অরুণ ছুঁয়েছে অন্তত অর্গান
সেখানে বিত্ত নিবিড় বাস্তবই
ডুব দিয়ে ওঠে এক নীলময়ী নান।

খেত খুঁজে পাই, খেতে নেমে গেছে বাজনা
বাজনা নেমেছে যেন সে নিথর শুক্র

ডানা খুঁজে পাই, ডানায় মিশেছে ডানা
পূর্ণ হয়েছে পূর্ণেরই কোন টুকরো।

শুধু কি সূর্য শতকও অস্ত যাবে
মন কি জেনেছে, জেনেছে কি কুবিকাজ
কতোদূর যাওয়া যেতে পারে এইভাবে
যখন তোমাকে পেয়ে গেছি দৈবাৎ ?

রেখাচিত্র

কেউ কেউ ছিলো পান্থ
বুড়োরা খেলতো তাস
কোন এক সম্ভ্রান্ত
ছেড়ে দিতো রাজহাঁস।
স্বেচ্ছায় কিছু দাস
গলায় পরতো ফাঁস
তাদের আত্মোপাস্ত
যারা জানিবার জানতো।
সৈন্যের সন্ন্যাস
গোধূলি তখন আনতো
একটি শান্ত নার্স
আমাকে কেবল ভাঙতো।

CENTRAL LIBRARY

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

অবসান

পিঁপড়ে লেগেছে ছাখো সারা গায়ে। ভালবাসতাম তাই
তোমার আমার সারা গায়ে আজ পিঁপড়ে লেগেছে।

একদিন পাড়ার ছেলেরা তোমার পিছনে
আমাকেও ছাখাতো আঙুল।

ভালোবাসতাম কত লোক লেগেছে একদিন
ভালো বেসে পথ হ'ল আমাদের। আমাদের দিকে
শুধু অজস্র আঙুল। ভালোবাসতাম তাই আমাদের
আঙুল ছিলনা। ভালোবাসতাম তাই আমাদের ভাষা ছিলনা।

এখন, চারজন লোক আসার আগে এসো আমরা
পিঁপড়ে বেছে ফেলি

যাব ব'লে

যাব ব'লে এই একটি জানা পথে বারবার ভুল
থুকুও ঘুমিয়েছে, মাথা নিচু তুমিও দাঁড়িয়ে আছো
যাব ব'লে কখন এসেছি সেই সকাল বেলায়
ভাগিস জাগিয়ে দিয়েছ গুছিয়ে দিয়েছো সব!

কি নিপুণ শিল্প তোমাদের কত ভুল সংগ্রহ করেছ
দাও তবে এ শরীর সাজিয়েগুছিয়ে নিই
কতকাল ঝাড়ামোছা হয়নি লোলচর্ম দেহটার
ভাগ্যিস জাগিয়ে দিয়েছ, গুছিয়ে দিয়েছো সব !

পঙ্কজ কুমার মণ্ডল

পাখিটা

ডানা ঝেড়ে পাখিটা উড়ে গেল, দেখা গেল না।
এখনো অন্ধকার, বাসায় কি বাচ্চারা ঘুমিয়ে ?
ঘুড়ির সুতো পাড়তে দুষ্টু বালক মগ্‌ডালে খুঁজে পেল
তিনটি শাবক, ঘুড়ি পেল না।

জলবনে নেচে নেচে পাখিটা সুখে ভরছে দানা
লাল সূর্য ডুবছে, তার পাশ দিয়ে উড়ে এলো
লাল কাটা ঘুড়ি
সুতোয় বিঁধে সুন্দর পালক।

পাখিটা বাসায় উড়ে এলো সেই পালক মুখে,
ছাখে—
ডালে ডালে পালকের উৎসব, ঝুলে আছে তিনটি মুখ
ওর মুখের দানা ধূলোয় ছড়িয়ে যায়।

CENTRAL LIBRARY

হীনযান

প্রকাশকের সবিনয় নিবেদন

পত্রিকার আগামী সংখ্যাই তার ২৫-তম সংখ্যা। প্রচলিত অর্থে ওই সংখ্যাতেই 'হীনযান' তার রজত জয়ন্তীতে পৌঁছোবে।

সংখ্যাটিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হচ্ছে। সানন্দে জানানো হচ্ছে, প্রথম পর্বে থাকবে দিলীপকুমার গুপ্তকে জওহরলাল নেহরুর Discovery of India-সংক্রান্ত একগুচ্ছ চিঠি। লোকচক্ষুর অন্তরালে এতোদিন ধ'রে অপেক্ষা করছিলো এই পত্রগুচ্ছ। শ্রীমতী নন্দিনী গুপ্তের অদ্ভুত সৌজন্যে 'হীনযান' শেষপর্যন্ত পত্র-গুচ্ছ প্রকাশের অধিকার পেয়েছে। এই পত্রগুচ্ছের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠককে নতুন ক'রে আর বলার কিছু নেই। দ্বিতীয় পর্বে থাকবে অতীতের 'হীনযান' থেকে কিছু উজ্জ্বল পৃষ্ঠার পুনর্মুদ্রণ। উপরন্তু, এ-যাবৎ প্রকাশিত বিষয়ের পূর্ণ তালিকা।

সংখ্যাটির মূল্য হবে ছ' টাকা। প্রধান দুই পরিবেশক :

সিগনেট ও পাতিরাম বুকস্টল।

শান্তা দেবীর প্রদর্শনী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কন্যা শান্তা দেবীকে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের সাহচর্য পাবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে শান্তা দেবী হয়ে উঠেছিলেন শিল্পী। পুরোনো দিনের বিখ্যাত লেখিকা শান্তা দেবী সম্পর্কে এই তথ্য তাঁর বিড়লা একাডেমির প্রদর্শনী না দেখলে জানতে পারতাম না।

ড্রইংগুলির মধ্যে এক নম্বর ছবি 'অর্জুন'। অর্জুনের মুখ কোন বীরত্বে রাঙানো নয়, কেমন যেন অন্যমনস্কতায় ঘেরা। তার ধনুকের ছিলার একটা প্রান্ত বাঁধা নেই এবং সেই খুলে যাওয়া প্রান্তটি হাতে ধরা। দেখে মনে হয় অর্জুন যেন বিষাদযোগে আচ্ছন্ন। জলরংয়ের সতেরো নম্বর ছবির নামও 'অর্জুন'। এই অর্জুনও ড্রয়িংয়ের অর্জুনের নিখুঁত প্রতিরূপ। ড্রয়িংয়ের তৃতীয় নম্বর ছবি 'The Girl'-এ যে মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে তার নারীত্বের মধ্যে এসে গেছে একটা অদ্ভুত যোগিনীব্যক্তিত্ব। মনে হয় ড্রয়িং পর্যায়ের এই ছবিটি শক্তিমত্তায় শ্রেষ্ঠ। শান্তা দেবীর ড্রয়িংয়ে অবনীন্দ্রনাথ মাথায় টুপি নিয়ে, চারুবাক নেত্র এবং খাড়া নাক নিয়ে এমনভাবে এসেছেন যেন মনে হয় কোন সাত্ত্বিক অশ্বারোহী দিগন্ত দেখে নিচ্ছেন। আর ড্রয়িং পর্বের দুটি সৃষ্টির কথা বিশেষভাবে বলা দরকার—'Kashmiri Man' ও 'দিদিমণি'। কাশ্মিরী পুরুষের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক বৈষ্ণবীয় স্বচ্ছতা ও দিদিমণির মধ্যে প্রখর ছেলেমানুষী। জলরংয়ের 'অজন্তা' বা 'কোজাগরী

পুর্ণিমা' লীলাকমলের মতো প্রাণবন্ত। বলা বাহুল্য, শান্তা দেবীর প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ক'রে উদ্যোক্তারা দর্শকের সামনে এমন একটি জানালা খুলে দিয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়,— অনাবিল, প্রাঞ্জল ও অন্যমনস্ক এক ভূখণ্ড সমর্পিত হয়ে শান্ত হয়ে আছে।

স. ঘ.

স্মৃতিচারণ

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

॥ সাত ॥

বলাইদা (ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক 'বনফুল') ২৪. ১১. ৭৭ তারিখে আমাকে তাঁর কলকাতা লেক টাউনের ভবন থেকে চিঠি লিখেছিলেন :

"ভাই অজিত, তোমার চিঠি পেলাম। তোমার গানের রেকর্ড আমার সত্যি ভালো লেগেছিল। আদিম মানব মানবী আকাশের দিকে মুখ তুলে যখন গান গেয়েছিল, তখন তবলা ছিল না। বাগ্‌যন্ত্র ছাড়া আর কোনও যন্ত্রই ছিল না তখন। তারা হাততালি দিত, নৃত্য করত এবং সর্বাঙ্গ দুলিয়ে নিজের আনন্দ প্রকাশ করত। বাজনা অনেক পরে এসেছে। ডুগি তবলা গানের ভূষণ, গানের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। আমার অনেক সময় মনে হয় বাজনার আধিক্যে গানের সুন্দর রূপটি অনেক সময় ঢাকা পড়ে। দোয়েল, শামা বা ভরত (Nightingale) পাখীরা যখন গান গায়, তখন কোনও বাঁয়া তবলা থাকে না তার সঙ্গে। সব শিল্পই হচ্ছে চিরসুন্দরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। তোমার যা ভালো লাগে, যেমনভাবে করলে ভালো লাগে তেমনি কোরো।

তোমার যখন খুশী চলে এসো। আমি নিজেকে নিয়েই থাকি। বাইরে থেকে কেউ এলে ভালো লাগে।

আমার স্নেহাশিস গ্রহণ করো। 'লী' পেলে পোড়ো। পূজো সংখ্যা উল্টোরথে বেরিয়েছে। কেমন হয়েছে, অর্থাৎ রসোত্তীর্ণ হল কিনা জানিও। কোথাও যদি সুর কেটে গিয়ে থাকে, তাও জানাতে দ্বিধা কোরো না। ইতি

শুভার্থী বলাইদা।"

এটি আমাকে লেখা বলাইদার সর্বশেষ চিঠি। তার আগে ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৭ শুক্রবার সকাল দশটায় টেপরেকর্ডার নিয়ে লেকটাউনে বলাইদার ভবনে গিয়েছিলাম। সেদিন তিনি তাঁর রচিত দুটি কবিতা পাঠ করেছিলেন, আমি তা রেকর্ড করে এনেছিলাম। প্রথম কবিতাটির নাম '৯ই ভাদ্র' "এটি আমার বন্ধু সজনীকান্তর মৃত্যুর পর তার জন্মদিনে লিখেছিলাম" বলে তিনি ধীর গতিতে, থেমে থেমে পড়েছিলেন :

"একটি তারিখ, এবং একটি নাম,
অনেকের কাছে এদুটির কত দাম।
গোপনে গোপনে মনের মণিকোঠায়
এদের ঘিরিয়া জ্বলে যাহা অবিরাম,
আরতির দীপে যে চির ফুল ফোটায়,
তাহার খবর নাইবা পড়িল চোখে,
তারি উৎসব চলুক গোপন লোকে।....."

দ্বিতীয় কবিতাটি "পাখীর গল্প" :

"চারতলার লোক খবর রাখে না তিনতলার,
তিনতলার লোক চেনেনা দোতলার লোককে
দোতলার লোক জানেনা একতলাকে,

একতলার নীচে যে পাতাল আছে
তাকে তো জানেই না কেউ,
সে যে আছে তাও কেউ জানতে চায় না।
তাই তার রাগ হয়,
মরতে মরতে ফেটে বেরোয় রাগটা,
ভূমিকম্প হয়, চারদিক কাঁপে,
চারতলা, তিনতলা, দোতলা, একতলা
তখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে,
মনে হয় জাপ্‌টাজাপটি করছে।
কিন্তু মজার কথা জানিস ?
তখনো ওদের পরস্পর পরিচয় হয় না।
মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মুখোশ খুলতে পারে না ওরা।

শালিক গল্প বলছিল টুন্‌টুনিকে।
অবাক টুনটুনি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে
আরেকটা ডালে উঠে বসল,
বলল, 'চিহুইক্‌ চিহুইক !'
মানে 'তাই নাকি ?'
শালিক উত্তর দিল : 'পিড়িং !'

দুটি কবিতা বলাইদা নিজেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কবিতা-সংকলন থেকে। দুটিতেই মৃত্যুর প্রসঙ্গ উপস্থিত। সম্ভবত তাঁর অচেতন মনে ছায়া ফেলেছিল সহধর্মিনী লীলাবতী দেবীর মৃত্যুর স্মৃতি, যে বিষয়ে তিনি পরে 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে লিখেছিলেন :

"হঠাৎ আমার জীবনে এই সময় একটি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইল। ২৭শে জুলাই ১৯৭৬ সন্ধ্যা ৬ টা ০৫ মিনিটের সময় লীলা

চিরতরে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। সেদিন হইতে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাহার সহিত আমার ক্বচিৎ ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। সে আমার সহ-ধর্মিনী ছিল, সহমর্মিনী ছিল। ··আমার ন্যায় খামখেয়ালী পাগলকে দিয়া সে যে কী মন্ত্রবলে সাহিত্য সৃষ্টি করাইয়াছে তা জানি না। ···তাহার উপর বড় নির্ভর ছিল। এখন সে নির্ভর চলিয়া গেল। প্রায় বছর খানেক আগে হইতে পক্ষাঘাত রোগ তাহাকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করিতেছিল। ···গত কয়েক মাস সে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। কথা পর্যন্ত বলিতে পারিত না। এসব রোগ সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়। লীলা পুণ্যবতী ছিল, ভগবান তাহাকে বেশী কষ্ট দেন নাই। ···আমি কিন্তু বড় অসহায় হইয়া পড়িলাম। বিরাট একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছি।"

বলাইদার 'লী' নামক রচনাটি (আমাকে লেখা তাঁর উল্লিখিত চিঠির শেষদিকে যার উল্লেখ আছে) তার এই বিরাট শূন্যতা অনুভবেরই মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি, দুঃসহ মর্মবেদনাকে যথাসম্ভব সহনযোগ্য করে নেবার সাহিত্যিক প্রয়াস।

বলাইদার কবিতা-আবৃত্তি টেপের যে পিঠে করেছিলাম, তার উল্টো পিঠে রেকর্ড করা ছিল আমার গাওয়া একটি প্রাচীন বাংলা গান "যাবে কি হে দিন আমার বিফলে বহিয়ে ?" প্রায় ষাট বছর আগে ভীমপলশ্রী রাগাশ্রিত এই গানটি গ্রামোফোন রেকর্ডে সেকালের বিখ্যাত গায়িকা মানদাসুন্দরীর কণ্ঠে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বুড়ো বয়সে অপটু কণ্ঠে গাওয়া আমার এই গানটির টেপরেকর্ড শুনে সেদিন (১৮. ১১. ৭৭) বলাইদা বলেছিলেন, "খুব ভালো লাগল।" এবং আমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

আজও করি, কারণ আমি জানি দরদী শ্রবণ-শিল্পী বিরাট পুরুষ। তিনি শুনেছিলেন আমি যা গাইতে চেয়েছি, যা গাইতে পেরেছি তা নয়। অর্থাৎ আমার কণ্ঠের গান নয়, মনের গান শুনেছিলেন তিনি, সুদূর অতীতের স্মৃতির মাধুরী মিশিয়ে। অতীতে সুদক্ষ কণ্ঠে গীত এ গান বলাইদা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন ; কিন্তু সেই অতীতে শোনা গানের সঙ্গে তিনি আমার গাওয়া গানের তুলনা করেন নি, দুটি গানকে সহানুভূতির যাদুতে একাত্ম করে নিয়েছিলেন।

আমার টেপরেকর্ড করা গানের সঙ্গে বাঁয়া-তবলা ছিল না। সে গান শুনিয়ে আসার পর বলাইদাকে আমার বাঁয়া-তবলার প্রতি বিতৃষ্ণার কথা চিঠিতে জানিয়েছিলাম, লিখেছিলাম বাঁয়া-তবলার চট্‌পটি আমার গান গাওয়া এবং গান শোনাকে বিরক্ত করে ; সঙ্গীতে আমার যত অনুরাগ, চাঁটি-মারা সঙ্গতের প্রতি ততটাই বিরাগ। আমার সেই চিঠির জবাবেই আমাকে উক্ত চিঠি লিখে-ছিলেন বলাইদা। তাঁর চিঠিতে আমার সঙ্গীত-ধারণার সমর্থন পেয়ে ভালো লেগেছিল।

ওস্তাদী গানে কণ্ঠের জিমন্যাস্টিক আছে, যা মাঝে মাঝে হৃদ্‌যন্ত্রকে কম্পিত করে, তাই তার ক্ষেত্রে তবলার দাপট বেমানান না হতে পারে, কিন্তু ভাব-সঙ্গীতে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে, বাঁয়া-তবলার উৎপাত আমার কুৎসিৎ শ্রুতিকটু মনে হয়, যেন সুরের মাথায় হাতুড়ি ঠোকা হচ্ছে।

শুনেছি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমার গানের ওপর তোমরা ষ্টীম-রোলার চালিও না।" বাঁয়া-তবলাকে আমার বলতে ইচ্ছে করে, "ভাই, তোমরা দয়া করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রেহাই দাও।

তার শুদ্ধতাকে জবেহ্ কোরো না।"

বাঁয়া-তবলা-সঙ্গতের উৎপাতমুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহিমা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম কবি নরেন্দ্র দেবের মরদেহ শোভা-যাত্রা করে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাবার সময়, কবিকন্যা নবনীতার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি শুনে :

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ-দহন লাগে।"

তারপর শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লীর গহ্বরে নরেনদার মরদেহকে সঁপে দেবার আগে পাশে দাঁড়িয়ে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন :

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে।"

মর্মান্তিক শোকে রবীন্দ্রসঙ্গীত কি গভীরভাবে হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারে, তা অনুভব করেছিলাম সেদিন নবনীতা এবং অশোকতরুর কণ্ঠে ঐ রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটি শুনে। তাঁদের গানের সঙ্গে ছিল না বাঁয়া-তবলার সঙ্গত।

বাঁয়া-তবলা-হারমোনিয়াম-সঙ্গতহীন বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অভিজ্ঞতার একটি কাহিনী আমাকে একদিন শুনিয়ে-ছিলেন বলাইদা ('বনফুল')। সে গান তাঁকে শুনিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ! একবার শান্তিনিকেতনে অতিথি রূপে অবস্থান-কালে বলাইদা তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি অসাধারণ ভালো গাইতেন শুনেছি। আপনার গান শুনতে বড় ইচ্ছে করে।" রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, অতীতের সেই কণ্ঠ

তো আর নেই। তবু যদি কখনো গানের মেজাজ আসে, তোমাকে গান শোনাবো।"

সেদিন মধ্যরাতে বলাইদাকে ডেকে পাঠালেন কবিগুরু। বলাইদা যেতেই তিনি বললেন, "মেজাজ এসেছে। তোমাকে গান শোনাবো। তাই ডেকেছি।"

রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার', সেই সময় শান্তিনিকেতনের একটি ঘরে মুখোমুখি বসে রবীন্দ্রনাথ এবং বনফুল। হারমোনিয়াম, তম্বুরা, বাঁয়া-তবলা অথবা মানুষের তৈরী অন্য কোনো রকম সঙ্গীত-যন্ত্র ছিল না সে ঘরে; ছিল শুধু ঈশ্বরের তৈরী একটি সঙ্গীত-যন্ত্র: রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ। বার্ধক্যজর্জর সেই কণ্ঠেই কয়েকটি বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত স্নেহধন্য বনফুলকে গেয়ে শোনালেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের কোনো তুলনা হয় না, আমাকে বলেছিলেন বলাইদা।

প্রচণ্ডভাবে 'বনফুল'-এর ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে ১৯৩৬ সালের এম-এ পরীক্ষা পাশ করার পর।

এম-এ পরীক্ষার জন্য আমাকে ইংরাজী পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক অনেক পড়তে হয়েছিল, ছোট নাটিকা একটিও পড়তে হয় নি। পরীক্ষার জন্য পড়ার পালা চিরতরে সমাপ্ত হবার পর শুরু করলাম নিছক পড়ার আনন্দ উপভোগের জন্যই পড়ার পালা। তখন পর পর অনেকগুলি ইংরাজী একাঙ্কিকা পড়লাম, যা এম-এ পরীক্ষার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি নাটিকা ছিল মাত্র একটি দৃশ্যে সমাপ্ত। বড় নাটকের

চাইতে আমি বেশী ভক্ত হয়ে উঠলাম একাঙ্কিকার। মনে হলো মনের ওপর এদের প্রভাব তীক্ষ্ণতর, তীব্রতর, বড়র চাইতে ছোটর প্রভাব বেশী জোরালো। বৃহৎ উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে উৎকর্ষ থাকে ছড়িয়ে, বিস্তৃতভাবে ; ক্ষুদ্রায়তন উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে উৎকর্ষ থাকে ঘনীভূত, কেন্দ্রীভূত।

এই সময়ে আমার সেজোকাকার বড় ছেলের শক্ত অসুখ —যা বৃহৎ পরিমাণের অ্যালোপ্যাথিক দাওয়াই সারাতে পারে নি —আশ্চর্যভাবে সারিয়ে দিলেন একজন অনতি-বিখ্যাত হোমিও-প্যাথ, মাত্র কয়েক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে, যার এক একটি ডোজ অতি সামান্য পরিমাণ শুগার অব মিল্‌কে সর্ষে-পরিমাণ গ্লোবিউল। এ ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্রায়তনের বৃহত্তর শক্তি আমাকে বিস্মিত করল।

এমনি যখন আমার মানসিক পরিস্থিতি, তখনই আমি বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব, অনবদ্য আকর্ষণ আবিষ্কার করলাম : 'বনফুল'-এর ছোট-ছোট গল্প (ইংরাজী ভাষায় যাকে বলা হয় **short short story**)। এদের হয়তো গল্প-স্ফুলিঙ্গও বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটির শুরুতে চুম্বকী আকর্ষণ, অন্তে অভাবনীয় বিস্ময়ের চমক, আর এই দুয়ের মাঝখানে স্যাণ্ড্‌উইচ করা চিন্তার খোরাক। মনে হ'লো বনফুলের অপূর্ব সৃষ্টি এই হোমিওপ্যাথিক গল্পগুলি অন্যান্য অনেক লেখকের লেখা অ্যালোপ্যাথিক গল্পের চাইতে বেশী শক্তিশালী। আমার তখনকার বনফুল-মুগ্ধতা—যা আজও বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি—ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে 'হিরো-ওআরশিপ' (**hero-worship**), আমি কল্পনার চোখে সেই দৃষ্টিতেই দেখতে লাগলাম বনফুলকে।

যে কোনো জনপ্রিয় পত্রিকার বিশেষ (নববর্ষ, শারদীয়া, দীপাবলী, দোল ইত্যাদি) সংখ্যা হাতে এলেই প্রথমে খোঁজ করতাম বনফুল তাতে কি লিখেছেন। কিন্তু বনফুলকে চোখে দেখবার আগ্রহ কখনো অনুভব করি নি ; হয়তো অবচেতন মনে ভয় ছিল যাঁর লেখা অত ভালো লাগে, সেই মানুষটিকে তেমন ভালো নাও লাগতে পারে। আমি ১৯৩২ সাল থেকেই 'শনিবারের চিঠি' মাসিকে লিখতে শুরু করেছিলাম এবং প্রচুর লিখতাম। বনফুলও তাতে প্রচুর লিখতেন। আমার লেখা তাঁর চোখে পড়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার যোগ্য হয়েছি বলে আমার মনে হয় নি, তাই সে চেষ্টা করি নি। (এখানে না বলা হয় তো অন্যায় হবে, অন্য যে দুজন লেখকের লেখা শারদীয়া সংখ্যায় পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতাম, তাঁরা পরশুরাম এবং পরিমল গোস্বামী।)

বনফুলকে এবং তাঁর সহধর্মিনী লীলাবতী দেবীকে একই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় প্রথম দেখলাম কলকাতা সিংহীবাগানে সি আই টি বিল্ডিং-এ তাঁদের বড় ছেলে ডাক্তার অসীম কুমারের ফ্ল্যাটে। ১৯৬০ এর কাছাকাছি পরবর্তী একটি সালে। বনফুল তখনও ভাগলপুরের (বিহার) বাসিন্দা, সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলেন দিন কয়েকের জন্য, 'যষ্টিমধু' সম্পাদক সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষকে লিখে দিয়েছিলেন তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করে সিংহীবাগানের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। আমার লেখা পড়ে আমাকে দেখবার সস্নেহ আগ্রহ হয়েছিল তাঁর, এ কথা তিনি জানিয়েছিলেন কুমারেশ বাবুকে এবং কুমারেশ বাবু আমাকে।

সেই সন্ধ্যায় 'বনফুল' (ডাক্তার বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়)

হয়ে গেলেন আমার বলাইদা আর তাঁর সহধর্মিনী লীলাবতী দেবী হয়ে গেলেন আমার লীলাবতী বৌদি। প্রথম দর্শনেই মনে হলো এঁরা যেন আমার চিরদিনের আপন মানুষ। বনফুলের সঙ্গে দেখা হবার আগে যে আশঙ্কা আমার মনের মধ্যে ছিল, তা অমূলক প্রমাণিত হলো। তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধতর হলাম।

লীলা বৌদি প্রথম দর্শনেই হাসিমুখে আমাকে জানালেন আমার 'প্রজ্ঞাপারমিতা' উপন্যাসটি (১৯৫৭ সালে প্রকাশিত) তাঁর খুব ভালো লেগেছে। জেনে গভীর তৃপ্তিলাভ করলাম। কিন্তু আমার উপন্যাসটি তাঁর ভালো না লাগলেও তাঁকে আমার ভালো লাগত। তাঁর মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি যেন বলে দিচ্ছিল তিনি জীবনে পরম সুখী, আর সবাইকে তিনি সুখী দেখতে চান। সেই প্রথম দেখার সন্ধ্যায় কল্পনাও করতে পারিনি তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখাটি কি মর্মান্তিক হবে।

বনফুল যে খাওয়া এবং খাওয়ানো দুটি ব্যাপারেই প্রচণ্ড রকম উৎসাহী, এ কথা আগেই শুনেছিলাম বন্ধুবর কুমারেশ বাবুর এবং আরো অনেকের মুখে। এও শুনেছিলাম যে ভোজন-পালোয়ান ছিলেন না বলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিমল গোস্বামী ভাগলপুরে বনফুলের বাড়িতে যেতে ভয় পেতেন, কারণ তাঁর অতিথি হলে আহার্যের রকম এবং পরিমাণের প্রাচুর্য সহ্য না করে উপায় ছিল না। কথাটায় অতিরঞ্জন থাকলেও সেটা যে সত্যেরই অতিরঞ্জন, প্রথম বনফুল-দর্শন-সন্ধ্যাতেই তার প্রমাণ পেলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি খাবে?" আহারে আমার বৈষ্ণব রুচি জেনে রাজভোগ, সন্দেশ ও গরম শিঙাড়া আনলেন,

পরিমাণে প্রচুর আর প্রত্যেকটি আয়তনে বিরাট। বলাইদাকে খুশী করার জন্য প্রচুর খেতে হলো। খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ১৯৪৭ সালে কৃত আমার একটি ধৃষ্টতা বা অবিমৃষ্যকারিতার কথা। আমি তখন ছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতায় ক্রীক রো (মৌলালি) থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার রবিবাসরীয় সম্পাদক। কবি জীবনানন্দ দাসও এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন, এবং তাঁকে অনুরোধ করে রবিবাসরীয় বিভাগে 'মন-মর্মর' নামে কয়েক কিস্তি গদ্য ফীচার লেখাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রবিবাসরীয় সম্পাদক রূপে শারদীয়া সংখ্যা সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। সেই সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ভাগলপুর থেকে ডাকযোগে ফুল্‌স্‌ক্যাপ এক পৃষ্ঠার একটি অতি-ছোট গল্প পাঠিয়েছিলেন স্বনামধন্য বনফুল, আমি যাঁর মুগ্ধ ভক্ত। লেখাটি পড়ে মনে হলো এটি স্বতঃ-উৎসারিত নয়। কষ্ট-কল্পিত, অনন্য বনফুলী চমক এতে অনুপস্থিত। এ গল্প যেন তাঁর ডান হাত দিয়ে নয়, বাঁ হাত দিয়ে লেখা। তাছাড়া অধিকাংশ পাঠকই এ গল্পের মর্ম বুঝতে অক্ষম হবে, রস গ্রহণ করতে পারবে না। দোটানার দোলায় অনেক দুলে দুলে শেষপর্যন্ত লেখাটিকে ডাকযোগে বনফুলকে ভাগলপুরের ঠিকানায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে আমার পূর্ণ স্বাক্ষর সহ একটি পত্রে উপরোক্ত কারণ জানিয়ে সবিনয় আবেদন জানালাম একটি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য গল্প পাঠাতে। বলা বাহুল্য কিনা জানি না, সে পত্রের জবাব পাই নি, বনফুল আর গল্পও পাঠান নি। তখন বিবেকের দংশন অনুভব করি নি, কারণ বিবেক তখন আমাকে একটুও দংশন করেনি। বরং সে আমাকে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল, "বনফুল যে এমন গল্পও

লিখতে পারেন, যা পড়ে চমক না লাগা সম্ভব, পাঠকদের তা বুঝবার সুযোগ করে না দিয়ে তুই ভালোই করেছিস।"

বিবেকের দংশন প্রথম অনুভব করে প্রথম অনুতপ্ত হলাম তার তেরো কি চৌদ্দ বছর বাদে সিংহীবাগানের ফ্ল্যাটে বনফুলকে দেখে। কিন্তু তখন তো নয়ই, তার পরেও তিনি কখনো সেই প্রসঙ্গ তোলেন নি, যা তুললে আমি লজ্জা এবং দুঃখ পেতাম। আমার সেই অর্বাচীন মূঢ়তাকে তিনি অনায়াসে অবজ্ঞা এবং ক্ষমা করেছিলেন এবং আমার সেই অপরাধের দরুণ আমার প্রতি তাঁর স্নেহের সমুদ্রে একটি ঢেউও কম পড়েনি।

লীলা বৌদির সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল কলকাতার লেক টাউনের বাড়িতে। তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাবন্দিনী, বাক্‌শক্তিরহিতা, ইশারাতেও মনের কথা বোঝাতে পারেন না, সব রকম চিকিৎসা হার মেনে গেছে। শুনেছিলাম তাঁকে কেউ দেখতে গেলেই তিনি উঠে বসে কথা বলতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, কিন্তু কোনোটিই পারেন না, হতাশার যন্ত্রণায় জল গড়িয়ে পড়ে দুচোখ থেকে।

যেখানে বসে বলাইদার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তার অতি নিকটে পাশের ঘরেই লীলা বৌদি। বলাইদার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বৌদিকে দেখবার জন্য হৃদয় বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল, মন যদিও ইঙ্গিতে মানা করছিল। বলাইদা বুঝি আমার নীরব আগ্রহ টের পেয়েই বললেন, "বৌদিকে দেখে যাবে নাকি একবার?" তাঁর কণ্ঠে গভীর বেদনার সুর। কি অসীম হৃদয়-যন্ত্রণা তিনি এতটুকু প্রকাশ না করে ভিতরে নীরবে সহ্য করে চলেছেন, ঐ কণ্ঠস্বরে তার আভাস পেলাম।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলাম খাটে শুয়ে আছেন লীলা বৌদি। তাঁর দুটি চোখে জ্বলে উঠল অভ্যর্থনার আলো, কিন্তু মুখে ছিল না উচ্চারণ-ক্ষমতা। একবার তাকালেন আমার মুখের দিকে, একবার বলাইদার মুখের দিকে। বলাইদা হয়তো তাঁর নীরব দৃষ্টির ইঙ্গিত কিছুটা বুঝলেন, বললেন, "বৌদির কাছে একটু বোসো।"

বসলাম। মাতৃসমা স্নেহময়ী বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে মুখে কিছুই বললাম না, পাছে জবাব দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি কষ্ট পান। শুধু দুহাতে তাঁর অশক্ত ডান হাতখানা চেপে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানালাম। তিনি তাঁর মনের কথা মুখে বলতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 'বোবাকান্না' শব্দটি সাহিত্যে পড়েছিলাম, সে কান্না যে এমন মর্মন্তুদ হতে পারে তা আগে কল্পনাও করতে পারি নি।

কিছুক্ষণ বাদে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত চিত্তে বেরিয়ে এলাম। কি কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলেন লীলা বৌদি, তা অজানাই রয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ আর এই শেষ সাক্ষাতে কত তফাৎ!

মনে পড়ল লীলা বৌদি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো অপ্রত্যাশিতভাবে আরোগ্য-সম্ভাবনাতীত পক্ষাঘাতে শয্যাবন্দিনী হবার আগে বলাইদা একদিন আমাকে বলেছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে মোটের ওপর বেশ সুখী জীবনই দিয়েছেন,—পত্নী, সন্তান, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনী, বন্ধু, আর্থিক সচ্ছলতা, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, আয়ু সবই তিনি পেয়েছেন মনের মতো, দুঃখ-শোকের আঘাত থেকে তাঁর জীবন আপেক্ষিকভাবে মুক্ত, ঈশ্বরের কাছে তাঁর কোনো নালিশ নেই।

বলাইদার সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবন-দর্শন সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, শেষ জীবনে এই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েও ঈশ্বরের কাছে তার কোনো নালিশ ছিল না, তিনি ভেবেছিলেন, "যিনি জীবনে এত আনন্দ দিয়েছিলেন, তাঁর দেওয়া একটু দুঃখ সইব না ?"

ক্রমশ

CENTRAL LIBRARY

কবিরুল ইসলাম

পূর্ণ অপূর্ণ

এমনি এলাম ঘটা ক'রে, যদিও জানি চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।
ঘটনা কিন্তু অন্যরকম : মনের কথা তাহলে মনেই থাক্—
প্রথম বছর গাছের ফসল যেমন ঝ'রে যায় !
এই এতোটা কাছের বিদেশ মঞ্জুভাষিণী
পীযূষ টানে তাই কি প্রত্যহ ?

কিন্তু জানো, প্রত্যহের অপূর্ণতা নেই :
আমি গো জানি পূর্ণতার মানে ॥

পার্থসারথি চৌধুরী

বিরক্ত প্রবাস

চিত্রিত আরাবল্লীর সানুদেশে
এই জনপদ ছড়িয়েছিটিয়ে
আমাদের স্মরণযোগ্যতায় বারবার বাসা বাঁধে।
বিতর্কিত মহাকাব্যলোকও এখানে আশ্রয় খোঁজে।

হীনযান

অনুসন্ধিৎসু পরাক্রমের নিরাপদ ছাউনি,
বিশাল বর্ষের একটেরে বিবর্ণতা
যাযাবরের মন ভোলায়।
যমুনা নয়, আলস্য ;
বালিপাথরের দুর্ধর্ষ আড়ালে
বিভ্রান্ত মৃতমানস ব্যভিচার,
অনুকৃতিপ্রবণ বিলাসের নিশাজাগর,
শ্রমভুক ইমারতী অহঙ্কার,
(ক্বচিৎ ইচ্ছাছুট রূপমায়া),
মূর্খের সাম্রাজ্যবিস্তার,
আহাম্মকের আমিরী,
বিপুলবপু ক্লীবের সম্ভোগেচ্ছা—
সব শতাব্দী ও সময়ের উচ্ছিষ্টের মতো
মৌন শিলাতলে দাগ ফেলে।

নতুন ব্যাপারী, নতুন জয়কেতু, নতুন রাজগী,
ঘর সাজায়, ঘর ভাঙে,
রামধূন গায়, চুক্তিপত্রে সই করে,
ভোজের অবশেষ বিদ্রূপে বিষাক্ত,
সেই একই প্রান্তশায়ী চতুর আলস্য,
দূরে দূরান্তরে সুবেদার পাঠায়,
অন্নদাসের পাহারায় মখমল দোলে
সমকামিতার অন্ধকারে,
নায়িকানখর নিকোটিনে মেহেদিহলুদ,
চোলিতে বাসন্তী রঙ্ ধুয়ে ফেলে রাজকীয় ধোপা।

তবু ভেদদণ্ডের মধ্যবর্তী ফাঁকফোকরে
উদ্ভিদ মাথা নাড়ে,
মরুবিজয়ের কেতন,
দৃষ্টিহীনের স্থির কনীণিকা
কিংবা বিষয়সঙ্কের চোরাচাউনির বাইরে
যজ্ঞবেদীর এদিকে সেদিকে
উদ্ভিদ পল্লব মেলে,
পাখপাখালি বিলম্বিত প্রদোষে ডাকে,
রক্তাকাশে মাথা নাড়ে,
ঝুপসি আঁধারে ফিরে আসে।

আকাশে সরলরেখা এয় পোতাশ্রয় চেনে,
বিমানযাত্রীর আনাগোনা.
নীলবসন বিপুলজঘনা ঝাড়ুদারনীদের
হরিনামের ঝোলা চুরি গেছে অনেককাল,
মথুরায় গোয়ালা সিন্ধি ঘোঁটে,
গোপিনীরা রাসলীলায় মণ্ডলমধ্যবর্তী নাগর হারায়,
মন্দকাম আলস্যে দিন কাটে।
বৃন্দাবনে হতাশ্বাস ভিন্নভাষী বিধবাদের অষ্টপ্রহর,
ব্রজবাসী আর চাপরাসী কেউ কাউকে চেনে না।

রাজঘাটে ফুলমালা,
চঞ্চলপলাতক জাটের দর্শন
পাঞ্জাবের হঠকারী বীর্যের হিশেব করে,
যুযুধান রঙ্গস্থল,
অমাত্যকরণিক

হীনযান

সকালে দুধের লাইন থেকে
নিপাট শিশুদের স্কুলবাসে তুলে দেয়।

সব রমরমা সন্ধ্যারাতে ঘুমুতে যায়,
যৌতুকী সঙ্গমও চটকবৃত্তিতে পরিণত হয়,
ঠিকঠাক ঠাটবাট,
বেশ চলছে সব কিছু,
রাজপাটের ভগ্নস্তূপে এবারের আয়োজন
মৌসুমী আশ্বাসে ডগোমগো,
কেবল একটু ইতর গন্ধ ছাড়ে।

গাঙ্গেয় বিমূঢ়তা দুদিন কাটায়
এর অতিথিশালার কোটরে,
এক শূদ্রাণীর স্বপ্ন দেখে
যার তামস বিশৃংখল প্রাবৃটকেশের আড়ালে
সঙ্কীর্ণ প্রদেশের এখানে ওখানে
প্রেম স্বপ্ন ভালোবাসা উঁকি মারে।
ডাকতে থাকে বেলপাহাড়ি, তুম্বনী, বহুলাড়া,
শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন।

বাংলা থিয়েটারের গান ও ইন্দিরা

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে যখন পুরনো দিনের অর্কেষ্ট্রা বেজে ওঠে তখনই মন প্রস্তুত হয় অন্তত ভিন্নধর্মী একটি অনুষ্ঠানের শ্রোতা/দর্শক হবার জন্যে। প্রাপ্তির হিসাব পুরোপুরি হয় তো হয় না, কিন্তু স্বীকার করতেই হয়, ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠীর 'বাংলা থিয়েটারের গান' একটি ব্যতিক্রম প্রযোজনা।

'প্রসঙ্গ কথায়' রাজ্যেশ্বর মিত্র জানিয়েছেন, সেদিনের গান আজকের শিল্পীদের কণ্ঠে ঠিক তেমনভাবে গাওয়া সম্ভব নয়। অন্তত সেই গায়কী। কিন্তু ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রয়াস ও আন্তরিকতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শ্রীমিত্র। এ বিষয়ে অন্তত বর্তমান প্রতিবেদকও একমত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'মৃণালিনী' সেদিনকার পেশাদার মঞ্চে এক জনপ্রিয় নাটক। মৃণালিনী থেকে সূচনা— শেষ গান অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' এর: "নমো নমো রবিচ্ছবি"। শুধু বাণীতে নয়, সুরেও আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এই গানটিতে। পরবর্তীকালে পেশাদার নাটকে গানের ব্যাপারটা ক্রমে অচিন পাখীর রূপ নিয়েছে। কখনো তারাশঙ্করের 'কবি'র মতন সংগীতবহুল নাটক এসে পড়েছে কিন্তু পেশাদার মঞ্চকে পঞ্চাশ-ষাট সত্তরের দশকে এই ধরনের নাটক বলতে পিছনের দিকেই তাকাতে হয়েছে। কখনো বা 'চিরকুমার সভা' কখনো বা 'আলিবাবা'। এরই ফাঁকে 'ব্যাপিকা বিদায়'। আর

এর বাইরে 'মারীচ সংবাদ' বা 'জগন্নাথ'। কিন্তু সবচেয়ে সত্য কথা আজ কিবা পেশাদার কিবা অপেশাদার মঞ্চ— সংগীতবহুল নাটক আড়ালে গোনা যায়। এমনকি, ছন্দা চ্যাটার্জীর অনুপস্থিতিতে 'টিনের তলোয়ার'-এর গান স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায় না।

এই নাটকগুলি ও তার গান নির্বাচন নিশ্চয়ই ইন্দিরার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফসল। তবুও মনে দু-একটা প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন, 'ব্যাপিকা বিদায়'। এককালে এ-নাটকের গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, বিশেষ করে আঙুরবালার কণ্ঠে চমৎকার চরিত্রের গান। যেমন হয়েছিল আশ্চর্যময়ী, সরস্বতী—বিশেষ করে নীহারবালার কণ্ঠে 'কর্ণার্জুন' এর নিয়তির গান : "আমি কখন ভাঙি, কালপ্রবাহ চলে ধীরে ধীরে" প্রভৃতি গান। সে-রকম একটি গানও কি যুক্ত করা যেত না? অথবা বাউলাঙ্গের কোনওগান?

সাধারণভাবে পরিবেশিত গানের সঙ্গে থিয়েটারের গান পরিবেশন করার মধ্যে একটা মৌলিক তফাত আছে। থিয়েটারের গান যখন 'থিয়েটার'-এর ছাপ মেরে গাওয়া হয়, তখন একটা দায়িত্ব এসে পড়ে শিল্পীর—গানের মধ্যে পরিবেশ এবং নাটকীয়তাকে প্রকাশ করার। ইন্দিরা শুধু গানই পরিবেশন করেছেন—গানের-পূর্ববর্তী সংলাপ নয়। সুতরাং সেখানে শিল্পীদের দায়িত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায়। শিরি-ফরহাদ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)-এর গান গেয়েছেন সরযুবালা, সুশীলাবালা, বেণুবালা (ফুল), নীহারবালা প্রমুখ। তাঁরা কেমন গাইতেন—শুনি নি বা জানি না, তবে এদিন নবীনা শ্রীনন্দা মল্লিকের কণ্ঠে যখন শোনা যায় 'ভালোবাসা একরকমের নয়' তখন বলতেই হয়, থিয়েটারের গান এমনটিই গাওয়া উচিত। একই কথা প্রযোজ্য শ্রীনন্দা মুখো-

পাধ্যায়ের 'রাজা ও রাণীর' "সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে"র পরিবেশন সম্বন্ধে। মৃগাঙ্ক সরকারের "সরসী উরসে বিরাজে" স্বতস্ফূর্ত পরিবেশন। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ-চরিত্রর গান "সাপে বাঁদরে খেলা করে"-র সুর তেমনভাবে আকর্ষণ করে না। অনিতা মজুমদারের কণ্ঠটি তৈরি, অলংকরণ সমৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর দুটি গানই থিয়েটারের গান হয়ে উঠল না। যেমন সবিতাব্রত দত্তর 'আবদাল্লা'র (আলিবাবা) গানের পাশে মজিনার গানে গীতা দত্ত-র গান নিষ্প্রভ মনে হয়। এই অনুষ্ঠানে আবিষ্কার করা গেল, প্রভাস দে তাঁর গানে বিশেষ মাত্রা এনে দিতে পারেন। চণ্ডীদাস মাল শুধু পরিণত সংগীত শিল্পীই নন, তিনি যে একটা মঞ্চে অভিনয় করতেন সে কথাও প্রমাণিত হ'ল। কেতকী দত্ত কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে বিনোদিনী' নাটকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন, আর এবার বিস্মিত করলেন 'সাজাহান' ও 'সীতা'-র গান পরিবেশন করে। এই সুধী শিল্পীকে মাঝে-মধ্যে গানের আসরে পেলে ভালোই লাগত। সম্মেলক গানে ছিলেন ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী। এবং সম্মেলক গানে তাঁদের পরিবেশন দক্ষতা ইতিমধ্যে স্বীকৃত ব'লে এ বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য। মঞ্চসজ্জা শুধু পরিবেশানুগ নয়—একটা কালকে সযত্নে উপস্থাপিতও করে।

স্মারকগ্রন্থে (বলা ভালো, 'বাংলা থিয়েটারের গান' গ্রন্থে) রাজ্যেশ্বর মিত্র ও গীতা সেনের দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, কুমার রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সাক্ষাৎকারগুলিকে কিছুটা আত্মবিশ্লেষণ বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। কারণ, উৎপলবাবু বললেন : "বাংলাতে ব্রেখ্‌ট্ অভিনয়ে গানগুলি অখাদ্য হয় ধরুন, নাম করেই বলছি, 'তিন পয়সার

পালা'তে যেভাবে থেমটা প্রযুক্ত হ'ল তা আপত্তিকর।" এবং অমিত বাবু বলেন, "আমি গান জানি না, আমি সুরকার। অভিজ্ঞতায় অথবা গানের কাছাকাছি থাকায় আজ হয়তো এ ব্যাপারে সামান্য কিছু বলার অধিকার আমার এসেছে, কিন্তু যখন 'তিন পয়সার পালা' করেছি তখন আমার গানের অভিজ্ঞতা প্রায় শূন্য।' অধিকাংশ সাক্ষাৎকারই বড় স্পষ্ট এবং সত্য বলেই তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুরনো কথায় ফিরে আসা যাক্। ইন্দিরার 'বাংলা থিয়েটারের গান' আমাদের ফেলে আসা অতীত, তার ঐতিহ্য দেখালেন—দেখালেন এবং শোনালেন। আজকের দিনে কাজটি বড় সহজ নয়। যদি একজন শ্রোতাও এই অনুষ্ঠানের পর বিষয়টি নিয়ে—আজকের মঞ্চে, যুগপৎ পেশাদার বা অপেশাদার নাটকে গানের অভাব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন তবেই এ অনুষ্ঠানের সার্থকতা।

১৮৯২তে মিনার্ভার নাটক গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন'। পরবর্তীকালে মনোমোহন থিয়েটার নাটা মন্দিরেও এ নাটক অভিনীত হয়। আজও হয়। তবে হিটগানের সুরে গাওয়া হয় নাটকের গানগুলি। 'গিরিশ প্রতিভার মধ্যমণি নৃত্যগীতি-বহুল সেই চিরনূতন গীতিনাট্য'— আবু হোসেনেরই বিজ্ঞাপন। জানি না— এ ধরনের বিজ্ঞাপন ভবিষ্যতে দেখতে পাবো কি না বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে।

অমিত মজুমদার

একালের মঞ্চে গ্রীক নাটকের চ্যালেঞ্জ

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

সফোক্লেসের 'রাজা অয়দিপাউস' কিংবা 'আন্তিগোনে'র নাট্য-শৈলীর ধ্রুপদী বৈভব ইউরিপিদেসের 'মেদেয়া'-তে নেই, নেই তাদের দেশ-কাল-পৌরাণিক জগৎদেবতা-মানুষের সমন্বিত বিশাল ব্যাপ্ত গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। দলছুট এই নাট্যকারের রচনা সেদিনের গ্রীক নাটকের প্রচলিত ধারা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে বারবার। তথাপি, বিশ শতকের শেষ পাদেও, তাঁর 'মেদেয়া' আমাদের আকর্ষণ করে। যেমন আকৃষ্ট হয়েছেন মিডল্-টন মারে, মেদেয়ার মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় আকৃষ্ট হ'য়ে যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই যাঁর মনে প'ড়ে যায় ইব্‌সেনের নাটক।

সেদিনের সমাজকেন্দ্রিকতা থেকে স'রে এসে ইউরিপিদেস যেভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন 'মেদেয়া'-র গার্হস্থ পরিসরে, তারপর একটানে ব্যক্তিচেতনার গভীরে, বস্তুত সেখানেই রয়ে গেছে তাঁর সমকালের তর্জনী এবং পরবর্তী তথা আধুনিক কালের সম্ভাষণ। অন্যান্য যে-কোনো গ্রীক নাটকের চেয়েও তাই 'মেদেয়া' বর্তমানে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, সমকালীন। পরন্তু, এক দেশে অন্যায় ক'রে আরেক দেশে নির্বিচার রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া যে আজো কতো অবিরল সম্ভব, তা বর্তমান পৃথিবীর সচেতন দর্শকমাত্রেরই জানা।— এগেউস কি বিশুদ্ধ মানবিকতার খাতিরে মেদেয়াকে—

এথেন্সে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলো? নাকি, ব্যক্তিগত স্বার্থেই (মেদেয়ার মন্ত্রশক্তিতে সন্তানলাভের আশায়) এগেউসের অমন করুণা প্রদর্শন? —আড়াই হাজার বছর পরেও মানুষদের কি হামেশাই দেখা হচ্ছে না তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার তাবৎ তাবৎ রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কদের অনুরূপ মানবিকতার বহর? আর, মেদেয়ার যন্ত্রণা?—সে তো রক্তের অন্তর্গত চিরন্তনী বিষ। মেদেয়ার ক্ষোভে পৃথিবী আজ সংক্রামিত, তার ক্রোধানল ব্যাপ্ত লেলিহান।

ওভিদের 'মেটামরফসেস্'-এ মেদেয়া য়াসনকে সাহায্য করেছিলো "গোল্ডেন ফ্লিস" অর্জনে, কিন্তু ইউরিপিদেস পুরাণের যথাযথ অনুসরণ করেন নি। —একটি সন্তান জন্ম দে'য়ার চেয়েও একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যার কাছে গৌরবজনক, প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি অর্জনের জন্যে যে লিঙ্গান্তরিত হওয়ার প্রার্থনা জানায় দেবতাদের উদ্দেশে, জিঘাংসাবৃত্তির উপান্ত্যে পৌঁছে যে হ'য়ে ওঠে নাটকের কেন্দ্রচরিত্র, তাকে অস্বীকার কিংবা খর্ব করার দরুন শুভাশুভের কোনো সীমারেখা অঙ্কনেও ইউরিপিদেসের গরজ ছিলো না কোনো, যেমন প্রয়াস ছিলো পরবর্তী কালে শেক্স্পীয়রের, মেদেয়াকে যখন আর্কিটাইপ রূপে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর একাধিক নারী-চরিত্রায়ণে।

খুনের চেয়েও খুন ও খুনীর অন্তর্গত বাস্তবতা নাটকটিতে যেভাবে বড়ো হ'য়ে উঠেছে, তার যথাযথ উপস্থাপনে থিয়েট্রন-প্রযোজনায় (১২ এপ্রিল '৮৩, শিশিরমঞ্চে) নাটকটি একালের মাত্রায় প্রোজ্জ্বল। মঞ্চের অন্তরালে হত্যালীলা সম্পাদন, সন্তান-হত্যার অব্যবহিত পরে মেদেয়া-য়াসনের সাক্ষাৎদৃশ্যে মেদেয়াকে তার গৃহপ্রাঙ্গনে স্থাপন ক'রে তার দুই পার্শ্ব থেকে সেকেণ্ড

কয়েকের জন্যে ধূম-উদ্গীরণের দৃশ্য নির্মিতি। পরিচালক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পবোধের পরিচায়ক।

মেদেয়ার ভূমিকায় অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সাম্প্রতিক বাংলা মঞ্চের এক বিশেষ প্রাপ্তি। ক্রেয়ন-কন্যাকে বিষাক্ত উপহার পাঠানোর আগে মেদেয়া ও তার সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎদৃশ্যে য়াসনের সরল বিশ্বাসী ও বাৎসল্যপ্রেমের প্রকাশে রঞ্জন সরকারের অভিনয় সুন্দর। তবে তার একাধিকবার "সাহায্য" শব্দের সা—হায্য উচ্চারণ কেন? স্ত্রীর চরিত্রায়ণে দ্বিধা তাঁর স্বচ্ছন্দ-সাবলীল। কিন্তু, শব্দের প্রলম্বিত উচ্চারণে এবং দীর্ঘশ্বাসের সুরারোপে কোরাসের ভূমিকায় ভিন্নজন অভিনেত্রীর বাচনভঙ্গি কৃত্রিম ও অতিরিক্ত নাটকীয়, এবং তাদের বিভিন্ন মুদ্রাও সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন হ'য়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই গ্রীক নাটকে কোরাস ঘটনার বিচ্ছিন্ন প্রতিবেদকমাত্র নয়, নায়িকার সঙ্গে সখীদের সম্পর্ক তাদের, এবং মূল নাট্যপ্রবাহে তাদেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।—সুতরাং সেই কোরাসের ভূমিকায় অভিনেত্রীদের হাবভাব-অঙ্গভঙ্গি কেন হবে গ্রহান্তরবাসী-সুলভ। তাদের ভাষাই-বা কেন হবে অন্যান্য চরিত্রদের থেকে এতো পৃথক, এতো পদ্যগন্ধী?—ভাষাগত ত্রুটি অবশ্যই অনুবাদের দুর্বলতা। পোষাক-পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা ও তাপস সেনের আলো চমৎকার ভাবদ্যোতক।

"ভালো নাটক ভালো করে করবে।"—বাংলা মঞ্চের এক চূড়ান্ত সফল নির্দেশক-অভিনেতার এতকালের শপথ আজ যাঁরা "মূলমন্ত্র" রূপে সরব ঘোষণা করছেন, তাদের কাছে শিল্পের অনেক প্রত্যাশা, আমাদেরও।

'বলাকা'-র ছন্দ—বৈচিত্র্য

অসীমকুমার মুখার্জী

'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের এক যুগান্তকারী রচনা। তার ছন্দ-বৈচিত্র্য কেবল ছন্দ নিয়ে গবেষণা নয়, কবির মনের আকস্মিক বহুমুখী বিকাশের অভিব্যক্তিগুলি নিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা। "গীতাঞ্জলি"—পূর্ব কাব্যের অন্ত্যচ্ছেদ (end-stopped) পংক্তির ওপর যবনিকা টেনে কবি 'মুক্তক' ছন্দের প্রতি ঝুঁকেছেন। কিন্তু ছন্দকে কেবল তার মিলের বেড়িমুক্ত করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল না এবং ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেনের মতে অমিল বা সমিল ছন্দ উভয় রীতিকেই তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছেন। এই পর্যায়ের বিশেষ লক্ষ্যণীয় বস্তু হ'ল ছন্দের ওপর কবির মানসিক নিয়ন্ত্রণ; ছন্দের ভাঙ্গ বা ভঙ্গিমাগুলি কীভাবে তাদের নৃত্যলীলায় যাহারে কবিতাগুলির বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রতিটি না হলেও বলাকার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কবিতা এখানে আলোচনা করা হলো।

৬-নম্বর কবিতাটি নেওয়া যাক্। কবিতাটির মূল ছন্দ ৪-মাত্রিক এবং প্রতিটি পংক্তির উপান্তে একটি করে ২-মাত্রার খণ্ড মাত্রা যোজনায় কবিতাটির একঘেয়েমি কেটে এক গতিশীলতা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞায় একে 'সমমাত্রার' ছন্দ বলা যায়। স্মর্তব্য যে, ছন্দ কবির ভাবের অভিব্যক্তি, কোনো প্রক্ষিপ্ত ছাঁদ

নয়। চারমাত্রার মূল সুরের স্থানবিশেষে তিন মাত্রার শব্দ সংযোজনায় কবি ছন্দের expectancy-কে ব্যাহত করে কবিতা-টিতে মাঝে মাঝে মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। যেমন,

এই ধুলি
ধুসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে

বা

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে,
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে

ওপরের চারমাত্রার সুসজ্জিত শব্দগুলির তালকে ব্যাহত করে 'ধূসর অঞ্চল' শব্দটি পাঠকের মনকে আচম্বিতে আকৃষ্ট করে এবং 'ধূসর'-রে স্বরান্ত অক্ষরটি পরের অ-য়ের সঙ্গে মিলে মুহূর্তের জন্ত হলেও পংক্তিগুচ্ছে এক আলোড়ন এনেছে। সেইরকম-ই পরের উদাহরণের 'দুলিত নিশ্বাসে' কথাটির বিশিষ্ট ঝোঁক-পদ্ধতি এই পংক্তির ছন্দটিকে আন্দোলিত করছে।

মনে রাখতে হবে যে তিনমাত্রার শব্দ রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিশেষ মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত মতটি প্রণিধানযোগ্য:
"কাব্যলীলা একদিন যখন শুরু করেছিলাম তখন কাব্য সাহিত্যে সাধুভাষার-ই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ তখন ছিল কাটা-কাটা পিঁড়িতে ভাগ করা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে নাই। কিন্তু তিন মাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ঐ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র-আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমানদরের একক বলে ধরে নিতে বার বার কানে বাজতো।

সেই জন্যে যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসেছিল। ঠোকর খাওয়ার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল করে যাচ্ছিলুম।"

রবীন্দ্রনাথ পয়ারে ৮-৬ বিভক্তি অপেক্ষা তার যতি বিন্যাসের ওপরে-ই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সম ও অসম মাত্রার তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর মত প্রণিধানযোগ্য : "দুই মূলক সম মাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিন মূলক অসমমাত্রায় চাকার চাল। দুই-পা-ওয়ালা জীব উঁচু-নিচু পথের বাধা ডিঙ্গিয়ে চলে যায়, পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হবে।" ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সাবলীল গতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও কবি যুগ্মধ্বনির সার্থকতা সম্বন্ধে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তিনি লিখেছেন "তখন 'মানসী' লেখার সময় এলো। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। এ কথা তখন নিশ্চিত বুঝেছি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্মধ্বনি ; অথচ এটাও জানছি যে পয়ার সম্প্রদায়ের বাইরে নির্বিচারে যুগ্মধ্বনি পরিবেশন চলে না।" অতএব কবির সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে যে, তাঁর সহজাত বৃত্তি বা প্রবণতা তাঁকে ত্রৈমাত্রিক ছন্দের দিকে আকৃষ্ট করছে, অথচ এরূপ ছন্দের অন্তর্নিহিত স্বচ্ছন্দ, অব্যাহতগতি যুগ্মধ্বনির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এতে পয়ার ছন্দের অন্তর্গত যতির অবকাশ নেই। এই স্বচ্ছন্দ গতিকে কবি এর 'অস্থিরতা' রূপে অভিহিত করেছেন। এগুলি বলাকোত্তর কালের রচনা এবং 'ত্রৈমাত্রিক' বা 'অস্থির' ছন্দের ঊর্মিহীন স্রোতে যুগ্মধ্বনির প্রয়োগ তিনি কত নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন তা দেখাবার জন্য '১৫' সংখ্যক কবিতার কটি লাইনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনস্বীকার্য, অসমমাত্রার (বিশেষত ত্রৈমাত্রিক) পর্বে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। বলাকা-পূর্বের অধিকাংশ কবিতামালায় তিনি এর প্রয়োগ করেছেন সত্য, কিন্তু বলাকার দু-একটি কবিতায় প্রয়োগশৈলী অনবদ্য। '৩৫' নম্বর কবিতাটি প্রায় আদ্যোপান্ত তিন-মাত্রায়, কিন্তু তার বিষম শব্দ সম্ভারকে তিন মাত্রার ধ্বনি-মাহাত্ম্য দিয়ে কবিতাটিতে তার বাচ্যার্থের অনুকূল এক অপূর্ব ক্ষণ-ভঙ্গুরতা সঞ্চার করেছেন।

"২২"-সংখ্যক কবিতাটির ছাঁদ স্বাতন্ত্র্য ধরনের। প্রথম stanza-টি কাটা-কাটা ছন্দাংশে বিভক্ত, অনেকটা ইংরাজী staccato-র মতন :

যখন আমায় / হাত ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি / আপন পাশে,
রাত্রিদিবস / ছিলেন ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে / অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে / নিজের পথে
যদি আপন / ইচ্ছামতে
কোনো দিকে / এক পা বাড়াই,
পাছে বিরাগ কুশাঙ্কুরের / একটি কাঁটা একটু মাড়াই।

এর প্রতিটি শব্দ এক একটি ভাববাহী, যদিও তাদের যুগলগতি-পদ্ধতিটি ছন্দকে শ্লথগামী করেছে সাবধানী পথিকের মত। কিন্তু পরের স্তবকে accented এবং unaccented শব্দ বিন্যাসে ছন্দের চাল সম্পূর্ণ হাল্কা হয়েছে, অনেকটা ইংরাজী trochaic অথবা 'আদিগুরু' ছন্দের মত। কবিতাটি এই প্রকার :

মুক্তি, এবার / মুক্তি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের / কঠিন ঘায়ে,
অপমানের / ঢাকে ঢোলে / সকল নগর / সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, / এবার ছুটি, / এই যে আমার / হল ছুটি,
ভাঙ্গল আমার / মনের খুঁটি,
খলস বেড়ি / হাতে পায়ে।

'২৬' সংখ্যক কবিতাটি দেখা যাক। এখানে বিভিন্ন মাত্রার ও পর্বের অপূর্ব সমাবেশ। প্রথম দুটি ছত্র মাত্রাবৃত্ত বলা যায়। কেন না তাদের আক্ষরিক ভার সমান না হলেও, শব্দের ওজনের মাত্রায় ভারসাম্য আছে।

এবারে ফাল্গুনের দিনে / সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন লতিকায়

উপরের ভাগগুলির অক্ষরসংখ্যা গণনায় সমান না হলেও যুগ্মধ্বনি অথবা যুক্তাক্ষরের নিপুণ প্রয়োগের সাহায্যে আক্ষরিক ঘাটতিকে পূরণ করে নেওয়া হয়েছে। তাদের ছন্দ এবং যতি নিরূপণ মাত্রাবৃত্ত ধাঁচের ও মন্থরগতি। কিন্তু তার পরের চারটি পংক্তিতে তাদের অর্থের অনুষঙ্গবাহী এক অদ্ভুত ছন্দ-বৈচিত্র্য দেখা যায়।

ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্ত বরণ হৃদয় ব্যথার মতো ;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মর কল্লোল

রবীন্দ্রনাথ হপ্‌কিন্সে আগ্রহী ছিলেন কি না জানা নেই, কিন্তু

উপরোক্ত পংক্তিগুলির 'ফুটলো' 'শিউরে' 'নতুন' 'রক্ত' 'হৃদয়' ইত্যাদি শব্দগুলির ঝোঁক হপকিন্সের sprung-rhythm-য়ের মত মনে হয়। প্রয়োজন অনুসারে ইংরেজ কবি হপকিন্সও তাঁর ছন্দের গতিকে অনুরূপ ভাবে ব্যাহত এবং উৎকীর্ণ করতেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ কোনো কবির অনুকারী নন, তাঁর মনের গতি এবং ছন্দ পরস্পরের পরিপূরক হওয়ার প্রয়াসী এবং 'বলাকা' তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলা যায়। ওপরে আলোচিত কবিতার প্রথম stranza-র শেষে দুটি ছত্রে শব্দ বিন্যাসের inversion-রীতি প্রয়োগে তিনি ছন্দে কতটা বলসঞ্চার করতে পেরেছেন তা লক্ষ্যণীয় :

এবার শুধু / গানের মৃদু / গুঞ্জনে
বেলা আমার / ফুরিয়ে গেল / কুঞ্জবনের প্রাঙ্গনে।

উপরোক্ত পর্বগুলির আক্ষরিক বিন্যাস ৩+২, কিন্তু সেই রীতি অনুকরণে যদি 'বেলা আমার'-কে 'আমার বেলা' করা হত, তবে ধ্বনি-সাযুজ্য হয়ত রক্ষা হত, কিন্তু ছন্দ মেরুদণ্ডহীন হত।

উপরোক্ত কবিতাটি পড়লে কয়েকটি ব্যাপারে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের Daffodils-য়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য অনুভূত হয়।

(২)

ছন্দজ্ঞ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 'বলাকা'-র সম্বন্ধে বলেছেন, "অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই চরম মুক্তি ঘটেছিল 'সবুজপত্র' বা 'বলাকা'-র যুগে। বলাকায় যে মুক্তক ছন্দের সন্ধান পাই তাতে কৃত্রিম বন্ধনের

সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে।" এ আবিষ্কারটি বাস্তবিকই একটি গবেষণার বস্তু। অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দের বিভিন্ন সংমিশ্রণ এতে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু কবির ছন্দচর্চ্চার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কবিতাগুলির মধ্যে বিভিন্ন পর্বের সমাবেশ এবং এক ছন্দরীতি থেকে অন্যতে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ। '১৮' সংখ্যক কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ থেকে স্বরবৃত্তে প্রবিষ্ট হয়েছে এক সাবলীল ভঙ্গিতে।

কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ :

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত কিছু বস্তুভার।

.....

ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন
ততক্ষণ
চারিদিকে নেমে নেমে আসে আবরণ ইত্যাদি

কবিতাটি চার মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। ঘোর বিষয়ী মনোভাব এবং স্থবির জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি আঁকাই কবির অভিপ্রায় এবং সে অর্থের অনুকূল ছন্দটিকে-ও শৃঙ্খল-ভারাক্রান্ত করা-ও কবির সঙ্গত মনে হয়। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য-ই তিনি এই চারমাত্রার ধরনের ছন্দের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু তার এক স্তবক পরেই স্বরবৃত্ত ধাঁচের অনুসরণে কবি ছন্দটিকে সম্পূর্ণ syllabic ও গতিশীল করে তুলেছেন :

ওগো আমি যাত্রী তাই
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।

কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে।
আমি চির / যৌবনেরে / পরাইব / মালা
হাতে মোর / তারি তো র / রণডালা

'শা-জাহান' (৭-সংখ্যক) কবিতাটিতেও এরূপ মাত্রা পরিবর্ত্তনের আরও ঘন ঘন নিদর্শন আছে।

রবীন্দ্রনাথ এক আলোচনায় বলেছেন, "যে বিরামস্থলে পৌঁছিয়ে পদ্যছন্দ অনুরূপ ভাবে পুনরাবর্ত্তন করে সেই পর্যন্ত এসে তবেই কোন্‌টা কোন ছন্দ এবং তার মাত্রার পরিমান কত তার নির্ণয় সম্ভব, মাঝখানে কোন একটা জোড়ের মুখে গণনা শেষ করা অসংগত।" একটু পরেই আবার "সব শেষে পুনরায় বলি, ছন্দে স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে সমগ্রের মাত্রা সংখ্যা, তার কলা সংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রা সংখ্যা জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পাদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদ সংখ্যাও বিচার্য।" উপরোক্ত পদ্ধতিটি 'মুক্তক'-ছন্দের প্রবর্ত্তক এবং ইংরাজী verse libre-য়ের সমগোত্রীয়। 'বলাকা'-র '১৬' এবং '৩৭' সংখ্যক কবিতাদ্বয় এরূপ পদ্ধতির উপর আধারিত। 'বলাকা'-র ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যক কবিতাগুলি অনুরূপ ভাবে-ই 'ছন্দোবদ্ধ'। এদের মাত্রা সংখ্যা এবং ঝোঁক পদ্ধতি একটি বিশিষ্ট সংখ্যার উপর পর্যবসিত নয়, বরঞ্চ কম-বেশী অসম সংখ্যক ঝোঁক এবং মাত্রার বিন্যাস ছন্দের ভিতর সামগ্রিক রূপে একটি পৌনঃপুনিক আবর্ত্তনের সৃষ্টি করে;—রবীন্দ্রনাথ একে-ই তাঁর 'প্যাটার্ণ' বলেছেন। ৩৭ সংখ্যক কবিতাটির মূলছন্দ চার মাত্রার, কিন্তু একটানা চারমাত্রার না করে

কবি তাঁর নিভুর্ল কানের সাহায্যে তাকে ২, ৩ অথবা কখনও একমাত্রিক শব্দের সঙ্গে হেরফের করে তার ছন্দে যে কবিতাটির অর্থানুকূল চাঞ্চল্যের অবতারণা করেছেন তাই লক্ষ্যণীয়। এই অংশটি বিবেচনা করা যাক :

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়.
অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য শয্যায়,
তবে এ ঘর ছাড়া সবে
অন্তরের কী-আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এর ছন্দে তার ভাবের অনুকূল একটি উত্থান-পতন আছে পংক্তিগুলি যেন কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুধাবন করে-ই চরণে চরণে ভেঙ্গে ছোট হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চম চরণে মাত্রা সংখ্যাকে আর এক পর্দা চড়ানো হয়েছে, কেননা মানুষের গ্লানি এবং লজ্জার এটা চরম পর্যায়। কিন্তু তিনি অন্তরে উপলব্ধি করছেন যে দৃপ্ত পূর্ণ যৌবনের এই নিঃস্বার্থ, নিষ্পাপ আত্মবলিদান নিরর্থক নয়, এবং তার-ই দ্যোতকরূপে উপরের যষ্ঠ পংক্তি থেকে পদে পদে মাত্রা সংযোজন করে পর্বটির শেষ পংক্তিতে একটি অনিকাম, নির্মল এবং transcendental সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন। এইরূপ উত্থান-পতনই এই কবিতাটির বিশেষত্ব।

'বলাকা'র সব কবিতাগুলি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল না, তবু তার ছন্দ-বৈচিত্র্যের বিশেষ কয়েকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেলো বলে মনে হয়।

With best compliments from :

Bengal Tools & Engineering Company (P) Ltd.

74/1A, GOLF CLUB ROAD,
CALCUTTA-700 033

SPECIALISTS IN DEEP DRAW COMPONENTS

CENTRAL LIBRARY

'মহাভারত'

(ধারাবাহিক)

পুরুষোত্তম লাল

কুন্তী

ব্যাসের মহাকাব্যের আরেকজন দৃঢ়চেতা নারী কুন্তী। তিনি গান্ধারীর তুল্য উদ্ধত না হ'লেও অনুরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিশ্চয়ই। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সতীন মাদ্রিকে সন্তান-সৃজনী মন্ত্র দিতে অসম্মত, কারণ মাদ্রি প্রথমে চাতুরীবলে যমজ অশ্বিনদ্বয়কে আবাহন ক'রে নকুল ও সহদেবের জননী হয়েছিলো। সেই হিসেবে, মন্ত্রের দ্বিতীয় আবাহনে মাদ্রি অতিক্রম ক'রে যাবে কুন্তীর তিন সন্তান [সংখ্যা], স্বতন্ত্র তিন দেবতার দ্বারা যাদের জন্ম : যুধিষ্ঠির (ধর্ম কর্তৃক), ভীম (বায়ু কর্তৃক), অর্জুন (ইন্দ্র কর্তৃক)। বর্ণাবতে পাণ্ডবদের বনবাসকাল কুন্তীর ব্যক্তিত্বে পরিচালিত হ'লেও তিনি তাঁর বুদ্ধি ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অতীব দক্ষতার সঙ্গে, ন্যূনতম আগ্রাসী মানসতায়। এতোটাই নিচু লয়ে তাঁর আচরণ যে অসতর্ক পাঠকের বোধের অতীত যে কতো অনায়াসে এবং কী অনুপম ভঙ্গিতে তিনি হ'য়ে ওঠেন মাদ্রির ও তাঁর আপন সন্তানদের সৌভাগ্য-নিয়ন্তা।

তিনটি দৃষ্টান্তে স্পষ্ট হবে তাঁর সম্পর্কে ধারণা, এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি।

দুর্যোধন পুরোচনাকে নিয়োগ করে মোমগৃহে পাণ্ডবদের জীবিত দাহনে, যে-গৃহ বর্ণাবতে পাণ্ডবদের নিমিত্ত সে বিশেষভাবে নির্মাণ করেছিলো। বিদুরের কাছে এই চক্রান্তের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, কিন্তু সময়ের কাছে স্থির থাকেন তিনি। তিনি অন্য কিছুই করেন নি, মনে হয়। কুন্তীর হাতেই ছেড়ে দেওয়া হ'লো বিষয়টি, এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে দুর্যোধনের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে বিষয়টির নিষ্পত্তির ভার। এই প্রসঙ্গে মূল পাঠ খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু ইরাবতী কার্ভে প্রতিচক্রান্তটি বয়ন করেছেন এইভাবে: "রাজপুত্রদের যোগ্য জননী রূপে কুন্তী গৃহ উন্মুক্ত রেখেছিলেন, যেখানে প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণ ও কয়েক শত দরিদ্র জনগণ তাদের আতিথ্য গ্রহণে তুষ্ট হতো। এরকম একজন ছিলো এক আদিবাসী রমণী, যে তার পাঁচ পুত্র সঙ্গে একদিন রাজপ্রাসাদে এসে সেই রাত্রিতে সেখানেই নিদ্রা যায়। পাণ্ডবেরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে পলায়ন করেন। মধ্যরাত্রিতে তাঁরা গৃহটিতে অগ্নিসংযোগ ক'রে পূর্বনির্মিত ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথে অদৃশ্য হয়। এই আখ্যানপর্বে মহাভারতের সমালোচনামূলক পাঠ্যাংশের উৎকর্ষ পাঠকের লক্ষণীয়। এখানে বলা হয়েছে, 'যেন মৃত্যুর আমন্ত্রণে সেদিন কুন্তীর গৃহে এক আদিবাসী রমণীর আগমন, আহার, মদ্যপান এবং নিদ্রা ঘটে।' পরবর্তী দুই সংস্করণে পাঠভেদ এইরকম: একটিতে আছে, 'আদিবাসী রমণী ছিলো নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং অসৎ কর্মে পুরোচনার সহচরী।' অন্যটিতে বলা হচ্ছে, 'তার প্রকৃতি ছিলো হিংস্র, এবং কুন্তীর সঙ্গে সে সখ্যের ভান করেছিলো মাত্র।' চক্রান্ত ও প্রতিচক্রান্তের দরুন আদিবাসী রমণী ও তার পুত্রদের মৃত্যু ঘটেছিলো। বস্তুত, তার অনুকূল উপস্থিতি পাণ্ডবগণকে পলায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছিলো, এবং তারা কার্যত তাই করেছিলো। ঘটনাবলীর স্বাভাবিক পারম্পর্য পরবর্তী

কথকেরা বিকৃত করেছিলেন। কারণ, তাঁরা তাঁদের নায়কদের ছয়জন নির্দোষ মানবহত্যার কলুষমুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন।" এখন প্রশ্ন: কে ঐ ছয়জন আদিবাসীকে ভোজন ও পানাহার করিয়েছিলো? পাণ্ডবভ্রাতাগণ ন'ন। মূলে বলা হয়েছে, কুন্তী। ডান্‌কানের নৃশংস হত্যার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বর্তমান দৃশ্যের, যেখানে কুন্তীর ভূমিকা উৎসাহী-অথচ-দ্বিধাগ্রস্ত লেডি ম্যাক্‌বেথের মতো। ব্যাস বলেন নি কে প্রকৃতপক্ষে রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করেছিলো। ভীম? যদি তাই হয়, তবে ম্যাক্‌বেথী ভীমকে প্ররোচিত করেছিলেন কুন্তী, যিনি প্রসব করেছিলেন বয়স্ক-সন্তান মাত্র।

কুন্তীর পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ দক্ষতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: অরণ্য মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি বহুনশ্রমে ভীম নিদারুণ ক্লান্তিতে স্থাণু হ'য়ে পড়ে। অন্যেরাও "আর এক পদক্ষেপ অগ্রসরে অসমর্থ" এটা কোনো বিশাল মহাকাব্যিক ঘটনা নয়, এবং আমারও বর্তমান সারানুবাদে এই ঘটনার উল্লেখ যদিও জরুরি মনে হয়নি, তথাপি কুন্তীর চরিত্রের একটি দিক উপস্থাপনে ঘটনাটি তাৎপর্যময়। কারণ, ঐ সংকট-মুহূর্তে কুন্তী এমন এক ভাবাবেগের আশ্রয় নেন যা মনোমতো কার্যসিদ্ধি কল্পে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় জননীদের আজও নির্ভর। তিনি আর্তনাদ শুরু করেন—নিঃসন্দেহে কপোল-দেশ দক্ষিণ করতলে চপেটাঘাত ক'রে—"হায়, আমি পাঁচ সন্তানের জননী কুন্তী, আর তাদেরই মধ্যভাগে ব'সে আমি তৃষ্ণার্ত!" তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট সিদ্ধ হ'লো: পলকের নিমেষে ভীম উঠে দাঁড়ায়—এবং বেগে ধাবিত হয়।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের প্রণয় কুন্তী কর্তৃক

অনুমোদন। এই বিষয় সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণার অবকাশ যাতে না থাকে [তাই বলা বাঞ্ছনীয় —এই মিলনে কুন্তীর অনুমোদনের কারণ এই নয় যে ভীম হিড়িম্বাকে ভালোবাসে (এক আদিবাসী রাক্ষস-সুন্দরীর প্রতি একজন আর্য পাণ্ডবের প্রণয়ের সম্ভাবনাও ক্ষীণ)— প্রকৃতপক্ষে কুন্তী ভীমকে আদেশ করেন এক রাক্ষস-সন্তান উৎপাদনের জন্যে যাতে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের পক্ষে থাকে এক শক্তিশালী মিত্রপক্ষের সমর্থন। অন্য যাই হোক্, নিশ্চিতভাবে এ এক অসাধারণ ভবিষ্যৎদৃষ্টির পরিচায়ক !

মহাকাব্যের নারীচরিত্রদের গভীরতর বিশ্লেষণের দরুন এই হ'লো কয়েকটি রেখানির্দেশ। মহাকাব্যের পুরুষ চরিত্রদের বিশ্লেষণেও অনুরূপ পদ্ধতি প্রযোজ্য। আমার আলোচ্য পাঁচজন : অর্জুন, কৃষ্ণ, শিশুপাল, দ্রোণ, বিদুর (এবং বিদুরের সঙ্গে যুধিষ্ঠির)।

ক্রমশ

(ভাষান্তর : দি. কু চ.)

কবিতার গারদে

পাগলা গারদের কবিতা। অজিতকৃষ্ণ বসু।
(ইন্দো-ওভারসীজ পাব্লিকেশনস্। তেরো টাকা।)

"এক পাগলের জবানিতে/হাজার ক্ষ্যাপার খবর শুনি।"
—সজনীকান্ত

কবিকে কেউ কেউ পাগল মনে করে থাকেন। সেদিক থেকে দেখলে অজিতকৃষ্ণ বসুর 'পাগলা গারদের কবিতা' বইটিতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই বইয়ের কবিতাগুলিতে পাগলামি হয়তো আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে সত্যকে তির্যক ভঙ্গীতে দেখার দৃষ্টি। এই তির্যকতাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। কবিতার ভাষায় ছন্দে, শব্দ প্রয়োগে, ভাবপ্রকাশের চাতুর্যে অনেক সত্য কখনো অতিরঞ্জিত হয়েছে, কখনো বা প্রতিফলিত হয়েছে দৃষ্টির বক্রতায়।

বইটি প্রথম লেখা হয়েছিল ১৩৫৬ সালে। পুনর্মুদ্রিত হল ১৩৮৯ সালে। এত দীর্ঘকাল পরেও কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হয়নি। ভাষার দিক থেকে, ভঙ্গীর দিক থেকে একটু পুরোনো মনে হবে, কিন্তু বিষয়বস্তুর বঙ্কিমতার সঙ্গে ভাষার কিঞ্চিৎ প্রাচীনতা মানিয়েছে ভালো।

'বারাঙ্গনা' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন যে শুধু পতিতারাই নয়, বেশ্যাবৃত্তি আমাদের প্রত্যেকের জীবনধারণেরই অঙ্গ।

মনে মনে গর্ব করি বুদ্ধিজীবি বলে
কর্তব্য পালন তথা উপার্জন ছলে
বিবেক বিক্রয় করি চড়ায়ে নিলামে
সাধ্যমত উচ্চতম দামে।

'চড়ায়ে নিলামে'—আমাদের রোজকার এই কাজটুকুকে বেশ্যাবৃত্তিই বলা চলে।

ঋতুবৈচিত্র্যের কথা বলতে গিয়ে কবি 'ফাল্গুনী' কবিতায় বলেছেন—

মাঘের সাথে পালিয়ে গেল শীতের কুজ্ঝটিকা ;
বসন্ত তুই আমলি সাথে, আমরা নিলেম টিকা ....
পৌষে খাওয়া হয়নি পিঠে,
স্মরণখানি তবুও মিঠে,
এই কথাটি স্মরণ রেখে যাহার খুশি ভাগুন।

'টাক মনস্তত্ত্ব' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। টাকে চুল গজাবার জন্য যে তেল মাখা হয়, সে তেল 'টাকের ওষুধ নহে, এ যে হায় টাকের পালিশ'। একেবারে ঠিক কথাটি বলা হয়েছে, ভঙ্গীটি কিন্তু তদ্রূপ নয়।

'এই করেছ ভালো নিঠুর' কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তিটিকে কত উদ্ভট সিচুয়েশনে কল্পনা করেছেন কবি। গানবাজনার আসরে তবলায় চাঁটি মারা থেকে শুরু করে রেকর্ডে পিন ফোটানো পর্যন্ত নিষ্ঠুরতার প্রয়োজনকে তুলে ধরেছেন অকুণ্ঠ। কবিতা শেষ করেছেন এই বলে—

এ তথ্য থেকে, ওরে উন্মাদ, কি তত্ত্ব হল শেখা ?

কি শেখা হল তা বলেননি, বলেননি বলেই নামকরণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরো বেশি।

'জাতক' কবিতার বিদ্রূপটি তীক্ষ্ণ—হয়তো বা একটু বেশি তীক্ষ্ণ। নবজাতকের কোষ্ঠি বিচার করে যখন তার সৌভাগ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন জ্যোতিষী, তখন অকস্মাৎ কবি তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন সমাজের নিম্নস্তরে, অথবা মানবেতর প্রাণীর মিছিলে—

ঠিক সেই ক্ষণে
ধরণীর নানাস্থানে প্রকাশ্যে অথবা সঙ্গোপনে
জন্ম নিল অগণিত সাপ, চিল, বাদুর, ব্যাঙাচী
বস্তিতে মা হল কত পাঁচী···
বাবা হল কাদের কশাই আর মেছোবাজারের কাল্লু মিয়া···

জ্যোতিষ এদের কথা বলে কিনা জানা যায় না।

এই বইতে দু-একটি কবিতা কিন্তু সহসা বেদনার সুর লাগিয়েছে, যেমন 'মনে রেখো' কবিতাটি। গ্রন্থের সুরের সঙ্গে এদের মিল হয়নি, এই ধরনের রচনায় গ্রন্থের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ। 'অ্যানড্রোক্লিস ও সিংহ' নামের কাব্যনাট্যটি আগাগোড়াই হালকা চালে লেখা। কথোপকথনের সুর কবিতাটিকে টানটান করে রেখেছে সবসময়। ভাষাটিতে সংলাপের মেজাজ এসেছে সর্বত্র।

সজনীকান্ত দাসের 'স্বীকৃতি' কবিতাটি রয়েছে মুখবন্ধ হিসেবে। একহিসেবে এটিতে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনযাত্রার যত কাণ্ডকারখানা, তার অনেকটাই পাগলের চোখে দেখতে আমাদের ইচ্ছে করে, এই বইতে আমাদের সেই ইচ্ছেই মিটেছে। সেই সঙ্গে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে,

CENTRAL LIBRARY

হীনযান

যে কোন ঘটনাকে কিঞ্চিৎ পৃথক করে বলতে পারাই কবির শক্তির পরিচয়। তার মধ্যে আছে বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, এবং মজা, কিন্তু ঈর্ষা নেই। এটি একটি বড়ো কথা।

পিনাকী ভাদুড়ী

একই সময়ে চার দশকের চার কবি

প্রথম পলি শেষ পাথর : অরুণ মিত্র (করুণা প্রকাশনী। ছয় টাকা।)

কাব্যগ্রন্থের নামের ভিতরেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে কবির বয়সের অনুগামী ব্যর্থতাবোধ। "সময় আর বেশী নেই" কিংবা "শেষ গাড়িই ছেড়ে গেল বুঝি" অথবা "সমস্তক্ষণ অন্য গ্রহ/চক্রবৎ মাথার উপরে অবিরত"—এমন সব অবিরল উচ্চারণের আন্তরিকতায় ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে সহজেই মিশেছে প্রগাঢ় বিষণ্ণতাবোধ। অথচ লক্ষ না ক'রে উপায় নেই যে কী অনুচ্চ, শান্ত স্বরে সেই বেদনার ধ্বনি লেগেছে কবিতাগুলোয়। চূড়ান্ত উদাহরণ 'এইবার চলো' কবিতাটি।

ভানলার ধার ঘেঁসে স্রোত।
তুমি এক সময় চোখ তুলে দেখো
ভরা চাঁদ এসেছে ভাসতে ভাসতে,
তোমার সারা শরীরে তখন টান লাগে,

—জীবনসায়াহ্নে ক্ষণকালের জন্য অতীতের যৌবনসন্ধার অনুভব সঞ্চারিত হ'য়ে যেভাবে আবার বিলীন হয় মহাকাল স্রোতে, "আচমকা ট্রেনের" শব্দে "দেয়ালগুলো টাল খায়/একটা ছবি খসে, দুটো ছবি, তিনটে···" ব'লে যেভাবে কবি ইঙ্গিত দিয়েছেন জীবনের পরিসমাপ্তির, তা এক অনন্য-সাধারণ কাব্যিক কারুকৃতি। এবং শেষ পংক্তি—"এইবার চলো, যাওয়া যাক।"—পাঠককে কোনো তীব্র আঘাতে দীর্ণ করে না, বরং কথকের শান্ত প্রস্থানে পাঠক বিষণ্ণ, বিনত।

প্রসঙ্গত অনুধাবনযোগ্য, আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত কিছু কবিতায় কবির ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে জড়িত এক ভিন্ন অনুষঙ্গ—কবিতার মধ্য দিয়ে শোষণহীন, আলোকোজ্জ্বল এক সমাজ গড়ার স্বপ্ন—"...হেঁকে বলেছিলাম কী সব রত্ন দেখে যাও এরপরও কি অন্ধকার থাকে? সেগুলো এক দমকায় রাস্তায় প'ড়ে গেল। তাদের বর্ণ নেই আলো নেই তারা এখন পাথরের ভাই।" ('শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম')। প্রশংসনীয় এই সৎ স্বীকারোক্তি। আবার, তাঁর এককালের বিশ্বাসের দোসরদের চরিত্রবদলের প্রতি চাপা বিদ্রূপের সুরও বেজেছে 'ভিড়ের মধ্যে' কবিতায়।

কিছু কবিতা যতো শব্দময় ততো অর্থময় হয় নি। অনেক কবিতায় পরিবেশ সৃজনে স্যুররিয়ালিস্ট ভঙ্গি লক্ষণীয় হলেও বেশি-বেশি শব্দের সমাবেশে তাদের এফেক্ট অনেক সময়ই ব্যাহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, গ্রন্থখানি যথেষ্ট উপভোগ্য।

পদ্মের ভিতর আলো : শান্তিকুমার ঘোষ। (কবিতা প্রকাশনী। পাঁচ টাকা।)

যেখানে গেছেন, যা কিছু দেখেছেন, যখন-তখন, তাই নিয়েই যেন শান্তিকুমার ঘোষ লিখে ফেলেছেন আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি। অনেকগুলি কবিতাকে তো সরাসরি ভ্রমণ-পর্যায়ের কবিতা ব'লে ফেলা যায়, অবশ্যই ভ্রমণ-কবিতা নয় তাই ব'লে। কিছু কবিতার শিরোনামই স্থানচিহ্নিত : নিউ ইয়র্ক—১, নিউ ইয়র্ক—৪, নিউ ইয়র্ক—৩, সানফ্রান্সিস্কো, টাইম স্কোয়ার, বুডাপেষ্ট, প্রাগ, শান্তিনিকেতন—১, শান্তিনিকেতন—২, কালিম্পং ১৩৮০, জোড়াসাঁকো।— কিন্তু কবিতাগুলির scenic effect আধুনিক

কবিতায় কোনো গূঢ় ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয় নি। সুবিখ্যাত আধুনিক অষ্ট্রেলীয় [মহিলা] কবি জুডিথ রাইট-এর কবিতায় যেমন দেখা যায় "নিউ ইংল্যাণ্ড" ভূখণ্ডের অসাধারণ পুনর্সৃষ্টিতে দীপ্যমান, বর্তমান বাঙালি কবির রচনায় অন্তত তাঁর স্বদেশের স্থানগুলিও কিন্তু সেরকম কোনো নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে নি।

আধুনিক জীবন ও কবিতার সব ভার মুক্ত আলোচা গ্রন্থের কবিতাগুলিতে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক আঘ্রাণ। অধিকাংশ কবিতাই নিসর্গমূলক এবং নিসর্গ-কবিতা রচনায় চল্লিশ দশকের এই কবি দক্ষতার ছাপ রাখলেও আজ আর তার কোনো গুরুত্ব আছে কি? তাঁর নিজের জীবনে হয়তো এদের মূল্য আছে, কিন্তু সাম্প্রতিক সাহিত্যে কিংবা তার পাঠকদের কাছে নয়।

কয়েকটি রচনায় কিছু সুন্দর কবিতার মুহূর্ত সৃষ্টি হ'লেও তাদের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এর একটি কারণ বর্ণনাবাহুল্য। কখনো কবিতার লক্ষ্যবিন্দু এতো দ্রুত ছুঁয়ে ফেলেছেন তিনি যে সেই রচনার দীর্ঘ অবশিষ্টাংশ অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় থেকে গেছে। যেমন, 'স্কেইট চলে' কবিতাটি—"পুরানো তুষারের উপর নতুন বরফ"-এর অবতরণ-দৃশ্য সুন্দর বিধৃত হয়েছে, এবং সেই বরফ-নায়কের গতিকে লেখক অদ্ভুত সংস্থাপন করেছিলেন শিল্প ও শিল্পীর ভূমিকায়, কিন্তু মাঝপথেই (পাঠককে ধরিয়ে দেবার জন্যে ?) যেইমাত্র বলতে শুরু করলেন : "ওকি গতির সংগীত, নাচের ঘূর্ণি/কিম্বা জীবনকে-ফিরে-পাওয়া শিল্পের নির্মাণে।"— তখনই নির্মাণ পর্যবসিত হ'লো ভাষণে।

তবুও, এক ধরনের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ছাপ সংকলন-টিতে স্পষ্ট।

উর্বির আহ্লাদ ছেড়ে : পার্থসারথি চৌধুরী। (আবর্ত প্রকাশনী। দুই টাকা।)

"নিয়মিত বেশবাস উর্বির আহ্লাদ" ছেড়ে, কোলাহলময় নগর-জীবনের কৃত্রিমতা ভেদ ক'রে কবি এসে দাঁড়িয়েছেন নিরাবরণ সত্যের মুখোমুখি, কখনো প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়ায়, কখনো বা একান্তে প্রকৃত নিজের কাছে। ষোলোটি কবিতার সংকলন আলোচ্য পুস্তিকা সম্পর্কে যে-কথা সর্বাগ্রে বলার তা হ'লো এই যে, কবিতা-গুলিতে সামান্যতম ফাঁকি নেই—বিষয়বস্তু যেমন সুসংগ্রথিত, প্রকাশ-ভঙ্গিতে তেমনি নিষ্ঠা ও সুশিক্ষার ছাপ স্পষ্ট।

পঞ্চাশ দশকের এই কবি তাঁর পূর্বসূরী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেনকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর প্রয়োজনে। সুধীন্দ্রিয় ধরনে ভারি ওজনের শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারে এবং দীর্ঘমাত্রিক গম্ভীর ছন্দের সঙ্গে লেগেছে সমর সেনের মেজাজ, আর তার ফলে প্রত্যেকটি কবিতা সুখপাঠ্যতায় চমৎকার আবৃত্তিযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। দু-চারটি পংক্তিমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হ'লো :

বৃক্ষশিরে আন্দোলিত অয়স্কান্ত প্রত্যহের দিব্য দেহ ঝুলা।
('ইতিহাস')

মূর্খেরা মেধার অহঙ্কারে
বিদ্বেষ উঁচিয়ে রাখে, হাঁক পাড়ে
এরে ওরে পক্ষে আর প্রতিপক্ষে
দাসত্বের বন্ধনে জড়ায়।
.....
ডেকেছিলে যে আহবে
অধর্মের কুখ্যাত সংগ্রাম
ভূমিতলে অস্ত্র রাখিলাম। ('সংবরণ')

শোকের বিহ্বল আঁখি রমণীয় মুগ্ধ মরকত।

('কল্পান্তর')

দেহ ভরে দিয়েছিলে কণ্টকিত পুলকের মদগন্ধ রেণু,
মনে এক দিগন্তর বৈরাগ্যের বল। ('নির্বাচন')

অবশ্য কবিতার বক্তব্যে কোনোই সাদৃশ্য নেই উক্ত দুই কবির রচনার সঙ্গে।

আগেই বলার যে, শব্দ এবং ছন্দের আশ্রয়ে দৃশ্য নির্মিতির দিকে পার্থসারথির এতোটাই প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলতে গিয়েও আগেভাগে বহির্জগতের একটি বর্ণনা করে নেন তিনি। আর সেই বর্ণনার বেশীর ভাগ উপকরণই প্রকৃতি, বিশেষত বাংলার পল্লীপ্রকৃতি। গ্রামবাংলার প্রতি কবির এতোটাই দুর্নিবার আকর্ষণ পরিস্ফুট যে তার জল-হাওয়া-মাটি-গন্ধ কবিতাকে কেবল স্নিগ্ধ-ই করে নি, বরং মনে হওয়াও অসঙ্গত নয় যে আলোচ্য সংকলনের কবিতাগুলি লেখার জন্যে বোধ হয় তাঁকে গ্রামে চ'লে যেতে হয়েছিলো! কৃত্রিম জীবন সভ্যতা ও নগরমন্যতাকে ধিক্কার জানাতে সমর সেনের সঙ্গে এখানেই পার্থসারথির মৌল প্রভেদ। কিন্তু সুখের বিষয়, একটি কবিতাও পল্লী অথবা প্রকৃতি-বিষয়ক নয়, এবং মুহূর্তের জন্যেও কোনোভাবেই গ্রাম্যতার স্পর্শ লাগে নি। এখানেই কবিতাগুলির এবং পার্থসারথির চ্যালেঞ্জ।

ভুমধ্যসাগর : দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। (লিম্যাগ্‌স্। এক টাকা।)

বাইশটি রচনা নিয়ে এক ফর্মার এই পুস্তিকা। টুকরো টুকরো

এক-একটা অনুভূতির প্রকাশ এক-একটা কবিতা। কিন্তু সে'সব অনুভূতির যোগফল খুব বেশি কিছু এখনো নয়—কবির জীবন-বীক্ষার কোনো রূপ এখনো দানা বাঁধে নি।

উপমা এবং চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবির মনোযোগ লক্ষণীয়। তবে বেশি কথার চাপে কখনো চিত্রকল্পের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে গেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে গিয়ে কবি যদি কবিতার অভিজ্ঞতার দিকে নজর রাখতেন তাহ'লে কিছু রচনা আরো সুন্দর হতে পারতো। খুব সুন্দর হয়েছে 'বনগাঁয়' কবিতাটি।—নয় লাইনের কবিতায় যৌনতার গ্রাম্যতা যেভাবে সংস্থায়িত হয়ে উঠেছে তা এই সত্তর দশকের তরুণ কবির তুলনা-হীন মুন্সীয়ানা। (বনগাঁয়ের লোকজন, অসুত মেয়েরা, বিদ্রোহ করবে না তো ?)

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

---

৩৩ ডি শ্রীমোহন লেন, কলকাতা-৭০০০২৬ থেকে সুভাষ ঘোষাল কর্তৃক প্রকাশিত। গ্র্যাণ্ড সাপ্লাই কোম্পানী, কল-৬১ থেকে মুদ্রিত।

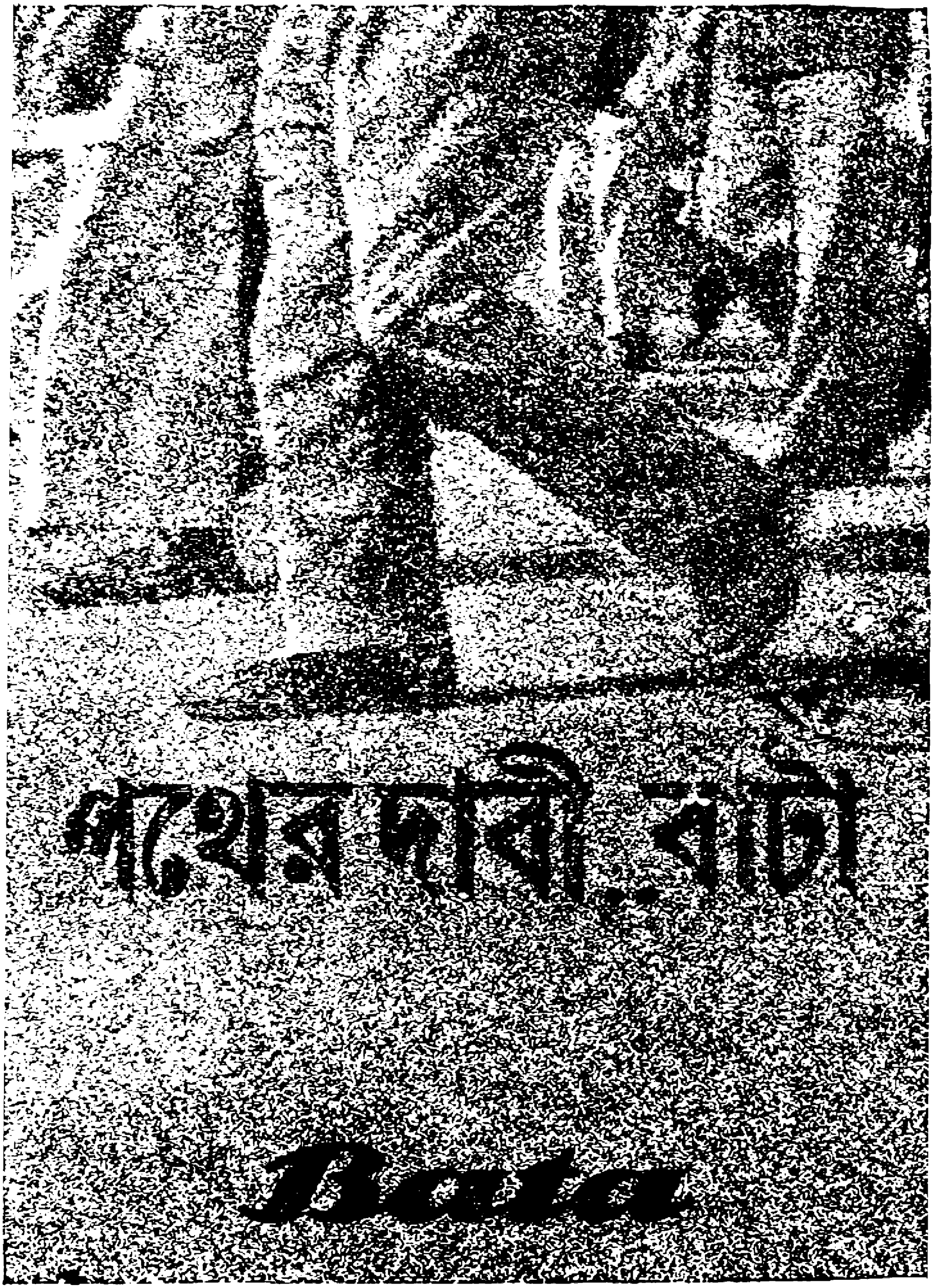
Bonus

আশ্বিন, ১৩৯০ **হীনযান** সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

সাহিত্য-সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৭ বছর ৪ সংকলন

'হীনযান'-এর অতীত পৃষ্ঠা থেকে — ১

রাম ও চারণেরা : রামায়ণে এপিকস্মৃতি/রবের আঁতোয়ান ১

আর্নল্ড টয়েনবি : "ইতিহাস অন্বীক্ষা"/দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৯

কবি নীলিমা দেবীকে জওহরলাল নেহরুর চিঠি

1—26

কবিতা : ২২ আলোক সরকার কবিতা সিংহ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত পার্থসারথি চৌধুরী অমিতাভ গুপ্ত সুরজিৎ ঘোষ

৬২ সুভাষ ঘোষাল দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ : ৩৬ 'বলাকা'র ছন্দ প্রসঙ্গে/নীলরতন সেন

৬৬ 'মহাভারত'/পুরুষোত্তম লাল

৭০ নগরসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও সি. এম. ডি. এ/স্বপন ভট্টাচার্য

স্মৃতিচারণ : ৫২ অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

সমালোচনা : ৩১ ভাঙা-গড়ার সংকটে ইয়োনেস্কো/দিলীপকুমার চক্রবর্তী

৭৭ সাহিত্য ও সংগীতজগতের মাঝখানে সেতু/শ্যামশ্রী লাল

সম্পাদনা : **সুভাষ ঘোষাল**

প্রচ্ছদ : **মৃণাল ঘোষ**

ছ' টাকা

CENTRAL LIBRARY

এক শুভার্থীর শুভ্র শুভেচ্ছা

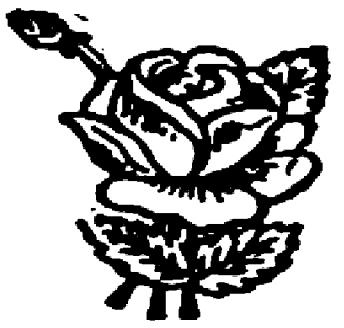

"সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক। কিন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দুই-একজনা।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

CENTRAL LIBRARY

Space Donated By :

A Well Wisher

"A few shall see what none yet understands ;
God shall grow up while wise men talk and sleep ;
For man shall not know the coming till its hour,
And belief shall be not till the work is done"

—Sri Aurobindo

দাও ফিরে সে অরণ্য

প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সুস্থ জীবনের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রক্ষার জন্য যেখানে অরণ্যের অনুপাত হওয়া উচিত শতকরা ৩৩ ভাগ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ ১০ শতাংশ। বনভূমির পরিমাণের সঙ্গে বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয়, আবহাওয়ার আর্দ্রতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত। নির্বিচারে বন ধ্বংস করার ফলে আমাদের দেশে যেসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আছে খরা, বন্যা এবং সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আজ প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বনসৃজন।

এদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারী প্রচেষ্টায় বনভূমি সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন কাঠের চাহিদা মেটাবার জন্য সমাজভিত্তিক বনসৃজনের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় জনসাধারণেরই ভূমিকা প্রধান। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ, স্থানীয় ক্লাব বা সংগঠন, বিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ নিজ পতিত জমিতে, খাল ও নদী-নালার ধারে, গ্রামের রাস্তার পাশে কিংবা পল্লীর প্রান্তরে বৃক্ষ রোপণ করে একদিকে যেমন দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন তেমনি বাড়তি আর্থিক উপার্জন করতে পারেন। কারণ এভাবে সৃষ্ট বনজ সম্পদ হবে জমির মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও বিক্রয় করা যাবে। এই কাজে জনসাধারণের উদ্যোগকে সার্থক করে তোলার জন্য সরকারের বন বিভাগ গাছের চারা, সার ও পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এজন্য স্থানীয় বনবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিশ্ব অর্থভাণ্ডারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-ভিত্তিক বনসৃজনের এক ব্যাপক-প্রকল্প রূপায়ণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকার চাষের, অনুপযুক্ত পতিত জমিতে এই প্রকল্পের সাহায্যে বনজ সম্পদ সৃষ্টির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

বনবিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মী এবং জনসাধারণের যৌথ প্রয়াসে সার্থক হোক সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প। অরণ্য সম্পদে ভরে উঠুক পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ প্রান্তর, বৃক্ষের আবরণে আচ্ছাদিত হোক নগ্ন ভূমি, আর বন্ধ্যা মৃত্তিকা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠুক।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের নীতিতে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষাখাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ টাকা ব্যয় হবে এই বৎসর, প্রায় চারশ আঠার কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকার গত ৬ বৎসরে ৪,৬০০ প্রাথমিক ও ১৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বাহাত্তর লক্ষ শিশু অর্থাৎ ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের তিরানব্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। এছাড়া যেসব শিশুকে এখনও পর্যন্ত প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থায় আনা যায়নি তাদের আংশিক সময়ের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮২।৮৩ সালে এক লক্ষ ষাট হাজার শিশুকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাব্বিশ লক্ষাধিক শিশুকে 'পুষ্টি কর্মসূচী'র আওতায় আনা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ।

আদিবাসী শিশুদের জন্য চারশ পঁচাশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন লক্ষ আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তিদান প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে।

নারী শিক্ষা এবং তফসিলী ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কলেজীয় শিক্ষা প্রসারের মূল ঝোঁকও অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে গণশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা

কলকাতা

যে যাই বলুন কলকাতা শব্দটাই মনে একটা বিশেষ অনুভূতি আনে।
কলকাতা মানেই কৃষ্টি, সৌজন্যতাবোধ, শালীনতা ও সচেতনতা।
প্রায় তিন শ বছরের এই শহরে মানুষ এসেছেন স্রোতের মত, আজও আসছেন পাশাপাশি রাজ্যগুলি থেকে।
স্বাধীনতার পুণ্য প্রভাতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন। বছরের পর বছর ধরে এই উদ্বাস্তু স্রোতকে কলকাতা মহানগরী বক্ষে ধারণ করেছে, মহানগরীর পরিধি হয়েছে বিস্তৃত।
পুরসভার সামর্থ্যে, পুরসেবার উপাচারে চাপ পড়েছে প্রচণ্ড ভাবে।
অতীতে এমনকি স্বাধীনতার পরও, কলকাতার উন্নয়নের কথা তেমন করে ভাবা হয়নি। ভাগ্য হাসি কলকাতার পুরসভার। কলকাতার ভবিষ্যৎ ভাবনায় এই বাস্তবকে ভুলে গেলে চলবে না।
আজ নতুন ভাবে, নতুন উদ্যোগে, নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে কলকাতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য। কলকাতা পুরসভা জনগণের সহযোগিতায় পুরসেবার কাজে নিজেকে নতুনভাবে উৎসর্গ করছে।

কলিকাতা পুরসভা

মহাপুজার নৈবেদ্যে হোক
সমৃদ্ধির আবাহন

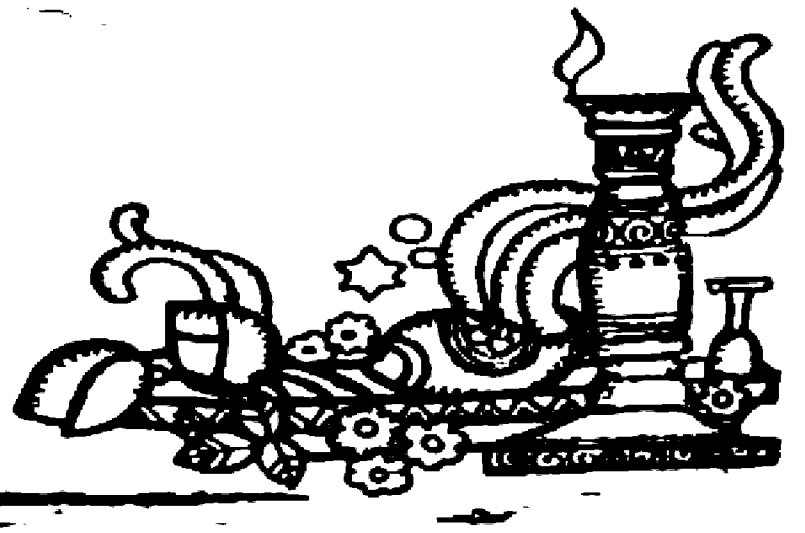

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

naa-UBI-8388

॥ সি. এম. ডি. এ কি কি করে ॥

মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ১ কোটি ৩ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চলাচলের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, সাবওয়ে। বড় রাস্তা ইত্যাদি বানানো হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা-নর্দমা খুঁড়ে জল-ময়তার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে। মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলীর ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনটি জায়গায় নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এছাড়া সি. এম. ডি. এ নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, বর্তমান স্কুলগুলির সংস্কার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, উদ্যান এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন গুগ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসনের কাজ কিছু কিছু করে থাকেন। গত দশ বছরে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। সব কিছু জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসরি লিখুন জনসংযোগ বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ) ৩-এ অক্‌ল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭।

আধুনিক ফ্যাসান বলতেই

ত ন্তু জ

বাংলার তাঁতের কাপড়

আকর্ষণীয় রূপ, মসৃন বুনন, উজ্জল রঙ, সঠিক মাপ আর সবার উপর নতুন নতুন চটকদার ডিজাইন ও ন্যায্য দাম

শাড়ী, ছাপা শাড়ী (সুতী এবং সিল্ক), ধুতী বিছানার চাদর, বিছানার ঢাকা এবং গৃহসজ্জার অন্যান্য দ্রব্যাদি।

এ ছাড়াও বিশেষ আকর্ষন—"পলিয়েষ্টার সুটিং ও শার্টিং"

॥ জনতা কাপড় তন্তুজ বিপনীতে পাওয়া যায় ॥

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

নগর কার্যালয় : ৪৫, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭২

Let the buds of your hopes and aspirations blossom under the surest protection of Peerless.

Estd.1932

The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.

Regd. Office : Peerless Bhavan
3, Esplanade East, Calcutta-700 069

India's largest non-banking Savings Company

PRASA/PGF-84/83

CENTRAL LIBRARY

JADAVPUR UNIVERSITY PUBLICATIONS

CALCUTTA-700 032

BENGALI

কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্প-বিচার —ডঃ হৃষীকেশ বসু ১৫ টাকা

কাল্পনিক সংবদন —ডঃ মদনমোহন গোস্বামী ৫ টাকা

রাজকোট রাজপথ রাজঘাট (গান্ধী-জীবনী ও জীবনভাষ্য) —ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী ৪ টাকা

আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ সঙ্কলন —শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য ৮ টাকা

রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার—ডাঃ জটাধারী মালাকার ২০ টাকা

ভার্জিল_ঈনীড—হৃষীকেশ বসু ও রবের আঁতোয়ান, ২০ টাকা

SANSKRIT

Anviksa : Vol I to Vol VII
Edited by—Ramaranjan Mukherjee, Dr. S. Goswami Rs. 5·00 each copy.

ENGLISH

W. B. Yeats : An Indian Approach, by Dr. Naresh Guha Rs. 15·00

Shakespeare : A Book of Homage, Edited by Prof. S. C. Sen Gupta, Rs. 10·00

The Idea of Revenge in Shakespeare by Dr. Jagannath Chakravorty Rs. 20·00

Shakespeare's treatment of his Sources in the Comedies by D. C. Biswas Rs. 20·00

Essays and Studies Vol. I & II
Edited by S. C. Sengupta Dr. Sisir Chatterjee, Rs. 5 00 each copy

Essays and Studies Vol. III :
Edited by Dr. Jagannath Chakravorty. Rs. 50·00

Shakespeare Appreciations
by Prof. P. K. Guha Rs. 20 00

HISTORY

Journal of History Vol. II & III, Editor—S. K. Maity, Rs. 20 00 each copy

সম্পাদকীয়

স্মৃতিই প্রকৃত সমিধ

২৫-তম সংখ্যার ভূমিকা লেখা হবে, এ ভাবা অসম্ভব ছিলো ১৯৭৩-এ, যখন প্রথম ভাবা হয়েছিলো 'হীনযান'-এর কথা। এমন-কি গভীর শুভার্থীকেও বলতে শোনা গেছে—বড়োজোর সাত-আটটা সংখ্যা। তারপর তো বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ চোখের সামনে মৃত্যু হয়েছে অনেক অঙ্কুরের, অনেক উদ্যোগের এবং পরিবেশ এতোই বিরূপ যে নির্দ্বিধায় বলতে পারা গেছে, সাহিত্য পত্রিকা স্বল্পায়ু। ১৯৭৪-১৯৮৩ এই সময়টা মানুষের গড় আয়ুর তুলনায় কম সময় নয়। এই পর্বে নদী হয়তো বাধায় সমাচ্ছন্ন হয়েছে, কিন্তু তার প্রবাহ লুপ্ত না হয়ে শেষ পর্যন্ত মেলে ধরেছে সহাস্য অস্তিত্ব। আজ আমরা স্মরণ করবো আমাদের প্রথম সম্পাদকীয় এবং দু-একটি সম্পাদকীয়ের দু-একটি ছত্র ; কেননা স্মৃতিই প্রকৃত সমিধ।

"পত্রিকা যদি অনর্থক শব্দপিণ্ড হয়, চতুর্দিকে কোনদিনও তার অভাব ছিলো না। তার অভাব থাকতে পারে না যদি তাকে দলায় মালিন্য বলা যায়। এমন কি যদি হয় প্রতিষ্ঠা নামক বিবর্ণ রূপ, সে বিরাজমান। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে পত্রিকা এ-সব কোন কিছুই নয়। বরং এ-সব ক্রমে ক্রমে তার জন্মের পটভূমি হয়ে ওঠে।"—এই ছিলো মাঠে নামার কারণ। "তখন এই শতাব্দী শেষ হবার ১৬ বছর বাকী। কলকাতা-নামক মানসচেতনপ্রতিভায় পৌষের শীত যীশুমুহূর্ত পেরিয়ে জানুয়ারীর পূর্বাশা সদ্য ছুঁয়েছে। ঠিক এই কান্তিপর্বে জন্ম নিয়েছিলো চার

গেরুয়া অক্ষরে ৩৪ পৃষ্ঠার একটি অনুরাগ—'হীনযান'।" মাঠে নামার কিছু দিন বাদেই আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম—"আজ শিল্পসাহিত্যের আবহাওয়া এতোটা নিম্নবিত্ত ও বীভৎসরৌদ্র যে আলোর বদলে হাজির হয়েছে আলোকযন্ত্র, যার যাদুদণ্ডে বিদূষককে ঠিক বিদ্বানের মতো দেখায়; চিৎকারকে মনে হয় মন্ত্রোচ্চারণ। এই দণ্ড চুম্বনরত জনগণ থেকে বেরিয়ে আসা একজন মানুষও আমাদের প্রেরণা। আমরা জানি তিনি মূলে অসংখ্য এবং সহস্রচোখ। তার সামনে দিয়ে প্যারেডের রোদ্দুরে আরো সম্প্রসারিত হোক আমাদের গান।" গানের কতোটা সম্প্রসারণ হয়েছে সে বিচারের দায়িত্ব চিরকালই ভাবীকালের। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কমলকুমার মজুমদারের কথা যিনি "আজীবন 'লিটল ম্যাগাজিন'-এ তাঁর সৌচাক বানালেন। মনে রাখার ঘটনা, যখন আমাদের চোখ দেখে-দেখে অভ্যস্ত, ছোট পত্রিকার মঙ্গলঘটটিকে সন্তর্পণে প্রণাম ক'রেও খুব চেনা-অচেনা গুণীজনেরা আদতে সর্বঘটে বিরাজমান হবার ক্ষমতায় প্রণম্য। এদিক থেকে আশ্চর্য অদ্বৈতবাদী কমলকুমার নির্ঘাত বুঝেছিলেন রাসনৃত্য কেবলমাত্র অচ্যুতের এবং শতসহস্র দীন পড়ুয়ার বদলে কতিপয় পাঠকের শতসহস্র দৃষ্টিপাত থেকেই বেরিয়ে আসে লেখকের প্রার্থিত চুম্বন।" পুরোনো দিনের এইসব বিশ্বাসের সুর যাতে কেটে না যায় তার জন্য আমাদের প্রয়াস আজ আরও পার্থিব হয়েছে, কারণ দিনও ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে আরও বেশী দীন, আরও বেশী স্বপ্নের অনুপযোগী।

গত সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম, দিলীপকুমার গুপ্তকে লেখা নেহরুর **The Discovery of India** বিষয়ক এক গুচ্ছ চিঠি আমরা প্রকাশ করবো। আমাদের বিজ্ঞপ্তির মধ্যে যে ভুলটি ছিলো তা হলো এই পত্রগুচ্ছ দিলীপকুমার গুপ্তকে নয়, সিগনেটের নেপথ্যশক্তি কবি নীলিমা দেবীকে লেখা। আশা করি সজাগ

পাঠকের মার্জনা পাবো। শুধু পত্রগুচ্ছ প্রদান করে নয়, এই সংখ্যার নানারকম প্রেরণাদাত্রী হয়ে শ্রীমতী নন্দিনী গুপ্ত যে উদাহরণ রাখলেন তা এই স্বার্থঘোর যুগে উজ্জ্বল হয়ে রইলো। প্রথমে আমাদের ইচ্ছে ছিলো এই সংখ্যাটিকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করবো। প্রথম পর্বে থাকবে পত্রগুচ্ছ ; দ্বিতীয় পর্ব ধারণ করবে পত্রিকার কিছু উজ্জ্বল পৃষ্ঠার পুনর্মুদ্রণ। কিছু বাধা খুব বলবান হওয়ায় আমরা দ্বিতীয় পর্বে পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হলাম। এই পর্বে দুটি বিশেষ লেখা পুনর্মুদ্রিত হলো এবং তার পাশাপাশি থাকলো কিছু নতুন লেখার মুদ্রণ। পরবর্তী সংখ্যা থেকে একটি ক'রে লেখা প্রতি সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। যাঁরা এতোদিন ধ'রে আমাদের প্রাণিত রেখেছেন সেই লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপক, শিল্পী ও বন্ধুদের আজ কৃতজ্ঞের সাশ্রুনেত্রে স্মরণ করছি এবং বিশ্বাস রাখছি, যাঁরা এতোদিন ধ'রে বৈরীর ভূমিকা পালন করে এসেছেন, আগামী দিনে তাঁদের কল্যাণঘেরা দক্ষিণমুখ আমরা খুঁজে নিতে পারবো।

সুভাষ ঘোষাল

Letters of
Jawaharlal Nehru to Nilima Devi

CENTRAL LIBRARY

Kashmir
23.7.45

My dear Nilima,

I am sorry I have been unable to write to you since my return. I am naturally anxious to have my book published as early as possible. The book is quite except that I should like to revise the type-script—about a quarter of it has been typed. The rest can be typed in a fortnight. This has been delayed because of my constant touring—I am now trekking in Kashmir with Indira and am likely to remain here for another 3 weeks. On my return to Allahabad I shall expedite this business. As I know that I would be too busy to look after the matter I asked Raja Hutheesing to deal with it and I believe he has written to you. Normally one does not change publishers, but in this present case I should like to entrust your Signet Press with the publishing if I am satisfied that it would do it efficiently & in a businesslike way. I am tired of the slovenly & unbusinesslike method of Indian publishers. This is of course no reflection on you as I have no experience of your press.

The book will in due course be published in England and America but I want this Indian edition to come out first and long before two others. This will give free field to this Indian edition in the Indian market for a considerable period. But I do not want any arrangement to come in the way of an English edition. I have trouble about this before and I want to avoid it. Practically speaking, the English editions, when it comes out, will not conflict or overlap with the Indian

editions—chiefly because the latter will have a long start and will capture the first flash of purchasers. For some years there will also be difficulty in English books coming to India in any large members. Still I want to make it quite clear that I reserve the right to come to any arrangements with the English publishers which I consider proper. Naturally I shall see to it that my Indian publishers do not suffer.

Raja told me that he had suggested to you that any arrangement made with your press should be at first for the first edition (or more) for 10000 copies. This does not mean that subsequent editions will be necessarily on a different basis. But it is better to confine the arrangement in this way & to revise it later.

The book will be about 4/5th the size of my auto-biography—that is about 500 pages of that size. No illustrations. You suggested, I think, a royalty of 20%. I am content with 15% which I think is fair, provided the price is reasonably fixed and as low as is possible under the circumstances. The question of royalty may be reconsidered for later editions.

I am sure that you will take pains to bring out a well got up book. But I do not want the artistry to add needlessly to the size or price of the book. The usual wartime restrictions to avoid waste of paper should be followed.

I should like to be assured about the resources of the Signet Press and the probable time you will take

it bringing it out. Raja I believe has already tried to arrange for a permit for the paper necssary for the printing of the book.

I should like to hear from you directly on this subject—write to me to Allahabad—but you had better deal with Raja in order to save time.

I hope you are well.

Love

Yours affectionately

Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Anand Bhawan

Allahabad, September 3, 1945

Shrimati Nilima Guha Thakurta,

The Signet Press

10-2, Elgin Road,

Calcutta.

My dear Nilima,

Your letter of the 6th August reached me in Kashmir. I have get rather mixed up with my letters owing to constant travelling. Before I leave Allahabad again—and I am leaving in anothar 5 days—I want to fix up this question of the publication of my new book. I hate delay and there has been delay enough already, chiefly because of me. Meanwhile I am pestered by a host of publishers who offer fancy terms to me and have even tried to bribe my Secretary :

I understand from Raja that he did not approve of the copyright being taken away from the author. I think he is right and even in England now I am proceeding on these lines. This will not injure your interests in any way and it is the right course from the author's point of view.

I have not seen your draft for an agreement, but Raja has sent me his draft which you must have received from him. In this I have two suggestions to make. The price as suggested by you in one of your letters was I think Rs. 9/8/-. I am aggreeable to this. Secondly, you need not pay me advance royalties. Both these suggestions are in your favour.

As for the royalties they will be, as you state, 15% for the first 5000 and 20% thereafter.

There is no other major matter for consideration. The agreement can be drawn up on these lines. Meanwhile you can write and express your approval of these terms and start work on the book. Uufortunately I have had no time to get the whole book typed. This will be done soon. I hope to send you, within a few days, about a quarter or more of the manuscript or typescript. Please expedite the printing etc.

I should like to see and pass the final proofs. Not the earlier ones unless you consider this necessary.

As the book is going to be translated into various Indian languages and I shall not have enough typed copies

for them, I should like you to send me a number of proof copies for this purpose to avoid delay. I might require 10 such copies.

As regards the Bengali translation I am agreeable to your arranging this. Author's royalty 10%.

As I have told you the book will be published also in England and America but that will inevitably take a longer time.

I expect to leave Allahabad on the 8th night—to be in Bombay on the 11th, then Poona and again in Bombay.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Copy to
Shri G. P. Hutheesing
Bombay

As at Anand Bhawan
Allahabad, September 9, 1945

My dear Nilima,

I am sending you two Parts of the typescript, making 114 pages. I have revised these and I want you to use them in preference to the matter sent by Raja which should be returned to me. I shall try to send you a further lot from Bombay where I am going. This business of finding time for revision is a difficult one. I hope to utilise the railway journey for this purpose.

I received your telegram in Allahabad but no further letter. There is no need for you to draw up a fresh contract form. The one I have sent back to you signed is quite good enough. As I have written to you, I am prepared to agree to two alterations in it : the price may be fixed uo to Rs. 9 8/- if you think this desireable, and you need not pay advance royalty. As regards advance royalties, it is right and proper normally to have this clause in the interest of authors who are poorly treated in India. But while I keep that clause in the contract, I waive my right to it in the present case. My saying so in my letter to you is quite enough legally or otherwise.

I am going to have a hard time in dealing with this revision business, but I shall try to meet your requirements. Let me know what these are. Write to me c/o. Raja in Bombay.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Guha Thakurta,
The Signet Press
10-2, Elgin Road,
Calcutta.

Lucknow

I have just discovered that by an overnight I have left Part I, that is pages 1—51 at home in Allahabad.

This is not annoying and I cannot reach it easily now till I return to Allahabad. However you have got these pages from Raja. They have not been revised by me after being typed and there are a number of typing mistakes. They will have to be corrected later—meanwhile I am sending you pages 53 to 104.

(Sd/-)

Registered

Anand Bhawan
Allahabad, September 30, 1945

My dear Nilima,

I received your letter in Bombay. I cannot trace it for the moment but anyway nothing more need be said about the matter.

I am sending you some more manuscript. This follows the two batches already sent, though it is paged separately. It should read 115 onwards. You can make the necessary changes.

It is an awful nuisance for me to have to go through this now when I am so busy. Nevertheless it has to be done, though I fear I do it rather hurriedly and many mistakes may escape me. There are occasional diacritical marks for Sanskrit words. I find that the typist has often given the wrong marks. I have corrected some. It is not really necessary to be so particular about these marks, and if you have any difficulty

you can leave them out. Again the few passages quoted from the French are often wrongly accented. This should be seen to.

I propose to send you another batch of manuscript within ten days or so, perhaps less. After that there may be some gap as I shall be moving about. It is not much good sending you my programme as my best address would usually be Allahabad, at least till the end of October. There is just a faint chance of my coming to Calcutta for two or three days in the last week of October, but I am not sure.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Guha Thakurta,
The Signet Press
10-2, Elgin Road, Calcutta.

Lucknow,
Oct. 4, 1945

My dear Nilima,

Here is another instalment of the Mss. This, I think, takes us to about the middle of the book, or a little further. I hope to send you another batch by mid-October.

I hope you will remember to send me a number of of copies of the final proofs—about ten—for various

Indian language translations.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Guha Thakurta,
The Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta.

Anand Bhawan
Allahabad
11. 10. 1945

My dear Nilima,

On October 4th I sent you part 4 of my manuscript from Lucknow in a registered cover. I have received no acknowledgement so far.

Now I am sending part 5—pages 269 to 326. I have not been able to revise it but Indu has read through it.

When are you likely to send me the proofs ?

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Guha Thakurta,
The Signet Press
10-2, Elgin Road
Calcutta.

N. B.—You have received two copies of of part one—one sent by Raja and the other by me. Will you please

return to me the former copy, that is the one sent by Raja.

I am not sure if I have received a receipt from you for part III. I have sent you now the mss. from p 1 to 326 in typescript.

(Sd/-)

Ananda Bhawan
Allahabad, October 16, 1945

My dear Nilima,

Your letter of the 10th. I hope to send you another batch of manuscript soon.

The printed proof pages you have sent gave me the first impression of being rather small. Yet when I measured them with my Autobiography they were just one line smaller. Then I counted the lines. There were 36 to a page in the proof ; 40 in my Autobiography (American Edition), and 44 in the English edition. I suppose this somewhat wider spacing produces the impression of a smaller page. Anyway you are the best judge of all this. I am returning the proof Pages with three corrections.

Regarding translations, I am sticking to most of my old publishers of the Autobiography. There is no point in changing them unless there is some special reason. Five of these have already approached me— for Hindi, Urdu, Marathi, Gujrati and Malayalam.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Guha Thakurta,
The Signet Press
10-2, Elgin Road,
Calcutta.

Encl : 1

Anand Bhawan
Allahabad
October 18, 1945

My dear Nilima,

Part 6 of the manuscript is being sent separately.

An American friend is returning to the U. S. A. very soon. I should like to send with him any printed form proofs that might be ready. He could give these to my publishers, the John Day Co. Inc., in New York. I do not know if you will have anyrhing ready before he goes. If so, please send it to him. His Calcutta address is :

Lt. Col. Albert Mayer,
Hindusthan Building,
22, Central Avenue,
Calcutta.

Telephone No. Calcutta 7080 extension 220

He will be leaving Calcutta for the United States on

November 1st. So anything that you send him should reach him by the 31st October. Please address the packet to :

Richard J. Walsh,
The John Day Company Inc.
40 East 49th Street,
New York City (U. S. A.)

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi
c/o The Signet Press
10-2, Elgin Road, Calcutta

Anand Bhawan
Allahabad, November 1, 1945

My dear Nilima.

Your letter of October 18th and 25th.

Yes, please send proofs of my book direct to the John Day Company.

Also you might send them to :

(1) Shri Martand Upadhyaya,
Sasta Sahitya Mandal,
Bombay Life Building,
Connaught Circus, New Delhi.

(2) Manager,
Maktaba-i-Jamia,
Karolbagh, Delhi

(3) Manager,
Navjivan Karyalaya,
Post Box 105
Ahmedabad

(4) Menager,
Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Calicut (South India)

I am going to Delhi today and shall be there till the 7th when I go to Bombay. I return to Allahabad about the 14th.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi,
The Signet Press
10-2, Elgin Road, Calcutta.

Gauhati
December 14, 1945

My dear Nilima,

I am sending you seven proof forms with some corrections in them. I have read them rather hurriedly, mostly in a moving motor car. I hope to send you the others soon or give them to you on my return to Calcutta. I return to Calcutta on 21st night and spend the 22nd there.

About the price I appreciate what you said and I realise that you appreciate my view-point also—that the

price should be reasonably low. However, I leave the matter to you and, if you think 11/8 is the suitable price in all the circumstances, you can do that.

I think I have already written to you that you can have my permission for another ten thousand.

Yours sincerely,
Jawaharlal Nehru

Shrimati Nilima Devi
c/o Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta.

P. S. After dictating the above Panditji left on his tour. Therefore he could not sign it.

S. D. Upadhyaya (Sd -)

Anand Bhawan
Allahabad, December 26, 1945

My dear Nilima,

Your letter of the 22nd December. I am returning to you under registered cover, ten proof forms Nos. 29 to 38. These have been corrected by me. Most of the corrections are minor but at page 602 a whole line has been left out. I hope to send you the rest of the forms before I leave Allahabad on the 29th. I shall make an effort to send you the postscript by then.

About the other matters, I shall write to you later. Probably you can have permission to have a Bengali

edition of the Unity of India. As for a cheap edition of my Autobiography in English the copyright of this is with my English publishers.

As I told you on the telephone, you had better make sure about the permission for extracts in my book.

Yours

Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi,
The Signet Press,
10-20, Elgin Road, Calcutta

Anand Bhawan
Allahabad, December 29, 1945

My dear Nilima,

I enclose the 'Postscript' and 'Preface' for 'The Discovery of India'. This completes the manuscript and you cannot blame me for any delay now.

Please remember to send proof copies of the book as early as possible to the American and Indian addresses I have given you. Also send a copy to :

V. K. Krishna Menon
c/o India League,
165 Strand,
Londan W. C. 2 England

I shall want you to send a fairly large number of

complimentary copies of the book on my behalf, that is apart from the press copies. In all these may amount to about 100. Of these send me 25 copies. A list of names and addresses will be sent separately. A preliminary list will be sent by my secretary tomorrow or the day after.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi
c/o Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta.

Encls : 2

Anand Bhawan
Allahabad, March 3, 1946

My dear Nilima,

Your last letter was dated the 4th February. Since then I have not heard from you. I am anxious to have the latest information about the progress of the book. When do you expect the book to be published and how many forms have you despatched to John Day and Krishna Menon ?

I shall be in Calcutta on the 8th and 9th and shall be staying with Prof. Mahalanobis. I am afraid I shall have no time to meet you. But we might have a talk on the phone.

Certainly you have my permission to have the Bengali edition of the Unity of India.

As for "Glimpses of World History" I am rather mixed up. I cannot keep trace of all these things and I have at present no time to go through old papers. I will try to find out.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi,
c/o The Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta

In morning train
12. 3. 46

My dear Nilima,

I have been looking through the book during my journey. The paper and printing are good. The binding is stout but it does not open easily. I do not particularly fancy the wavy-pattern on the back. Perhaps a simpler design would have been more effective. The dust cover is effective. The index seems to be in unnessarily big type.

About the 2nd edition, which you mentioned, I think it will be definitely better to have a large size of the paper and a thinner book. I want you to consider if it will be possible to reduce the price of this edition somewhat.

CENTRAL LIBRARY

I told you to send a complimentary copy of the book on my behalf to Sri Frederick Burroughs, the Governor of Bengali. Please also send a copy to H. E. Sir Francis Wylie, Governor House, Lucknow. In my list of complimentary copies appear the names of Sarojini Naidu and Padmaja Naidu. Do not send these copies to their home addresses as given in my list as they are not likely to be there. I shall let you have fresh addresses for them soon, or perhaps Indira will write to you and let you know.

Send to Allahabad at least 30 copies.

Send a copy (so as to reach about March 24th) to Sri Stafford Cripps, c/o the Private Secretary to the Viceroy, New Delhi.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Bombay
March 14, 1946

My dear Nilima,

I find that the "Bharat Jyoti", the Sunday edition of the 'Free Press Journal', also published the extracts from my book taken from "Asia". Will you please write to them also and tell them that this is an infringement of copyright.

In the list of complimentary copies which I sent you No. 45 is Miss Khurshed Naoroji. Address given is Darya-

ganj, Delhi. Please change this address and have the book sent to :

Miss K. A. D. Naoroji,
Dunlavin Lodge
Poona 5.

Also add to the list of complimentary copies the name of Mrs P. Vesogar, Neermullah, Mount Pleasant Road, Malabar Hill, Bombay.

Further I want you to send a copy on my behalf to H. N. Brailsford. I am not sure of his address as he is moving about but I have asked him to write to you and let you know where to send the book.

I presume you have made out your list of news-papers and periodicals to whom the books should be sent. Do not forget the 'National Herald' of Lucknow. Also the 'Modern Review'.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/.)

Shrimati Nilima Devi
c/o Signet Press
10-2, Elgin Road,
Calcutta.

CENTRAL LIBRARY

Anand Bhawan
Allahabad
March 28, 1946

My dear Nilima,

I received four copies of 'The Discovery of India' today. I am afraid most of my friends have come out with criticism of its make-up and appearance. I do not know whether any material change can be made in the next impression. Certainly in the new edition that you will print there must be a number of important changes. About that I shall write to you when the time comes. Meanwhile if it is possible to have some changes in the next impression of the second ten thousand, please have them made. I am enumerating below some of the matters requiring looking into and changing :

(1) The most important is that the inner margin is not sufficient and it is difficult to read the book. I do not know why this mistake has been made. The width of the page is to small. This takes away from the attractiveness but what is more important is this business of the inner margin. The book does not open sufficiently well for one to read it properly. Would it not be possible to have a wider page with the same printed forms which you have already got.

(2) The back of the binding should be neater without the curving lines. I would prefer a different colour.

(3) The dust cover also might be changed.

(4) The paper of the book does not always appear to be uniform.

In a new edition the page should be definitely bigger, the type possibly somewhat smaller, the paper slightly thinner, and the index in much smaller type. The whole book will then be about 500 to 550 pages.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/.)

Shrimati Nilima Devi,
c/o The Signet Press,
10-2, Elgin Road,
Calcutta.

18 Hardinge Avenue
New Delhi
April 25, 1946

My dear Nilima,

I have your telegram. I have no time to revise the book for the second edition. The minor errors were pointed out to me by someone but I have lost trace of them. If any such errors come to my notice later I shall let you know.

I want to know exactly what the second edition is going to be like in size, shape, type, binding, cover, price etc. It should be possible for you to have dummy copies

made previously for inspection. The price should be definitely lower.

I have just received the following telegram from Calcutta :

"PRAY PERMIT PUBLICATIONS OF TEN THOUSAND COPIES DISCOVERY OF INDIA WITHIN THREE MONTHS AT RUPEES FIVE EACH ROYALTY RUPEES TEN THOUSAND IN ADVANCE LETTER FOLLOWS=BOOK+EMPORIUM LIMITED."

No letter has come so far. Naturally I cannot give them permission over your head. But this telegram itself indicates how necessary it is to reduce the price of the book.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi
c/o Signet Press,
10-2, Elgin Road,
Calcutta

"The Retreat"
Simla
10 May 1946

My dear Nilima,

Your letter of the 5th May. I note what you say about the proposed changes in the second edition. I shall

be able to judge of them when I see the dummy.

You suggested, I think, that the second edition should consist of 20,000 copies. Obviously if 20,000 copies are printed the price will be proportionately reduced. Also the bigger size of the page will reduce the price somewhat. I am anxious that the price of the second edition should be as low as possible. The larger the edition the lower the price. Modern publishing believes in big editions and low prices. However, we shall consider this when you write to me in more detail.

As for my royalties on the first impression I suggest that you might send them direct to the Punjab National Bank, Allahabad, and ask them to credit it to my account. You can send the account to me to Allahabad.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi,
The Signet Press (Publishers),
10-2, Elgin Road, Calcutta.

20, Akbar Road,
New Delhi
June 13, 1946

My dear Nilima,

I have your letter of the 5th June. I like the sample pages you have sent me. The size is better and the foot-

notes are agreeable to read. I shall await the dummy volume.

As for the cost it is difficult for me to criticise your conclusion. Ultimately I shall have to leave the matter to you. If you think it will help matters I am prepared to reduce my royalty on the second edition to 15%.

I do not know when the English edition is coming out. Nor do I know the probable price. I was told, however, that it might come out early, possibly in July or August. The American edition should be out by the end of this month or early in July. I imagine that neither of these will be able to compete in the Indian market, though possibly some copies may come here. As you say the second edition is likely to be sold before publication, no question of competition arises.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi
The Signet Press,
10-2, Elgin Road,
Calcutta

P.S. On looking at your account I find an item of Rs. 20,000/- for binding and embossing etc. This seems to me out of all proportion to the rest of the expenditure. Indeed it is more than half of all other production charges put together. Surely something should be done about reducing it.

In your detailed costing estimate for the second edition you calculate this at the same figure, that is two rupees per copy.

(Sd/-)

Anand Bhawan
Allahabad
3 August, 1946

My dear Nilima,

I have not written to you for a long time. But I sent you a telegram from Bombay telling you to proceed with the printing of the second edition of my book. I should have liked to make some minor changes and correct some errors.

You mentioned in a letter that you were sending me 25 copies of the second impression. They have not arrived yet. Please send them to Allahabad.

I understand that Krishna Menon met you and your partner in Calcutta and had a satisfactory talk. Anyway he felt that you were doing the job as well as anyone could do in the circumstances. I am glad to know that he has agreed to help you in bringing out Indian editions of some of my earlier books. For the moment that will have to be limited to the Unity of India. I suggest that you keep in touch with him. I am quite agreeable to any arrangements between you two. Only keep me informed of it.

Krishna Menon seemed to think that I had been hard on you in asking you to keep the price low. Well, I

suppose you had better stick to the old price for the second edition.

I understand that the American edition has come out. When do you expect your second edition to be out ?

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi
The Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta.

External Affairs Department
New Delhi,
The 16th May 1947

Dear Nilima,

Thank you very much for your letter of the 11th May. I have gone into the question of paper supplies which is naturally causing you anxiety. I am informed that Government are taking only fifty per cent of the production of the Bengal Paper Mills and that the balance is available for civic consumption. If you find that there are some serious difficulties in the way of getting the paper which you require, please let me know the quantity which you need and the particular quality which you wish to use. I think it will be possible to help you in this matter.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi,
c/o The Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta

In your detailed costing estimate for the second edition you calculate this at the same figure, that is two rupees per copy.

(Sd/-)

Anand Bhawan
Allahabad
3 August, 1946

My dear Nilima,

I have not written to you for a long time. But I sent you a telegram from Bombay telling you to proceed with the printing of the second edition of my book. I should have liked to make some minor changes and correct some errors.

You mentioned in a letter that you were sending me 25 copies of the second impression. They have not arrived yet. Please send them to Allahabad.

I understand that Krishna Menon met you and your partner in Calcutta and had a satisfactory talk. Anyway he felt that you were doing the job as well as anyone could do in the circumstances. I am glad to know that he has agreed to help you in bringing out Indian editions of some of my earlier books. For the moment that will have to be limited to the Unity of India. I suggest that you keep in touch with him. I am quite agreeable to any arrangements between you two. Only keep me informed of it.

Krishna Menon seemed to think that I had been hard on you in asking you to keep the price low. Well, I

suppose you had better stick to the old price for the second edition.

I understand that the American edition has come out. When do you expect your second edition to be out ?

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi
The Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta.

External Affairs Department
New Delhi,
The 16th May 1947

Dear Nilima,

Thank you very much for your letter of the 11th May. I have gone into the question of paper supplies which is naturally causing you anxiety. I am informed that Government are taking only fifty per cent of the production of the Bengal Paper Mills and that the balance is available for civic consumption. If you find that there are some serious difficulties in the way of getting the paper which you require, please let me know the quantity which you need and the particular quality which you wish to use. I think it will be possible to help you in this matter.

Yours affectionately,
Jawaharlal Nehru (Sd/-)

Shrimati Nilima Devi,
c/o The Signet Press,
10-2, Elgin Road, Calcutta

CENTRAL LIBRARY

[নিচের দুটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হ'লো। প্রথমটি লেখকের Rama and the Bards : Epic Memory in the Ramayana গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদের একটি অংশ। ধারাবাহিক অনুবাদ 'হীনযান'-এ প্রকাশিত হয়েছিলো।—স. হী.]

রাম ও চারণেরা : রামায়ণে এপিকস্মৃতি

রবের আলোয়ান

উপসংহার

রাল্‌ফ টি. এইচ. গ্রিফিথ তাঁর রামায়ণ-অনুবাদের পঞ্চম খণ্ডে যুদ্ধকাণ্ডের তরজমার শেষে উত্তরকাণ্ডকে স্থান দিয়েছেন পরিশিষ্টে। এই কাণ্ডটি অনুবাদ করা তিনি বাহুল্য মনে করেছেন এবং এর সারানুবাদের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"বাঙলায় প্রচলিত পাঠ অবলম্বনে সিনর গোরেসিও ইতালীয় গদ্যে উত্তরকাণ্ডের চমৎকার এক অনুবাদ প্রকাশ করেছেন ; এবং শ্রী মুর তাঁর সংস্কৃত পাঠের (১৮৬২) চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে এই কাণ্ডের একটি সারসংক্ষেপ দিয়েছেন। এই সব গবেষকদের লেখা থেকে আমি অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছি এবং ক্লান্তিকর শ্রমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।"৪৬

আদি রামায়ণ একজন লেখকেরই রচনা, এই অনুমানের ভিত্তিতে উনিশ শতকের গবেষকদের উত্তরকাণ্ডের দীর্ঘ প্রসঙ্গচ্যুতি বিষয়ে অল্পই ধৈর্য ছিল। তার ওপর 'অলৌকিকতা আতঙ্কের' সীমাবদ্ধতার দরুন, তাঁরা বৃথাই চেষ্টা করলেন মূল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে 'আদিপাঠ' তৈরি করতে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে,

ফাদার রবের আঁতোয়ান

১৯১৪—১৯৮১

প্রশ্নটা এই নয় যে নায়ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা অথবা ঐতিহাসিক ঘটনার উৎস রূপে মহাকাব্য কতটা উপযোগী। এ-ধরনের অন্বেষণ খুবই কৌতূহলোদ্দীপক, যদিও তা মূল সমস্যাকে স্পর্শ করে না। আদি এবং আদিম সংস্কৃতি বিষয়ে আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে মৌখিক কাব্য হ'লো সম্প্রদায়বিশেষের উত্তরাধিকার। এবং জনস্মৃতি (popular memory) 'ঐতিহাসিক' ঘটনার শ্রেণীবিন্যাসে আগ্রহী নয়, তার লক্ষ্য পৌরাণিক প্রোটোটাইপ হিশেবে নায়ককে আবিষ্কার। মিরচেয়া এলিয়াদ-এর ভাষায় :

"জনস্মৃতির পক্ষে খাঁটি ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা নিজস্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 'ব্যক্তি'কে মনে রাখা কঠিন। পৌরাণিক ভাবনা-চিন্তার বিস্তার অনুযায়ী জনস্মৃতি প্রায় সবসময়ে আবর্তিত হয়ঃ এ শুধু জানে আর্কিটাইপ, আদর্শ দৃষ্টিকোণ; বস্তুত ঐতিহাসিক চরিত্র এবং আকস্মিক ঘটনাবলি নিয়ে এ [জনস্মৃতি] বিশেষ মাথা ঘামায় না। ঐতিহাসিক চরিত্র আর্কিটাইপের আদর্শে সংশ্লিষ্ট হয় (যেমন নায়ক, শত্রু)। তেমনি [ঐতিহাসিক] ঘটনা সংহত হয় পৌরাণিক কার্যাবলির মধ্যে (দৈত্য-দানব, ভ্রাতা, শত্রু ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ)।··· গোষ্ঠী স্মৃতিতে স্থায়ী হবার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রাবলি এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যাতে তাদের বাস্তবতা হারায় এবং পুরাণের চিরন্তন আর্কিটাইপের মধ্যে পুনরুজ্জীবন ঘটে।"৪৭

মহাকাব্যগুলি লিখিত হবার বহু আগে বংশপরম্পরায় এগুলি বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন রূপে গীত হ'তো। মূল কাহিনী রাম-চরিত ছাড়াও আরো বহু উপকাহিনী স্বতন্ত্রভাবে গ'ড়ে উঠেছে এবং স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সব অঞ্চলই এই মৌখিক ঐতিহ্যের ক্রমবর্ধমান রত্নভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করেছে। কোথায় এবং কখন প্রথম লিখিত পাঠের শুরু হ'লো বলা কঠিন, তবে এটা নিরাপদে অনুমান করা যেতে পারে যে, বহু জায়গাতেই একই সঙ্গে কাজটা শুরু হয়েছিল। মৌখিক ঐতিহ্যের বিবিধ লিখিত পাঠে দৈর্ঘ্য এবং বিষয়ের দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। ক্রমশ প্রয়োজন হ'লো লিখিত পাঠকে সংহত করার। নারদ বাল্মীকিকে তাঁর পরিকল্পিত মহাকাব্যের সারমর্ম ব'লে দিচ্ছেন, এই চতুর কল্পনা সমস্যাটির একটি সুসঙ্গত সমাধান এনে দিলো। অতএব নারদ-কথিত রামায়ণই যে 'আদি' এই যুক্তি মানা যায় না, কেননা তা'হলে পূর্বলিখিত অনেকগুলি পাঠেরই বহু অংশ বর্জন করতে হয়, যেগুলির কোনটিই মৌলিক নয়।

প্রাচীন মহাকাব্যের গভীরতা ও ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে হ'লে একে মৌখিক ঐতিহ্যের স্বাভাবিক প্রেক্ষিতে পুনঃস্থাপিত করতে হবে। তার পৌরাণিক বিস্তারও অক্ষুন্ন থাকা চাই। রামায়ণে মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি নয়, সে হচ্ছে দৈব-অভি-প্রায়ের বাহক মাত্র এবং তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্য ধরা পড়ে না। রামের প্রতি লক্ষ্মণের নিষ্ঠা ও আনুগত্য সেই পরম দৈবের কাছে অচেতনভাবে আত্মসমর্পণের অন্বিত প্রকাশ। এর গভীরতা পরিমাপের ক্ষমতা তাঁর নেই। বস্তুত, লক্ষ্মণ হলেন মহাকাব্যের সুন্দর সৃষ্টির একটি। বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে দীক্ষা-গ্রহণের সময় থেকেই দুই ভাই মানব-অস্তিত্বের দ্বিবিধ মাত্রার মূর্তরূপ। কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রামের অপার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি, আর লক্ষ্মণের রক্ত-মাংসের মানুষের মতো স্বাভাবিক আচরণ—এই আপাত বৈষম্য সত্ত্বেও লক্ষ্মণের রামের প্রতি প্রশ্নাতীত আনু-গত্যের জন্য সঙ্গতিটা সুন্দর বজায় থাকে। কৈকেয়ী এবং দশরথের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে তিনি রামের সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং বনবাসে তাঁর অনুগমন করেন। তাঁর নির্লিপ্ততার প্রকাশ তাঁর সনিষ্ঠ সেবায়ঃ তরুণী স্ত্রীকে [রাজধানীতে] ফেলে রেখে তিনি রাম এবং সীতার সেবায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেন।

রাম কর্তৃক রাবণ বিজয়ের পর হৃষ্ট মনে অযোধ্যায় ফিরে এলে আবার লক্ষ্মণের ওপরই ভার পড়লো সীতাকে বনবাসে দেবার। লক্ষ্মণ ভাইয়ের এই সংকল্পে নিদারুণ আঘাত পেলেন, কিন্তু তিনি তাঁর আদেশ অমান্য করলেন না। তারপর জীবনে একবারই মাত্র তিনি দৈব-অভিপ্রায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করলেন, যার জন্য তিনি চিরকাল তাঁর মানবিক বিশ্বাস [ও মূল্যবোধকে] বিসর্জন দিয়েছেন। সুমন্ত্র তাঁকে ভৃগুর অভিশাপের কথা বলবেন।[৪৮] মানবিক ঘটনার মধ্য দিয়ে দৈববিধানকে সার্থক ক'রে তোলার এই গোপন রহস্য তাঁর কাছে প্রকাশিত হ'লে তিনি অভিভূত হলেন।

তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর মানবিক প্রতিক্রিয়া খাঁটি এবং আন্তরিক হ'লেও তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ।

লক্ষ্মণের মৃত্যু ও তাঁর জীবনের উপযুক্ত ; নৈর্ব্যক্তিকতার চরম উদাহরণ তাঁর পরিসমাপ্তি। যখন দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন যে রামের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ না হ'লে তিনি বংশলোপ ক'রে দেবেন, লক্ষ্মণ ইতস্তত করলেন না ঃ

একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ববিনাশনম্ ।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭. ৯৫ ৯

['সকলের বিনাশ হওয়া অপেক্ষা আমার একারই মরণ ভাল' নিজ বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তাঁহার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ঐ]

এই যে জাগতিক বাস্তবতার ঊর্দ্ধে একটি প্রতিমান, যেখানে মানবিক বিচার ও মূল্যবোধ পৌঁছোয় না, এই হ'লো এপিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির মূল কথা। [রামায়ণ] মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য সীতার মৃত্যুতে তা পূর্ণ রূপ পায়।

লঙ্কাপুরী থেকে উদ্ধার পাবার পর রামের কঠোর আদেশে তাঁকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে সতীত্বের প্রমাণ দিতে হ'লো। তিনি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন, [তা সত্ত্বেও] তিনি সতীত্বের সংশয়হীন প্রমাণ দিলেন। শুদ্ধতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি মানব-জগতে তাঁর যোগ্য স্থান ফিরে পেলেন এবং আমরা অনুভব করি যে এবার তাঁর সুখে-শান্তিতে থাকা উচিত। মানবিক দিক থেকে রাম-সীতার পুনর্মিলনের পর থেকেই মহাকাব্যটি শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে মহাকাব্য মানুষের সুখে থাকবার বিধানমাত্র নয়, এ হ'লো মানব-অস্তিত্বের রহস্য-

ময়তার সমাধানে অন্বেষণ, তা'হলে আমরা একথা ভেবে অবাক হবো না যে মধুর পরিসমাপ্তিই মহাকাব্যের শেষ কথা নয়। সীতা যখন দ্বিতীয়বার নির্বাসিত হলেন, তখন তিনি আসন্নপ্রসবা এবং এটা সত্যিই নিষ্ঠুর আঘাত। তাঁর প্রথম নির্বাসন ছিলো স্বেচ্ছা-প্রণোদিত—রামের প্রতি ভালোবাসার সুন্দর প্রকাশ। এখন সেই ভালোবাসার মানুষই তাঁকে নির্বাসন দিচ্ছেন। দীর্ঘ বারো বছর তিনি কাটালেন বাধ্যতামূলক বৈধব্যে। আবার এলো দ্বিতীয়বার তাঁর শুদ্ধতা প্রমাণের পালা। সমস্ত দৃশ্যটির মধ্যে একটি অস্বস্তিকর মাহাত্ম্য আছে। কাষায়বসনা সীতা কৃতাঞ্জলি-পুটে অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে এলেন। আমরা ভাবছি এই সুন্দর জীবনের চরম বিজয়ের ক্ষণ আসন্ন, কিন্তু আমাদের মানবিক আশা [কিছুক্ষণ পরেই] ধূলিসাৎ হয়। তাঁর প্রতিজ্ঞা-বাক্য সব মানবিক বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে :

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ৭. ৮৮. ১০

[আমি রাম ভিন্ন অপর কাহাকেও কখন (স্পর্শ করা দূরে থাকুক) মনেও ভাবি নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভগবতী পৃথিবী আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর (পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করার জন্য গহ্বর) দান করুন। ঐ]

এই অসাধারণ দৃশ্যটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সীতা হয়তো মানবপ্রেমের ভঙ্গুরত্ব বিষয়ে ভাববার সময় পেয়েছিলেন। তাঁর শেষ শুদ্ধতার পরীক্ষা তাই মানবজীবনের সুখ-আনন্দের অসারতাকেই বিদায়। এই অসাধারণ নির্লিপ্ততারও মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু মহাকাব্যের প্রেক্ষিতে এটাই শেষ কথা হ'তে পারে না। সীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষার পার্থক্যের

মধ্যে পৌরাণিক যৌক্তিকতা আছে। কৃতযুগে সীতা ছিলেন বেদবতী-বিষ্ণুর একান্ত অনুরাগিণী। রাবণ দ্বারা ধর্ষিতা হ'য়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে রাক্ষসের নিধনের জন্য তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন। যুদ্ধকাণ্ডে তাঁর অভিশাপ সার্থক হ'লো এবং অগ্নি পরীক্ষার ফলে তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষা সফল হ'লো। রাবণের উদগ্র কামনার জন্য অল্প সময়ের বিচ্ছেদ ছাড়া সীতা ও রামের পুনর্মিলন দেখতে পাই। কিন্তু বিষ্ণুর ত্রাণ-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত আছে দীর্ঘকাল বিরহযন্ত্রণা ভোগের: 'পত্নী-বিয়োগম্ বহু-বার্ষিকম্।' ভৃগুর অভিশাপে এই শর্তই ছিলো। সেটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিষ্ণুর উদ্দেশ্য সার্থক হ'তে পারে না। তাই রাম-সীতার আনন্দিত মনে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহা-কাব্যও শেষ হ'তে পারে না—তা'হলে ঋষির উচ্চারিত বাক্য অসিদ্ধ থেকে যায়। এখন সীতার দ্বিতীয়বার নির্বাসনের পর কৃতযুগে যে প্রাক্‌রূপ তৈরী হয়েছিল তা ত্রেতাযুগের ঐহিক ঘটনার মধ্যদিয়ে সার্থক হ'লো। মানুষেরা তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে। এর পর তারা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে যায় এবং সীতার নাটকীয় প্রস্থানে—তার মানবীয় উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন—মানব-নাট্যের যবনিকা পড়ে।

মানুষের কার্যাবলিকে এই এপিক প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখা 'কাব্য'-প্রবণ [পাঠকের পক্ষে] সংশ্লেষণ করা দুরূহ। একটি থেকে আরেকটিতে পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটেছে। গোড়াতে এপিক বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো লম্ব মাত্রিক—তা আমাদের মানবিক দৃশ্যগুলিকে দেখাতো বিশ্বজাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার সময়হীন প্রেক্ষিতে। পরে তার স্থান নিলো সমরেখ মাত্রা, যেখানে মানবিক পরিস্থিতিগুলি স্বয়ংনির্ভর এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই পূর্ণতা খোঁজে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতের চূড়ান্ত রূপের সুন্দর নিদর্শন ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'। সীতার এপিক মাহাত্ম্য এখানে

রোদনপরা রোমান্টিক নায়িকায় পরিণত হয়েছে। তিনি কখনোই মাতা ধরিত্রীকে আহ্বান করবেন না তাঁকে গহ্বরে স্থান দেবার জন্য। তাঁকে শুদ্ধতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তেই হবে এবং তাঁর মহামিলনের আনন্দময় পরিণতি ভবভূতির নাট্যপ্রতিভায় সুকৌশলে পরিকল্পিত। একবার মিলনান্ত পরিণতি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'লে অবাধে করুণরসকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়। কিন্তু রাম ও সীতার অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস এবং মূর্ছা সত্ত্বেও সেগুলিকে যখন অশ্রুহীনা বিনীতা সীতার শেষবারের মতো মাতা ধরিত্রীকে আহ্বানের ট্র্যাজিক মহিমা ও সারল্যের সঙ্গে তুলনা করি, তখন নেহাৎই অকিঞ্চিকর ভাববিলাস ব'লে মনে হয়।

(ভাষান্তর : সুবীর রায়চৌধুরী)

প্রসঙ্গ নির্দেশ :

৪৬ Ralph T. H. Griffith, ***The Ramayana of Valmiki***, vol. V (London, 1874), pp. 315-316

৪৭ Mircea Eliade, "Litterature orale", ***Histoire des Litteratures***, ed Raymond Queneau, vol. 1 (Paris, 1962)

৪৮ ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, ২. C, পৃঃ ৯৯

আর্নল্ড্ টয়েনবি : "ইতিহাস-অরীক্ষা"

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ফরাসী ভাষায় একটি গভীর অর্থবহ শব্দ আছে : "ল্য গ্রাঁ দেক্রভ্যাঁ"—বড়ো লেখক। উঁচুদরের গদ্য-লেখকদের সম্পর্কেই শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কী জাতীয় লেখা সেটা এখানে বিচার্য নয়, লেখাটা কেমন সেটাই বড়ো কথা ; অর্থাৎ সেটা শিল্পকলা হয়ে উঠেছে কিনা। তা যদি হয় তা হলে জাতিটা হয়ে ওঠে গৌণ, প্রকৃতিটাই সব ; শুধু তা-ই নয়, লেখাটা সৃষ্টিশীল রচনা, না আলোচনা, সে বিচারও হয়ে যায় অর্থহীন। ফরাসী দেশে তাই পাস্কাল, ব্যুফঁ, ভলতেয়ার, রুসো, রেনঁা, আনাতল ফ্রাঁস, বের্গ্সঁ, শার্দঁ্য—এঁরা সকলেই "গ্রাঁ দেক্রভ্যাঁ", ঠিক যেমন স্তাঁদাল, ফ্লোবেয়র, বালজাক, প্রুস্ত, মোরিয়াক "এঁরা গ্রাঁ দেক্রভ্যাঁ", যদিও ঐ প্রথমোক্ত লেখকরা তথাকথিত সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রণেতা নন ; এঁদের রচনার বিষয়—ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা, যার কোনোটাই প্রচলিত অর্থে "সৃষ্টিশীল" সাহিত্য বলে গণ্য নয়। না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না—ফ্রান্সে। অন্তত, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষী দেশগুলিতে, ব্যাপারটা অন্য রকম ; সেখানে "সাহিত্য" মানেই "সৃষ্টিশীল" সাহিত্য। অতএব "বড়ো লেখক" না বলে সেখানে বলা হয় বড়ো ঔপন্যাসিক, বড়ো নাট্যকার, বড়ো প্রাবন্ধিক। গিবন সেখানে একজন বড়ো ঐতিহাসিক, এমার্সন অথবা রাস্কিন বড়ো মনীষী, ব্র্যাডলে কিংবা রাসেল বড়ো দার্শনিক। ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে এঁদের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় হ'ত—এঁরা বড়ো লেখক, "গ্রাঁ দেক্রভ্যাঁ।," তার কারণ এঁরা যা-ই, যে-বিষয়েই লিখে থাকুন, কী করে লিখতে হয় সেটা খুব ভালো ক'রেই জানতেন। আর ফ্রান্সে এটা যিনি জানেন, তিনি স্রষ্টা কি সমালোচক, ঐতিহাসিক কি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার কি দার্শনিক-

নিবন্ধকার—এসব বিচার অনেকটাই অবান্তর হয়ে পড়ে।

আর্নল্ড টয়েনবির প্রথম এবং প্রধান পরিচয়—তিনি এক-জন বড়ো, মস্ত বড়ো লেখক, যাঁর সুবিশাল দ্বাদশ-খণ্ড-সংবদ্ধ "ইতিহাস-অন্বীক্ষা" (এ স্টাডি অব হিস্টরি) কেবল ইতিহাস নয়, মনীষার প্রায় অমানুষিক প্রকাশ নয়, নিঃসংশয় এবং সুমহৎ শিল্প-কৃতি ; টয়েনবি যাকে বলেছেন (বলা বাহুল্য, নিজের সম্পর্কে নয়) "বুদ্ধিপ্রভব সৃষ্টি" (Intellectual Creation) এ হল তা-ই। শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে সৃজন এবং মনন এর মধ্যে ইতরেতর বিরোধিতা অস্বীকৃত।

"ইতিহাস-অন্বীক্ষা" এমনই এক মননাশ্রয়ী সৃষ্টি। ইতি-হাস, বিজ্ঞান অথবা আর্ট এ নিয়ে তর্ক হতে পারে, হয়েছে ; কিন্তু ইতিহাস রচনা যে আর্ট এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। অথচ অধিকাংশ ইতিবৃত্ত-রচয়িতা পণ্ডিত, গবেষক ; শিল্পী নন। টয়েনবির গৌরব এইখানেই। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং মনীষা বিদগ্ধ সমাজেরও বিস্ময়, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো বিস্ময় তাঁর সৃষ্টি।

"ইতিহাস-অন্বীক্ষা" অধ্যয়ন একটা স্মরণীয় ঘটনা, একটা বিচিত্র, দুর্লভ উপলব্ধি। শুধু যে জ্ঞানরাজ্যের নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে তাই নয়, এমন অনেক কিছু আমরা লাভ করি, সঞ্চয় করি যার সঞ্চার চেতনার সর্বস্তরে : চিত্তের ব্যাপ্তি এবং দীপ্তি—আর সেই গভীর, নিরন্তর তৃপ্তি যা অনুত্তম শিল্পকৃতিই আমাদের দিতে পারে।

আশ্চর্য লাগে, এমন একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা সুলিখিত, প্রতিটি বাক্য সযত্ন সাধিত, প্রতিটি শব্দ সূচিত এবং যথাযথ। বাক্য প্রায়শই দীর্ঘ, লাতিন উদ্ভূত শব্দাবলির ভূরিতা সত্ত্বেও স্বচ্ছ, প্রসাদগুণ-মণ্ডিত।

টয়েনবির ভাষায় এই লাতিন শব্দের প্রাচুর্য সর্বত্র অভিনন্দিত হয় নি, এমন কি সহজ স্বাভাবিক ইংরেজি বাগ্‌ধারার ব্যভিচার বলে নিন্দিত হয়েছে কখনো কখনো। একজন ভিন্নভাষী বিদেশী পাঠকের পক্ষে এ বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া হয়তো মূঢ়তা। সুখের বিষয়, তাঁর সমভাষী রসজ্ঞ পাঠকবৃন্দের মধ্যেও এমন পরম অনুরাগীর অভাব নেই যাঁদের কাছে "অন্বীক্ষা"র সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ভাষা।

ঐতিহাসিক এবং লেখকরূপে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা যেমন প্রচুর হয়েছে এবং হচ্ছে, তেমনি এটাও আজ স্পষ্ট যে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ তিনি শুধু প্রথিত নন, সাগ্রহে অধীত। আশ্চর্য লাতিন-শব্দ-ভূয়িষ্ঠ, দীর্ঘ বাক্যে মন্দাক্রান্ত, পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত এই বিপুলায়তন গ্রন্থটি কী করে এতটা জনপ্রিয় হল। এর উত্তরে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ বলবেন এই জনপ্রিয়তার সঙ্গে মূল "অন্বীক্ষা"র কোনো সম্পর্ক নেই, এর মূলে ঐ গ্রন্থের প্রথম ছ'টি খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (দুই খণ্ডে), যার প্রণেতা টয়েনবি নন, সমারভেল ; এবং ভাষা আলাদা।

কথাটা সত্য, মানতেই হবে, কিন্তু শেষ কথাটা যথার্থ নয়। কারণ ঐ, হ্রস্বীকৃত "অন্বীক্ষা"য় মূলগ্রন্থের স্বাদ শুধু বিষয় নয়, ভাষার দিক থেকেও যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা হয়েছে ; বরং সেটা সর্বত্র সম্ভব হয় নি—হতে পারে না—বলে লেখক আক্ষেপ করেছেন, বলেছেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো সম্ভব নয়। বস্তুত সেই অনাস্বাদিত মূল গ্রন্থের অধ্যয়নে বিবিক্ষু পাঠককে প্রণোদিত করাই এই সুযোগ্য সংক্ষেপকর্তার অন্যতম অভিপ্রায়।

স্টাইল, বিশেষ ক'রে বাগ্‌ধারার ঔচিত্য বিচার, পূর্বেই বলেছি, ভিন্নভাষী পাঠকের অধিকার-বহির্ভূত। অথচ মূল

"অন্বীক্ষা"র ঐ দীর্ঘ-মন্থর, মন্ত্র-গম্ভীর বাক্যপরম্পরা যখন অনধিকারীর শ্রবণে এমন সুললিত এবং বোধে এতটা প্রাঞ্জল বলে প্রতিভাত হয় তখন গ্রন্থের আর যাই দোষ থাক, কাঠিন্য তার অন্যতম নয়। বস্তুত "অন্বীক্ষা" একটি মহাকাব্য, যার বিষয় একুশটি সভ্যতার জন্ম-বৃদ্ধি-জরা মৃত্যুর বিচিত্র ইতিবৃত্ত—সভ্যতার প্রত্যূষকাল হতে শুরু করে অদ্যাবধি। তা যদি হয় তা হলে বলতেই হবে ভাবগৌরবের পূর্ণ প্রকটনের জন্য ভাষার এই গাম্ভীর্যের, মন্দাক্রান্ত আন্দোলিত সৌন্দর্যের প্রয়োজন ছিল।

অথচ এই মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্যের মধ্যেও বিচ্ছুরিত এক সমুজ্জ্বল, সকৌতুক ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি। এমন সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ যে আদ্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে আনন্দদায়ক, তার একটি প্রধান কারণ এই ঔজ্জ্বল্য এবং সরসতা।

আর একটি কারণ : চিত্রকল্পের আশ্চর্য ঔচিত্য এবং বৈচিত্র্য, যার মধ্যে মিলিত হয়েছে প্রাচীন এবং সমকালীন, গ্রীক এবং হিব্রু পুরাণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা, ভাষা এবং সাহিত্যে আবাল্য নিষ্ণাত এই বাক্তিটির রচনায় যে প্রাচীন সাহিত্য প্রতিবিম্বিত হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রতীচীর প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি টয়েনবির এই ঐকান্তিক প্রীতি—যা তাঁর ছাত্রাবস্থার স্নিগ্ধ স্মৃতিমাত্রে অবসিত হয় নি, অক্ষীণ এবং অক্ষুণ্ণ ছিল শেষ দিন পর্যন্ত—এটা তাঁর পূর্ণ চেতনার একদেশ মাত্র, যা তাঁর তীক্ষ্ণ সমকালীন চেতনাকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় কলিংউড-এর ("দি আইডিয়া অব হিস্টরি") সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—ইতিহাস অতীতের বিবৃতি মাত্র নয়, ইতিহাস-রচয়িতার অদ্যতন চেতনায় অতীতের এক প্রাতিস্বিক প্রতিভাস। ইতিহাস তাই পুরাবৃত্ত নিয়ে ব্যাপৃত হয়েও এই অর্থে প্রবলভাবে বর্তমান।

"এ স্টাডি অব হিস্টরি" ও তা-ই (এবং সেই আরো কিছু)। টয়েনবির এই তীব্র সাম্প্রত্য-চেতনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত—তাঁর অগণিত চিত্রকল্পে সমকালীন জীবনের প্রাদুর্ভাব। যেমন সেই বিখ্যাত "ট্র্যাফিক জ্যাম" এর উদাহরণ, যা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর একটি মৌল প্রতীতি : একটা চ্যালেন্জ্-এর সফল উত্তর অনিবার্যভাবে ডেকে আনে আর একটি নতুন চ্যালেন্জ্; এবং এইভাবেই চলতে থাকে চ্যালেন্জ্-এবং-উত্তরের অবিরাম পরম্পরা, যা সূচিত করে বুদ্ধিশীল সভ্যতার প্রাণবত্তা এবং যৌবন। যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত আধুনিক নাগরিক জীবনের ত্বরমাণ গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে উদ্ভাবিত হল দ্রুত হতে দ্রুততর চক্রযান। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে এই অভূতপূর্ব উত্তরোত্তর দ্রুতি থেকেই সৃষ্টি হল এক নতুন অভাবিতপূর্ব সমস্যা : ট্র্যাফিক জ্যাম যার সার্বত্রিক সমাধান আজও আমাদের অনায়ত্ত।

চ্যালেন্জ্-এবং-উত্তরের এই অনতিক্রমণীয়, অন্তহীন পরম্পরার কেন্দ্রিক তত্ত্বটি বোঝাতে গিয়েই এই পরিচিত চিত্রটির অবতারণা। যেটুকু বলা হল তা মূল, পল্লবিত বর্ণনার অতি ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। মূল চিত্রটি এমনই সজীব, সরস এবং উজ্জ্বল যে এই অতি-পরিচিত, বিরক্তিকর, তিক্ত ব্যাপারটি হয়ে ওঠে একটি ছোটো-খাটো কৌতুক-নাট্য, মনে পড়ে যায় হোমারের সেই অপ্রতিম এপিক উপমা। বস্তুত এই ধরনের পল্লবিত, অসামান্য নাট্য-গুণান্বিত চিত্রকল্প—যা "অন্বীক্ষা"র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, এবং যার উপকরণ অনেক সময়েই আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো সাম্প্রতিক আবিষ্ক্রিয়া—আধুনিক "সৃষ্টিশীল" সাহিত্যেও ক্বচিৎ-দৃষ্ট এপিক উপমার সঙ্গেই তুলনীয়।

এই অসাধারণ নাটকসুলভ সকৌতুক সরসতা কেবল "অন্বীক্ষা"র চিত্রকল্পেই নয়, বর্ণনাতেও বিদ্যমান। বর্ণনীয় যেখানে

ঘটনা, সেখানে এই গুণটি অন্যত্রও—যেমন মেকলের ইতিহাসে—দুর্লভ্য নয়, দুঃসাধ্যও নয়। কিন্তু টয়েনবির বিবৃতব্য যেখানে ঘটনা নয়, কোনো অবস্থা, এমন কি তত্ত্ব, সেখানেও এই আশ্চর্য সরসতা, যার মূলে কেবল লিপিচাতুর্য নয়, তারও গভীরে : লেখকের বিশিষ্ট মানসতা। এই মানসতা, দার্শনিক আলোচনায় অসামান্য দক্ষতা সত্ত্বেও, মূলত মূর্তাভিমুখী, চিত্রাশ্রয়ী।

অথচ, পূর্বেই বলেছি বিমূর্ত ভাবনার প্রকাশেও তিনি পারদর্শী। "অন্বীক্ষা"য় দার্শনিক আলোচনা প্রচুর আছে, এবং সর্বত্রই দৃশ্যমান নিপুণ দার্শনিকোচিত বিশ্লেষণকুশলতা। এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত - "অন্বীক্ষা"র পঞ্চম খণ্ডে স্টোয়িক এবং হীনযান বৌদ্ধ মনীষীদের আদৃত শ্রেয়োমার্গের প্রতিকূল সমালোচনা; আর একটি—ষষ্ঠ খণ্ডে, "কর্ম" সম্পর্কে সনাতন ভারতীয় ধারণার পর্যালোচনা; কিংবা সপ্তম খণ্ডে (টয়েনবির অধ্যাত্মভাবনার বিবৃতি হিসেবে এই খণ্ডটি বিশেষভাবে প্রণিধেয়) যেখানে বিখ্যাত "দ্য গোল্ডেন বাও" গ্রন্থটিতে ঘোষিত ফ্রেজার-এর তীব্র ধর্মবিরোধী একটি মন্তব্যের (যেখানে তিনি মানবসভ্যতার বিকাশে ধর্মভাবনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে ধিক্কৃত করেছেন) দৃঢ় প্রত্যুত্তর দিয়েছেন যুক্তি, ঐতিহাসিক তথ্যের বিবৃতি এবং তীক্ষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ পরিহাসের মারাত্মক সংমিশ্রণে।

এই শেষোক্ত বিশেষত্বটি লক্ষণীয়। "অন্বীক্ষা"র আদ্যন্ত টয়েনবি প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন, একের পর এক (যেমন, স্পেংলের, কলিংউড, ফ্রেজার), খণ্ডন করেছেন নানা বিরুদ্ধ মতবাদ ও জীবনদর্শন, বিতর্কের অবতারণা ঘটেছে বারবার। অথচ অপ্রীতি কোথাও নেই, বিদ্বেষ নেই, অসৌজন্য নেই; আছে দীপ্ত কৌতুক, আর অনাবিল হাস্যরস।

কিন্তু এটাও ব্যতিক্রম। কারণ, "অন্বীক্ষা"র বাদী সুর

বিদ্রূপ নয়, এমন কি নির্মল সকৌতুক পরিহাসও নয়ঃ শ্রদ্ধা। সমালোচনা করেছেন অনেকের—অবশ্য সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য ব্যক্তি নয়, মত বা আদর্শ—কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি করেছেন প্রশংসা, সশ্রদ্ধ, সাদর সুদীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে। শুধু বের্গ্‌সঁ হতে তিনি নানা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি সহযোগে গভীর অনুরাগ-প্রণোদিত যে সব মন্তব্য করেছেন তা দিয়ে একটা ছোটোখাটো বই হতে পারে। এ কেবল একটা উদাহরণ, এরকম আরো অনেকেই আছেনঃ প্লেটো থেকে আরম্ভ করে জেম্‌স্ জীন্‌স্ পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, যাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে একমত হতে পারেন নি—যেমন স্পেংলের কিংবা কলিংউড তাঁদের প্রতি শুধু সৌজন্য নয়, হার্দিক শ্রদ্ধা প্রতিবাদের মধ্যেও সর্বত্র প্রকট।

কোথাও কোথাও টয়েনবি নিজের কথাও বলেছেন—বিশেষ করে গ্রন্থের পাদটীকায় (তাঁর পাদটীকা কখনো কখনো চিত্তাকর্ষকতায় মূল রচনাকেও ছাড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে যেখানে নিজের কথা বলেছেন)। এ জিনিসটা কোনো কোনো পাঠকের ভালো লাগে নি, যাঁদের মনে হয়েছে এটা অহমিকা। এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা টয়েনবির চরিত্র শুধু নয়, তাঁর ইতিহাস-অনুশীলনের গূঢ়তম প্রেরণাই ধরতে পারেন নি। সেটা কী তা "অন্বীক্ষা"র পরে লেখা "অ্যান হিস্টরিয়ান্‌স্ অ্যাপোচ টু রিলিজ্‌ন" বইটিতে প্রকাশ করেছেন। সেখানে বলেছেন, তাঁর ইতিহাসচর্চার (এবং সমগ্র জীবন চর্যার) একমাত্র উদ্দেশ্য—"আত্মকেন্দ্রিকতা হতে মুক্তি।"

বলা নিষ্প্রয়োজন, রচনায় উত্তম পুরুষের ব্যবহার—যদিও "আমি" শব্দটি টয়েনবি সাবধানে বর্জন করেছেন, তার পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন "বর্তমান লেখক"; যদিও এটাও কেউ কেউ ছদ্ম অহমিকা বলে মনে করেন! - অহমিকার অব্যর্থসূচক নয়। আর, দ্বিতীয়ত, উত্তম পুরুষটি যদি টয়েনবির মতো একজন অসামান্য,

অনুত্তম ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ হন, তা হলে রচনার আকর্ষকতা অনেক বেড়ে যায়। এতটাই যে আমরা উৎসুক হয়ে থাকি এই পুরুষটির পরবর্তী আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় (বিশেষত পাদটীকায়)।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর অপূর্ব আত্মচরিত-এর এক জায়গায় প্রায় একই বিষয়ে ভিন্ন সময়ে রচিত দুটি গ্রন্থের তুলনা করেছেন। গ্রন্থ দুটি : "দ্য হিস্টরি অব ওয়েস্টার্ন ফিলজফি" ও "উইজডম্ অব দ্য ওয়েস্ট"। দুটিরই বিষয় পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস ; প্রথমটি—যেটি সমধিক প্রসিদ্ধ—আগে লেখা, দ্বিতীয়টি পরে (বছর দশেক)। উভয়ের মধ্যে একটা লক্ষণীয় পার্থক্য, প্রথমটিতে রাসেল তাঁর ব্যক্তিগত মতামত, এমন কি বিরাগ-অনুরাগ গোপন করেন নি। স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন, কখনো কখনো তাঁর সেই অননুকরণীয় কৌতুকময় ঈষৎ-স্মিত চটুল ভঙ্গিতে। দ্বিতীয়টি তুলনায় কিছুটা গম্ভীর এবং অব্যক্তিক, নিজের পছন্দ-অপছন্দ সেখানে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। তাঁর নিজের মতে এবং তাঁর অনুরাগী সারা দুনিয়ার পাঠকবৃন্দেরও মতে প্রথমটি রচনা হিসেবে নিঃসংশয়ে বেশি রোচক হয়েছে, তার কারণ (নিজেই বলেছেন আত্মচরিতে) এটিতে ঘটেছে লেখকের পৌনঃপুনিক অনুপ্রবেশ, এবং সেই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত প্রীতি-অপ্রীতি।

কঠোর বৈজ্ঞানিকোচিত অব্যক্তিকতার অভ্যন্তরে লেখকের মানবসুলভ রুচি-অরুচির প্রচ্ছন্ন সঞ্চার একই কারণে টয়েনবির "অন্বীক্ষা"র একটি প্রধান আকর্ষণ ; সেই কারণটি হল লেখকের ব্যক্তিসত্তার চমৎকারিতা। অনুরাগ-বিরাগের অকপট প্রকটন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তখন যখন লেখকের রচনায় চিত্তের এই বিশ্বতোমুখ ঐশ্বর্যের কোনো আভাস আমরা পাই না।

সংস্কার জিনিটা যে অত্যন্ত মানবসুলভ একটি গুণ, এটা

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, নিজের বেলায় নয়, অন্যের বেলায় ; নিজেরা আমরা সকলেই আশ্চর্যভাবে "সংস্কারমুক্ত", কাজেই মতের অমিল ঘটলেই লেখকের মতিচ্ছন্নতায় বিস্মিত হই, এবং সেই সঙ্গে বিস্মৃত হই যে সাহিত্যের রসাস্বাদ ঐকমত্যের অপেক্ষা রাখে না, এবং ঐকমত্যই যেখানে অধ্যয়নের একমাত্র প্রচোদক সেখানে অনধ্যায়ই শ্রেয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। "অন্বীক্ষা"র নবম খণ্ডে—যেখানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বরূপ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে—টয়েনবি অনিবার্যভাবেই কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়েছেন। এই সাক্ষাৎকার স্বাগত সংবর্ধনা নয়, বরং সঙ্ঘর্ষই বলা চলে ; কারণ টয়েনবির মানসতা এবং সংস্কার বৃটিশ উদারনীতিক ধারার অনুগামী। কিন্তু "উদারনীতি"র প্রতি তাঁর এই প্রীতি তিনি মোহগ্রস্তের মতো ব্যক্ত করেন নি, স্বভাবসুলভ ধীরতার সঙ্গে একটির পর একটি তথ্য-নিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে দেখতে চেয়েছেন কেন অনবদ্য না হয়েও এই নীতি শ্রেণী-বিরোধের প্রতিকাররূপে তাঁর কাছে আদরণীয় মনে হয়েছে। আদর্শ হিসেবে তন্ত্রের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান, তাঁর আপত্তি এর রাষ্ট্রিক বিগ্রহের নির্বিচার অর্চনায়।

পূর্বেই বলেছি, ঐতিহাসিকরূপে টয়েনবি প্রায়োগিক, বাস্তবনিষ্ঠ ; তাই সমাজনীতির ক্ষেত্রে উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার তাঁর মানদণ্ড : "ফলেন পরিচীয়তে"। অতএব ফল যদি উপাদেয় না হয়, বিমূর্ত নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য কেবল মূঢ়তা নয় নির্দয় অমানুষতা। শ্রেণী-সংঘর্ষ থেকে নিস্তারের একমাত্র শান্তিপূর্ণ পথ যা এই মুহূর্তে (অর্থাৎ শতাব্দীর মধ্যপথে, যখন ঐ অধ্যায়টি লেখা হয়) দৃশ্যমান তা হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ : an illogical combination of a modicum of economic enterprise with a modicum of govern-

mental planning and regimentation in the interests of social justice.

এই "illogical" (অযৌক্তিক) শব্দটি বিশেষ অর্থবহ। শ্রেয়োবোধের সঙ্গে যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ নীতির (যথা সমাজতন্ত্র) যদি বিরোধ ঘটে, তা হলে নীতিভ্রষ্ট হওয়াটাই নিঃসংশয়ে শ্রেয়স্কর ; অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে মতবাদের নৈষ্টিক কৌলীন্যের চেয়ে করুণ ঢের বড়ো জিনিস। করায়ত্ত নির্বাণমুক্তিকে ছুনিবার প্রলোভন সত্ত্বেও সিদ্ধির তোরণে উপনীত বোধিসত্ত্ব যে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—টয়েনবির কাছে মহত্ত্বের এত বড়ো দৃষ্টান্ত আর নেই, যদিও যুক্তির দিক থেকে এটা মূঢ়তাই হয়েছিল বলতে হবে।

এই ব্রিটিশ-স্ক্যাণ্ডিনেভীয় শান্তিপূর্ণ মধ্যপন্থার ছুটি (টয়েনবির মতে) বিশেষ গুণ : নমনীয়তা এবং ভাবাবেগের উত্তাপহীনতা। বলা বাহুল্য, ছুটোর কোনোটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে নাটকীয় উন্মাদনার সঞ্চার করে না ; সম্ভবত সেই কারণেই টয়েনবির রচনায় নাটকীয় গুণের প্রচুরতা সত্ত্বেও শুদ্ধ নীতির গোঁড়া ভক্তদের কাছে তিনি "প্রতিক্রিয়াশীল", অতএব অশ্রদ্ধেয় এবং অনধ্যেয়। দৃষ্টির পার্থক্য এমন কি বৈপরীত্য সত্ত্বেও যে-কোনো গ্রন্থ রচনা হিসেবে উপাদেয় হতে পারে এটা উত্তাপ এবং উত্তেজনাপ্রিয় মতবাদ-সর্বস্ব বর্তমান যুগে বিশ্বাস করাই কঠিন।

কেবল মতুয়ারির মাতামাতি নয়, নিছক ভুল বোঝা থেকেও এটা ঘটতে পারে। এরকম ভ্রান্তি অথবা বিকৃত বুদ্ধি সঞ্জাত রন্ধ্র সন্ধানের একটি দৃষ্টান্ত—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথিতনামা সুলেখক আচার্য ওয়ালটার কাউফমান। তাঁর একটি গ্রন্থে তিনি টয়েনবির তীব্র সমালোচনা করেছেন, কারণ "অন্বীক্ষা"র ছত্রে ছত্রে নাকি উৎকট ইহুদি-বিদ্বেষ প্রকট! পড়লে মনে হবে এটাই যেন টয়েনবির অন্যতম প্রতিপাদ্য!

কাউফমান অবশ্য দার্শনিক, ঐতিহাসিক নন। ঐতিহাসিকরাও কিন্তু কম যান নি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ওয়েল্‌স্‌-এর সেই আশ্চর্য "আউটলাইন অব হিস্টরি"। জনপ্রিয় কথাসাহিত্য-রচয়িতার এই অনধিকারচর্চা ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদের কাছে মনে হয়েছিল অমার্জনীয় স্পর্ধা; ফলে তুচ্ছ তথাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে তাঁরা এতই ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে গ্রন্থটির অসাধারণ উৎকর্ষ হয় লক্ষ্যই করলেন না, কিংবা উপেক্ষা করলেন, কিংবা লক্ষ্য করেও চুপ ক'রে রইলেন অগণিত মুগ্ধ আনাড়ি পাঠকের সঙ্গে পার্থক্য-রক্ষার প্রয়োজনে।

টয়েনবির ক্ষেত্রে অবশ্য এদিক থেকে একটা অসুবিধা আছে, সেটা হল: ইতিহাসচর্চা তাঁর পক্ষে আর যা-ই হোক, অনধিকারচর্চা নয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা এখানে নিরস্ত্র হলেও এতো সহজে নিরস্ত হবার পাত্র নন; "অন্বীক্ষা"র বিশাল সৌধের আনাচে-কানাচে সঞ্চালিত হল তাঁদের রন্ধ্রসন্ধানী শ্যেন দৃষ্টি; ধরা পড়তে লাগল একের পর এক "স্খলন-পতন-ত্রুটি"।

এটা অবশ্য টয়েনবির কাছে অজানা ছিল না, এসব জেনে শুনেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর অসমসাহসিক, দুশ্চর তপস্যায়। "অন্বীক্ষা"র দশম খণ্ডে এই সাধনার স্বরূপ গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। এ-বিষয়ে তাঁর মূল বক্তব্য: কোনো বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন ক'রে তবেই কিছু লিখতে আরম্ভ করা উচিত, একথা যাঁরা বলেন লেখা তাঁদের কোনো দিনই শুরু হবে না। কারণ খুবই সোজা: প্রস্তুতি তাঁদের কোনো দিনই সম্পূর্ণ হবে না; আয়োজন শেষ হবার আগেই ফুরিয়ে যাবে কেবল যৌবনই নয়, সম্ভবত জীবন। কাজেই বড়ো কিছু লিখতে হলে আলোচ্য বিষয়ে পূর্ণজ্ঞ হবার আশা ছাড়তে হবে, এবং সম্ভব হলে যৌবন অতিক্রমণের পূর্বেই রচনায় হাত দেওয়া উচিত, নচেৎ আরব্ধ কার্য অনিশ্চিত

আয়ুষ্কালের খামখেয়ালির জন্য অর্ধপথেই স্তব্ধ হয়ে যাবার শংকা থেকে যায়।

তা ছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে—টয়েনবি বলেছেন—পূর্ণজ্ঞতা অর্জনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় রচনার উপক্রম বিলম্বিত করা চিত্তের নম্রতা নয়, বরং স্পর্ধাই সূচিত করে ; কারণ, সর্বজ্ঞতা এমন একটি ঐশ ধর্ম যা মর্ত্য জীবের অধিগম্য কোনো দিনই হবে না, হতে পারে না। অতএব এই অমর্ত্য মরীচিকার অনুসরণে বৃথা কাল-ক্ষেপ না ক'রে রচনায় যথাসম্ভব শীঘ্র হস্তক্ষেপ করাটা কেবল সহজ বোধের নয়, যথার্থ আস্তিক্য বুদ্ধি-প্রণোদিত নম্রতারই দ্যোতক।

টয়েনবি তা-ই করেছিলেন। যৌবনেই আরম্ভ করেন "অন্বীক্ষা"র পর্বতপ্রমাণ-উপকরণ-সংগ্রহ, চল্লিশে পৌঁহবার আগেই শুরু করে দেন "ইতিহাস-অন্বীক্ষা"। প্রথম ছ'টি খণ্ড দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই (অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন দশ বৎসরের মধ্যেই) সমাপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় অন্য জরুরি কাজে ব্যাপৃত থাকায় দীর্ঘ ছেদ পড়ে রচনায়। যুদ্ধ অবসানে আবার লিখতে শুরু করলেন ; শতাব্দীর মধ্যপথে সমাপ্ত হয় শেষ (দশম) খণ্ড (পরে আরো দুটি খণ্ড সংযোজিত হয়)।

খুঁটিনাটির ব্যাপারে অত্যন্ত যথাযথ, এবং অপ্রমত্ত লেখক হয়েও টয়েনবি জানতেন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকবেই, জানতেন এই দীর্ঘ রচনাকালের মধ্যে অনেক নতুন তথ্য অনাবৃত হবে। এসব জেনে শুনেই তিনি যাত্রা শুরু করেন, এবং দীর্ঘ আয়ুষ্কাল পূর্ণ হবার অনেক পূর্বেই গন্তব্যস্থলে উত্তীর্ণ হন।

"অন্বীক্ষা" সমাপ্তির পরও তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়ে যায় নি ; পরবর্তী কালেও বেশ কয়েকটি বই লিখে গেছেন, যার একটি হল তাঁর অপূর্ব আত্মচরিত। লক্ষণীয়, "অন্বীক্ষা"র পরে লেখা এই

বইগুলির ভাষা ঠিক এক নয়, তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে। দরকার হলে যে তিনি অত্যন্ত সরল, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভাষায় লিখতে পারতেন তার প্রমাণ এই ষাট-বছর পেরিয়ে লেখা "অন্বীক্ষা"-উত্তর রচনাবলি। এ দু'য়ের সঙ্গেই যাঁরা পরিচিত এমন কোনো পাঠকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, এই শেষের বইগুলির প্রায় কথাভাষার সহজ ভঙ্গিতে তিনি "অন্বীক্ষা" কেন লিখলেন না।

এর উত্তর (যা পূর্বেই আভাসিত) : মিলটনের মেঘমন্দ্র যেমন তাঁর ছোটো কবিতায় শ্রূয়মাণ নয়, মহাকাব্যেই, তেমনি মহাকাব্যের সঙ্গেই তুলনীয় বিশাল "ইতিহাস-অন্বীক্ষা"র ভাষা একেবারে প্রাকৃত এবং অনলংকৃত হলে তার ভাবগৌরব এবং গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হত। "অন্বীক্ষা"র সংক্ষেপকর্তা সমারভেল এটা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর হ্রস্বীকৃত সংস্করণ অতি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও খেদ ক'রে বলেছেন, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো সম্ভব নয়।

একটু আগে "গম্যস্থল" কথাটা ব্যবহার করেছি। টয়েনবির শেষ গম্যস্থল কিন্তু অন্বেষণ করতে হবে অন্যত্র, যেখানে তাঁর শুধু ইতিহাসচর্চার নয়, সমস্ত কর্মচেষ্টা সমস্ত মানস-ব্যাপ্রিয়ার পর্যবসান। পূর্বেই বলেছি কী সেই পরম প্রেরণা তাঁর, সমগ্র জীবনের শেষ লক্ষ্য : চিত্তশুদ্ধি ; যার অর্থ (তাঁর কাছে) সর্ব-প্রকার অহংকেন্দ্রিকতা হতে অতিক্রান্ত চিত্তের ভূমায় উত্তরণ।

ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, প্রতীচীর প্রাচীন সাহিত্যে নিবিড়-ভাবে নিষ্ণাত টয়েনবির তীব্র সাম্প্রত্য-চেতনা ; তাঁর পুরাবৃত্ত-বর্ণনায় অতীত যে এমন জীবন্ত, এমন আশ্চর্যভাবে তাৎপর্যময়, তার অন্যতম কারণ এইটাই। শুধু বর্তমান নয়, অনাগতের সম্ভাবনাও—বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে—

কোথাও কোথাও আভাসিত। কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে আছে আর একটি চেতনা, যা ত্রিকালে পরিব্যাপ্ত হয়েও সমস্ত কালভাবনার উর্দ্ধে। এ হল স্পিনোজার ভাষায় সেই "সুব স্পীকিয়ে আয়টেরনিটাটিস"—চিরকালের চোখে সব কিছু দেখে যাওয়া। টয়েনবির ক্ষেত্রে এই দৃষ্টির মূলে রয়েছে এমন কিছু যা ঐতিহাসিক চেতনার উর্দ্ধে, এমন কি দার্শনিক চেতনা বলতে যা বুঝি তারও গভীরে : অধ্যাত্মচেতনা। আমাদের দৃষ্টিতে তিনি বড়ো ঐতিহাসিক, বড়ো লেখক এবং মনীষী। তাঁর নিজের কাছে কিন্তু তাঁর সর্বশেষ পরিচয় এর কোনোটাই নয়। সেটা হল—তিনি সাধক। এবং এই সাধনা গভীরতম অর্থে—অধ্যাত্মসাধনা।

[৩ বছর ১ সংকলন]

আলোক সরকার

রাখাল

অবিমিশ্র একটা অবকাশ, তার প্রগাঢ়তা
অকূলবিস্তীর্ণ সেই বর্ণহীন
অশ্বেত অকৃষ্ণ অরক্তিম আর

বিশাল অকল্পন একটা হ্যাঁ।
অপূর্বঅর্জিত এই অভিজ্ঞতা
এই আধিপত্য—অবকাশ যেহেতু, এবং

অবিমিশ্র অর্থাৎ প্রথমতা অর্থাৎ
সম্ভাবনাহীনতা অর্থাৎ
সেই মৃত্যুময় রাখাল আর মধ্যাহ্নবৈশাখ

আর সেই বংশীধ্বনি, ঘূর্ণিধূলো
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা
মৃত্যুকীর্ণ উচ্চারণ ; এই নিশ্চয়তা এই থাকা

নিদ্রাশীতল ওই রাখাল। আর অনিবার্য
সেই গাভী-প্রলম্বিত
অসম্পৃক্ত ধ্বনি শূন্যতা পার হয়ে

আরো আরো শূন্যতা পার হয়ে
অশ্বেত অকৃষ্ণ অরক্তিম
পার হয়ে ডাক এগিয়ে যাচ্ছে, ডাক

তাৎপর্যহীন প্রস্তাবহীন নিবিড়তা
অবকাশ অকপট অনাকাঙ্ক্ষী
কেবল এই অবিসংবাদিত আর নিদ্রাশীতল ওই রাখাল।

কবিতা সিংহ

কে এসেছে

কে এসেছে দুখ ভেসেছে
আকাশ জোড়া দস্তক
কাঁপছে পাহাড় দুলছে আকাশ
শরীর আপাদমস্তক !

সে এসেছে যাহার আশা
জন্ম থেকেই জমজ
কর্নে বুকে ভালোবাসার
কুণ্ডল আর কবচ।

প্রার্থনা

হে আমার উন্মাদিনী অমা
কবে তুমি দীপবৃক্ষ হবে ?
কবে তুমি নিকষ পাথরে—
কৃষ্ণ-শিখার ঝাড়ে হবে ঝঙ্কারিত—
হে আমার ভিতরে সঞ্জাত গূঢ় ক্ষমা
হে আমার আত্মবোধিনী গাঢ় রাত
তমসা-সংঘাত ভাঙে করকা ফুল্‌কি
ছাখো একা
হে আমার নিশার আঘাত !
কবে তুমি উদ্‌ঘাটিত হবে ?
কবে তুমি মাংসে মুকুলে রক্তে
লসিকায় ক্লোমে আনন্দ ওঠাবে
কৃষ্ণধ্রুপদী বর্ণে ব্রহ্মকমলিনী

অনন্ত ফোটাবে !

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তুতুরী

আর কোনো বাঁশীর ব্যাপার জানা নেই, শুধু এই সাপুড়ের যন্ত্রটুকু ছাড়া ; কোনো তেজ নেই—শুধু ফিল্মি গান যেই উচ্চৈঃশ্রবায় বেজে দিগ্বিদিকে হাউই আমি তার আঁচে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকি ; যেহেতু আমার মন রেফারির বাঁশীর চেয়েও অসহায়, জানি চুম-মন্তরে জাগবে না সাপ সহস্রারপদ্ম ছুঁয়ে কখনো নেচে উঠবে না

কুলকুণ্ডলিনী তবু এক ধ্বনির হাফরে জ্বলে মরি আর বাঁশী যেন
আমার বিধবা মেয়ে, ডেকে উঠি 'তুতুরী' ! 'তুতুরী' !

ধূম্রাঞ্জন

ক্রমাগত ওরা একটার পর একটা ভুল করে চলেছিল ঘুমের সঙ্গে
মৃত্যুকে আর মৃত্যুর সঙ্গে মাটির খাঁচায় মৌমাছিপালন খুব
একাকার করে দিয়ে শেষে ক্যান্টিনে গিয়েও শুধু নিজের-নিজের
নাম ভাঙিয়ে কবিতা পড়ছিল তবু সে সমস্ত কবিতার মধ্য থেকে
হোমাগ্নি না উঠে শুধু চক্রাকারে উড়ছিল ধোঁয়া আর হঠাৎ
একবার তার আনন্দ আয়নায় ওরা দেখতে পেল

এপিক অনামিকতা আঁকা কার্তিকের আকাশে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কাজ করার সময়

এখন ঠিক কাজ করার সময় ।
বুক চিরে কে চালালে করাত ? বাথা হয় ।
কাজের সময়ে এতো রক্তপাত ভালো, তুমি বলো ?
মেঝেতে আমার চটি অপলক তাকিয়ে রয়েছে—
চাঁদ-মুখ আলার্ম-ঘড়ির কোনো ঘুম নেই, তারও কাজ আছে ।
এখন তো জাল গোটানোর দিন, অপমান ফিরিয়ে দেবার অবসর ।
এরই মধ্যে রক্তের সমুদ্রে স্নান সেরে তীরে ওঠা যাবে ?

দেয়ালে পিঁপড়ের দল সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে ।

বালিয়াড়ি

হাওয়া ঠিক ভেতর দিকটা খুলে দিয়েই চ'লে গেছে —
যেন মস্ত বালিয়াড়ি, বালি ঝরছে সমস্তক্ষণ নিচে,
প'ড়ে যাচ্ছে, আমরা ধ'রে রাখতে চাই, তবুও পারছি না,
কোথাও আল্‌টপকা ধুলো ঝাউয়ের গোড়ায়
খেলা করছে একা,
কাছে কোথাও সমুদ্র তার ডানা ঝাপ্‌টে কেঁপে উঠছে এখন।
ভেতর খোলা, বাইরে শুধু অনন্তকাল ধূ ধূ—
যেন মস্ত বালিয়াড়ি ; বালি ঝরছে, বালি ঝরছে, বালি ॥

পার্থসারথি চৌধুরী

দুঃখের সনেট

১ ॥ কবিতার

প্রথম ছত্রের স্ফূর্ত সাবলীল মিত ভাষণের
পরেও লিখতে হয় শৃঙ্খলিত কয়েক চরণ,
চঞ্চল মনের গত ঊর্ধশ্বাস, পদপাতে ফের
ফিরে আসে, ভাবনার হাত ধরে ; এমনই ধরন
কবিতার। রূপতৃষ্ণা জেগে ওঠে, লঘু অবসাদ
শরীরে জড়ানো, সাময়িক বিভ্রমবিস্তার
চিরচেনা সন্ধ্যালোকে, রিক্তমনে প্রেমের বিষাদ,
সাধ্য নর্ম, আপাতত দুঃখহীন জল্পিত নিস্তার।

ভিড়ের সাজুয্যে আর প্রবোধের লেশমাত্র নেই,
সময়তাড়িত আয়ু শূন্যগর্ভ শ্মশানের ডাকে

দিনে দিনে ক্ষীণতর, হতাশার বৈতরণীতেই
জীবনের স্মৃতিসুধা ফেলে দিয়ে যেতে হয় তাকে ।
এমন ধ্রুবের বোধে নষ্টবাক্ মূঢ় বর্তমান
প্রথক ছত্রের স্ফূর্তি পায় কবে অবার্থ সন্ধান ।

২ ॥ জীবনের

মৃদঙ্কের জন্য কাঁদে স্বর্ণতনু চরনযুগল,
বাসনার বিম্বফল খুঁটে খায় তামস বায়স,

পথের করুণ কান্তি হেলা সয়, বিগতসম্বল
পড়ে থাকে, কাঁটাবনে শিবাদলে রূপান্ধ সাজস ।
প্রকৃতির অভিযোগ ফুরায়েছে, কল্পান্ত আলসে,
বিষমের ব্যভিচারী স্পর্ধা বাড়ে, দুষ্ট সন্নিপাত
ধ্বংসের বাসর জাগে, বাড়বাগ্নি প্রাণধাত্রী রসে
শুকায়, বীজের ভাণ্ড জ্ব'লে থাক, শেষ অপঘাত ঃ

ছন্দ হর, প্রেম নাশ, ব্যবধান গড়ে তোলো ক্রমে
কৃতার্থ মানবদ্বন্দ্বে, প্রয়াসের ব্যথার সুরভি
মুছে ফেলো, আকস্মিকে চতুর লালসা হানো, ভ্রমে
মজাও মনের মধু, নাচনের অনুপান সবই ।
লভ্যহীন তাৎক্ষণিকের এই বন্ধ্যা শিলাতল,
মৃদঙ্গের জন্য কাঁদে দগ্ধতনু চরণযুগল ।

অমিতাভ গুপ্ত

সূর্যমুখী

যে আমার ব্যক্তিগত আভাটিকে ছড়ালে আকাশে
জবাকুসুমসঙ্কাশ

যে আমার অপমানবোধ আজ ধীরেধীরে নম্র হ'য়ে আসে
সত্যের অপিহিত মুখ

যে আমি দেখেছি ব'লে, এতদিনে, আঘাতে বিন্যাসে
সূর্যমুখীটির

লাবণ্য ফুটেছে আজ—যে কুঁড়ি জাগেনা দীর্ঘশ্বাসে
আমি সেই অম্লান ফুলের

অঞ্জলি দিয়েছি তুলে, আমারই উদ্দেশে, অনায়াসে
আমাকে কি আত্মভুক্ বলো ?

মরুবিজয়

অবিবাহবন্ধনে যারা বেঁধেছে আমাদের তারা টের পায়নি আমার
পাপ ও পুণ্যের কোনো ভাষা জানা নেই

যেটুকু আমার জানা তা' হ'ল এই : মাঠের প্রান্তে ছোট গ্রাম
ক্ষতবিক্ষত একটি মানুষ আকাশের দিকে বাড়িয়েছে তার হাত

তখন ভোরবেলা, আলপথে পড়ে থাকা শিশিরের ফোঁটা ধীরেধীরে
চোখের জলের মতো মুছে যাচ্ছে, মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে কে

আমার যেটুকু জানা তা' হ'ল এই—আষাঢ়ের মেঘ এবার
কৃপণ, কিন্তু আগামীবছর নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে

ধানক্ষেত উপচে পড়বে আলপথে—এবং সেই কৃষকটি, একা
তার ভালবাসার বুকে সিঁদুরের মতো রক্ত ঝরিয়ে চলে যাবে।

সুরজিৎ ঘোষ

শঙ্খ

সময়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছি,
শহর-সীমানা ছেড়ে সমুদ্র-যন্ত্রণার তীরে
সমস্ত কুটিল ব্যাধি, অবিশ্বাস, গোপন সংশয়
তপ্ত বালুকণা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই জলের কিনারে।

জলের গভীরে কোনো মিথ্যে নেই, শুধু শর্তহীন আসাযাওয়া
কখনো গড়ানো ঢেউয়ে, কখনো আকাশ ছুঁয়ে
ভেঙে পড়ে লক্ষ সূর্য আতসবাজির ছন্দে
যেদিন যেমন থাকে জীবনের বিচিত্র আবহাওয়া।

আমার কেবল এই কূলে বসে চোখ ভরে দেখা
যা গেছে অসাবধানে আগের ঢেউয়ের টানে
যদি তা ফিরিয়ে আনে অন্য কোনো তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
অসম্ভব সেই প্রতীক্ষায়, ভারি হয়ে ওঠে অবকাশ।

ফেরার সময়ে তার কিছুই পারিনা নিয়ে যেতে
শুধু বোঝা বাড়ে যত টুকিটাকি জিনিষের ভারে
অসংখ্য বান্ধবের ছোটো ছোটো অনুরোধ না পেরে এড়াতে
বাক্স ভরে ফেলা হয় বোতাম, চিরুণি শাড়ি দামীদামী তুচ্ছ
উপহারে।

এই নির্জন বাসে সমুদ্র যা দিয়েছে আমাকে
তার সবটুকু রাখি, তেমন জায়গা নেই শহরে আমার ছোটো ঘরে ;
শুধু তার অনন্ত জিজ্ঞাসা, ঘুরে ঘুরে যে আমাকে ডাকে,
তাকে নিয়ে যাব সঙ্গে সন্তীর শঙ্খের শরীরে।

মেঘমল্লার

কাল সারাদিন খুব মেঘ ছিল, গোমড়া আকাশ
ভি, আই, পি, রোড হয়ে কৃষ্ণনগরের রাস্তা ধরে
কল্যাণীর দিকে চলে গিয়েছিল। যাওয়ার সময়
একবারও তাকিয়ে দেখেনি, নিচে কারা আছে
এমন বিষণ্ণ দিনে কারা খুব ভালোবেসে বাঁচে ;
আমি কিন্তু দেখতে ভুলিনি,
গতকাল ঠিক সে সময়, আমিও একই রাস্তা দিয়ে
যাওয়ার সময় খুব আলগোছে দেখে গেছি
কারা যেন রেখেছে ভিজিয়ে
নীল পাঞ্জাবির সঙ্গে বাসন্তী রঙের শাড়িখানি।
সারাদিন মেঘলা আকাশ আর ভীরু আলোছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে
বাড়ি থেকে লুকিয়ে পালিয়ে
হাত ধরাধরি করে বেড়িয়েছে তারা ঐ বড়ো জাওলির খোলা মাঠে।

সারারাত সেই ছবি ঘুরে ঘুরে এসেছিল
কলকাতার নিঃসঙ্গ খাটে।
জানতে পারিনি শেষ বৃষ্টি কখন এসে থমকেছে
বন্ধ কপাটে।

ভাঙা-গড়ার সংকটলগ্নে ইয়োনেস্কো

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ফরাশি দেশে যে-সুর তুলেছিলেন স্যুররিয়ালিস্টরা, দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘ'টে যেতে সে-সুর সপ্তমে চ'ড়েছে 'দ্য মিথ্ অফ সিসিফাস্' থেকে অ্যাব্সার্ড নাটকে। ফরাশি মঞ্চে শুরু হ'লো জীবনের ভাঙচুর।

যন্ত্রণা ও মৃত্যুর দ্বারা সীমিত এই জীবন অর্থহীন ও হাস্যকর, আর হাস্যকর ব'লেই জীবন ও জীবনধারী মানুষজীব বস্তুবিশেষ ; এবং থিয়েটার যেহেতু বস্তুর প্রদর্শনী নয়, তাই মঞ্চের উপর তার ধ্বংস ও রূপান্তরণ জরুরি। —অ্যাব্সার্ডিস্ট ইয়োনেস্কোর এই beyond-তত্ত্ব (যদিও একাধিকবার তিনি ঘোষণা করেছেন যে নাটকে কোনো তত্ত্ব আরোপের পক্ষপাতী তিনি ন'ন !), যা তাঁর সব নাটকেরই অলংকার, এক জটিল জাল বিস্তার করেছে তাঁর অপেক্ষাকৃত কম পঠিত 'দ্য পিক্চার' নাটকে। সম্প্রতি (১৩ আগষ্ট, '৮৩) কলকাতার জ্ঞানমঞ্চে ক্যালকাটা ডিবেটিং সোসাইটি নিবেদিত ইয়োনেস্কো-প্রযোজনা সেই সুবাদে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তরুণ পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন্ নাটকটিতে এমন একটি মাত্রা সংযোজন করেছেন যা ইয়োনেস্কোর সুপরিচিত নাট্যতত্ত্বকেই রক্ষা করেছে, নচেৎ এই একটি নাটকেই বস্তুত চুরমার হ'য়ে যায় ইয়োনেস্কোর নিজেরই তত্ত্ব। —হ'য়ে যায় ? নাকি সচেতনভাবেই চুরমার করতে চাইলেন নাট্যকার তাঁর সযত্ন-লালিত জীবনদর্শন ? অ্যাব্সার্ড মনে হ'লো নিজেরই তাঁর অ্যাব্সার্ডিস্ট ভাবনা ?

নইলে কেন ইয়োনেস্কো এবার তাঁর নাটকের কেন্দ্রচরিত্র করলেন একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে, যার শোষণের শিকার

হ'লো খোদ একজন শিল্পী ? আর সি. ডি. এস-এর প্রযোজনায় এমনই এক বিন্দুতে এই শোষণ পরিচালিত হয়েছে, যা নাটকের মূল সুরের সঙ্গে অসঙ্গত হয়নি মোটেই, অথচ যেখানেই কেঁপে উঠেছে ইয়োনেস্কোর ভিত্। অবশ্য এরই ফাঁকে শিল্পীচরিত্রের অস্পষ্ট ও প্রায়-অনুচ্চারিত বাক্‌ভঙ্গির মাধ্যমে নাট্যকার যেন বোঝাতে চাইলেন যে চিত্রশিল্পের (নাকি যাবতীয় শিল্পকর্মের ?) ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, এমন-কি শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব নয় তাঁর নিজের শিল্পের বিশ্লেষণ করা, ঠিক যেমন 'দ্য আন্‌হায়ার্ড কিলার'-এ বেরেঁাার, কিংবা 'দ্য চেয়ার্স'-এ ওরেতর-এর মধ্য দিয়ে ভাষার প্রকাশক্ষমতার সীমাবদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। যদিও সমালোচক ডেভিড গ্রস্‌ভোগেলের মতে, এ'সব চরিত্রে ইয়োনেস্কোর ব্যক্তিগত সমস্যা প্রতিফলিত। ফরাশি ভাষায় আত্মবিশ্বাসের অভাবে নাকি ভুগছিলেন রুমানীয় ইয়োনেস্কো, জানান তিনি। —তবে তো বেকেটের ক্ষেত্রেও একই কথা বলতে হয় ! কিন্তু, তা নয়। আসলে, ইয়োনেস্কোর তথা যাবতীয় অ্যাব্‌সার্ড নাটকের সতর্ক পাঠকমাত্রেরই জানা যে, সংলাপের চেয়েও অনুভব আর অভিজ্ঞতাই এঁদের নাটক ও থিয়েটারের বড়ো মূলধন। তা'ছাড়া, মানুষে-মানুষে কম্যুনিকেশন ফারাক জীবনের এক যন্ত্রণাদায়ক সীমিতি বোধ হয়েছে তাঁদের। (কিন্তু তাই ব'লে কখনোই তাঁরা আর্তু-র মতো নৈঃশব্দ্যচারী ন'ন।) এ-পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক্ আমাদের আলোচ্য নাটকে। যথার্থ ইয়োনেস্কোয়েস্ক্।

গোল বেধেছে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটিকে নিয়ে। কথা-বার্তায় হাবভাবে খাঁটি শোষক-মনোবৃত্তির জীব ; শিল্পীর ছবি কেনা নিয়ে তার আচরণে নাট্যকারের তীব্র খোঁচা দর্শকের দৃষ্টি এড়াবার নয়। ছবির নারীকে কেন্দ্র ক'রে যৌন কল্পনা ও সুন্দরের এক মায়াবী জগৎ নির্মাণে ভদ্রলোকের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায় তার ব্যাধিগ্রস্ত সহোদরা, অ্যালিস্। বিরক্তি প্রকাশে ভদ্রলোক

অবিরল উচ্চারণ করে "কুৎসিত" শব্দটি। ব্যস্, তারপরই ইয়োনেস্কোর সেই অমোঘ ফর্মুলা—সুন্দর-পিয়াসী ভদ্রলোক গুলিবিদ্ধ ক'রে হত্যা করে "কুৎসিত" ভগ্নীকে—অ্যালিস্ রূপান্তরিত হয় এক পাষাণপ্রতিমায়, অপরূপা-লাস্যময়ী। ভগ্নীর বন্ধু এক প্রতিবেশিনীও অনুরূপ শিকার হয় ভদ্রলোকের সুন্দর-পিপাসার।

নাটকের এই মূল পাঠ্যাংশের সঙ্গে সি. ডি. এস-এর প্রযোজনায় অশোক বিশ্বনাথন্ শিল্পীকেও দাঁড় করিয়েছেন ভদ্রলোকের ধ্বংস ও রূপান্তরণের শেষ শিকার হিসেবে। শিল্পী রূপান্তরিত হ'লো এক অনিন্দ্যকান্তি রাজকুমারে। তাতে নাটকটিতে ব্যবসায়ী চরিত্রটির প্রতি ইয়োনেস্কোর ব্যঙ্গ চরম ক্ষুরধার হ'য়ে উঠেছে। সন্দেহের সামান্যতম অবকাশ রইলো না যে, নাটকটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি এক তীব্র বিষোদ্গার, সঙ্গত-ভাবেই যা অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে। কিন্তু, বর্তমান লেখকের ধারণা, এই বিষ আরো অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে, একেবারে ইয়োনেস্কোর ভাবনার শিকড় অবধি।

কারণ, ব্যবসায়ীর নিষ্ঠুর ও অ-মানবিক আচরণ তো কেবল শিল্পীর প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার ভগ্নী এবং প্রতিবেশিনী (নাটকের অবশিষ্ট দুই চরিত্র)-ও তার অত্যাচারের শিকার। সুন্দরের সন্ধানে বাস্তবকে (ইয়োনেস্কোদের ভাষায় "অ্যাব্সার্ড ফোর্সেস") ধ্বংস ক'রে যেভাবে এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি, আদতে তাই কি নয় ইয়োনেস্কোর শিল্প-তত্ত্বের মূল বক্তব্য? তা'হলে কি এই সূত্রই বেরিয়ে আসছে না যে, যাবতীয় অ্যাব্সার্ড নাটকগুলিই বুর্জোয়া মানসতার ফসল? —তবে কি নাটকটি ইয়োনেস্কোর নিজের ডালেই কুঠারাঘাত নয়?

অথচ সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, অ্যাব্সার্ড তত্ত্ব রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা নিছক হুজুগমাত্র নয়,

এর মূলে রয়েছে সর্বপ্রকার রাজনীতিক আঁচ থেকে, মায় শোষণ-লিপ্সু, বণিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূরে স'রে শিল্পচর্চার তাগিদ। বস্তুত, অ্যাব্‌সার্ড তত্ত্বের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ধরা পড়ে উনিশ শতকী প্রতীকীবাদের, ফরাশি ভূমিতেই যার সূচনা, যে-আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিলো শিল্পবিপ্লব প্রভাবিত যন্ত্র ও বণিক-সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ-স্বরূপ, "বিশুদ্ধ শিল্প" সৃষ্টির আর্তি রূপে। সূক্ষ্ম বিচারে, "বিশুদ্ধ শিল্প" ও অ্যাব্‌সার্ড শিল্প দুই-ই রোমান্টিকতার নামান্তর (নব্য রোম্যান্টিক !), অধিকন্তু অ্যাবসার্ড তত্ত্ব আত্মঘাতী দর্শন। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তাত্ত্বিক মূল্যবিচারে যা-ই হোক্, সাহিত্যিক আন্দোলন হিসেবে দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত নাটকটি তার আঙ্গিকের লজিকেই বিচার্য।

অ্যাব্‌সার্ড তত্ত্ব যে মূলতই বুর্জোয়াতন্ত্র-বিরোধী, তা শেষ-পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সি. ডি. এস-প্রযোজনার শেষ দৃশ্যে—ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি যখন সবশেষে দর্শকদের উদ্দেশে বলছে : "shoot me"। এটা কখনোই বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত মানুষের উক্তি নয়, হওয়া সম্ভব নয়, প্রত্যাশিত ছিলো না ইয়োনেস্কোর সৃষ্ট এই চরিত্রটির মুখেও। পরিচালকের এই সংযোজনে একটা চমৎকার পোলারাইজেশন হয়েছে, এবং তার ফলেই নাটকটি হ'য়ে উঠেছে ইয়োনেস্কোয়েস্ক্—অ্যাব্‌সার্ড তত্ত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'লো। অথচ নাট্যকার স্বয়ং কিন্তু ব্যবসায়ীকে এতোদূর পর্যন্ত চালিত করেননি, যেহেতু নাটকটি ভিন্ন মাত্রায় শেষ করেছেন তিনি, যা একটু আগেই বিস্তর আলোচনায় দেখা হ'লো আমাদের।

সুতরাং, অশোক বিশ্বনাথনের শেষ সংযোজনটুকু প্রার্থিত কিনা, সে-বিষয়ে অ-ফরাশিভাষীর পক্ষে এক্ষুণি রায় দেয়া সম্ভব বা সঙ্গত নয়। কারণ, ইয়োনেস্কো যদি আস্থা হারিয়ে থাকেন অ্যাব্‌সার্ড তত্ত্বে, এবং নিছকই বুর্জোয়া-বিরোধিতা যদি তাঁর লক্ষ্য হ'য়ে থাকে (বুর্জোয়া বিরোধিতায় রূপান্তরণ-শৈলীর প্রয়োগ

ব্যঙ্গ-স্বরূপ হ'য়ে উঠেছে), তবে অশোকের শেষ সংযোজন অভিপ্রেত নয়, যেহেতু তা নাটকের বক্তব্যকেই ক্ষুণ্ণ করে। আর যদি তা না হ'য়ে থাকে, যদি তা নেহাৎই নাট্যকারের ট্রিটমেন্টের দুর্বলতা হ'য়ে থাকে, তবে বলতেই হবে যে, নাটকটির এবং সেইসঙ্গে ইয়োনেস্কোরও শেষরক্ষা করেছেন সুদূর কলকাতার এই তরুণ পরিচালক। এবং প্রযোজনাটি অসুস্থষ্টির এক বিরল কৃতিত্বে উজ্জ্বল। তবে নাটকটির বাইরে ইয়োনেস্কোর মানসিক বলয়ের পরিবর্তনের কোনো তথ্য ফরাশি ভাষা ছাড়িয়ে এখনো বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু সৃষ্টিকর্মই যদি প্রধান বিবেচ্য হয়, তবে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, নাটকটিতে ইয়োনেস্কো ভাঙা-গড়ার এক সংকটলগ্নে উপস্থিত।

যদিও ইংরেজি ভাষার মারফৎ শোনা হয়েছে আমাদের ইয়োনেস্কোর বহুল প্রচারিত উক্তি : **"I belong to cabaret school of literature"**—তথাপি, যেহেতু সাহিত্য-সমালোচনায় কোনো "কাবারে স্কুল" এখনো পৃথিবীতে গ'ড়ে ওঠেনি, এমন-কি কাবারের পীঠস্থান ফরাশি মুলুকেও নয়, তাই উপরোক্ত সব ভাবনা অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে ওঠে।

পরিশেষে, জরুরি উল্লেখ্য সি ডি এস প্রযোজনায় ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের ভূমিকায় এন. বিশ্বনাথনের অভূতপূর্ব অভিনয়। বাচনভঙ্গিতে, হাবভাবে, এবং প্রতিটি মুদ্রায় বিশ্বনাথনের বিকল্প অভাবনীয়। শিল্পীর চরিত্রে ইয়োনেস্কোর মানসতা সুন্দর প্রকাশ করেছেন ঈষাণ দত্ত। অ্যালিস্-এর ভূমিকায় মালিনী গুহ-ও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। মঞ্চ পরিকল্পনা এবং আলোর ব্যবহার চমৎকার। সব মিলিয়ে এক দুর্ধর্ষ ও অবিস্মরণীয় ইয়োনেস্কো-প্রযোজনা। পৃথিবীর তাবৎ ইয়োনেস্কো-রসিকদের একান্ত দর্শনীয় কলকাতার এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি প্রযোজনাটি।

'বলাকা'র ছন্দ প্রসঙ্গে

নীলরতন সেন

বাংলা ছন্দমুক্তির বিবর্তন-ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী যুগে গদ্যকবিতা রচনাকালে (১৯৩২-৩৬) কবি সে কথা তাঁর 'গদ্য-ছন্দ' নামক ভাষণ-প্রবন্ধে স্মরণ করতে গিয়ে বলেছিলেন,

> পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে সুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিশেষরূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরোনো বাড়ির অন্দরমহল ; তার দেয়ালগুলো সরানো হয় নি, কিন্তু আধুনিক কালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল আমলের তৈরি ইমারতে সেই দেয়ালগুলো ভাঙা শুরু হয়েছে। চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র একক বিতায় 'লিখেছিলুম, তার নাম নিষ্ফল প্রয়াস (আসল নাম 'নিষ্ফল কামনা')। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য় 'পলাতকা'য়। এতে করে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এল বটে, তবু মেয়ে কম্পার্টমেণ্ট রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না।
>
> [ছন্দ, গদ্য-ছন্দ]

'বলাকা' এবং 'পলাতকা'র (১৯১৮) কবিতাগুলি লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পুরোপুরি প্রত্যয়ের সঙ্গে 'অমিত্রাক্ষর' থেকে আরও একধাপ এগিয়ে 'মুক্তক' ব্যবহার করলেন। তারপর ছন্দের বাঁধন থেকে কবিতার ভাবমুক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষায় অঙ্কগোনা

মাত্রার হিসেবও বর্জন করলেন। তারই নিদর্শন মিলছে পুনশ্চ (১৯৩২), শেষসপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬) এবং শ্যামলীর (১৯৩৬) গদ্যকবিতাগুলিতে। এই গদ্য-ছন্দ কিভাবে ছন্দমুক্তির পূর্ব দুটি স্তর : অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক : পেরিয়ে তাঁর কাব্যে স্থান করে নিয়েছিল তারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

বাংলা কাব্যে ছন্দমুক্তির মুখ্য তিনটি স্তর হল : অমিত্রাক্ষর, মুক্তক এবং গদ্য-ছন্দ। অমিত্রাক্ষর মধুসূদন প্রবর্তন করেছিলেন সে-খবর কারও অজানা নেই। হেম-নবীনের হাতে এই অমিত্রাক্ষরের কিছুটা চরিত্রবদল ঘটেছিল। তারপর অমিত্রাক্ষর ভেঙে কাব্যে মুক্তকের প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ, নাটকে সে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর নাট্য সংলাপী মুক্তক 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ছন্দমুক্তির তৃতীয় স্তরে 'গদ্য-ছন্দ'ও রবীন্দ্রনাথের হাতেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং বলাকা এবং পলাতকায় ছন্দমুক্তির দ্বিতীয় স্তরের, অর্থাৎ মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বলাকায় রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তক ব্যবহার করেছেন, উচ্চারণ-রীতির বিচারে তার মধ্যে দু'ধরনের ছন্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, ছন্দ-অনভিজ্ঞ পাঠকের সঙ্গে বাংলা ছন্দ-সূত্রগুলির প্রাথমিক পরিচয় সাধন প্রয়োজন মনে করি।

সেই আদি ও মধ্যযুগ থেকেই বাংলা কাব্যে মুখ্য তিন উচ্চারণ-রীতির ছন্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের সুপরিচিত নাম হল : মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত। প্রাচীন চর্যাগীতে এবং মধ্যযুগের ব্রজবুলি গানে মাত্রাবৃত্তের প্রচলন ছিল। বাকি সমস্ত কাব্যই, বিশেষ করে কাহিনীকাব্যগুলি অক্ষরবৃত্তে লেখা হত। আর, প্রবাদ বচনে, ছেলে ভুলানো ছড়াগানে, পাঁচালীতে, লোকগীতে স্বরবৃত্ত ব্যবহৃত হত। সুতরাং আধুনিক যুগের কবিতায় এই

তিন রীতির ছন্দই আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। পুরানো এবং আধুনিক ছন্দরীতিগুলির উচ্চারণে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। সে প্রসঙ্গ আর এখানে টানছি না। এবারে আধুনিক উচ্চারণে বাংলা তিন মুখ্য ছন্দরীতির পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

বাংলা ছন্দরীতির আলোচনা-সূত্রে দেখা যাবে, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলির মূল উপাদান হল, সিলেবল্। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র এর পারিভাষিক নামকরণ করেছেন, দল। এক একটি সিলেব্‌ল্ বা দল হচ্ছে, একবারের উচ্চারণে যে শব্দাংশটুকু পাওয়া যায় সেটুকু। এই দল উচ্চারণের দিক থেকে মুক্ত (open) এবং রুদ্ধ (closed)-দু'ধরনের হয়ে থাকে। 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দে র. বীন্. দ্র. নাথ্.—এই চারটি দল রয়েছে। সহজেই ধরা যাবে, এদের মধ্যে র. এবং দ্র. মুক্তদল, বীন্ এবং নাথ্ রুদ্ধদল। স্বরধ্বনির বেলাতে diphthong বা যুগ্মস্বরগুলি (ঐ, ঔ, আই্, আউ্, এই্, এও্ ইত্যাদি) সবই রুদ্ধদল।

এবারে দৃষ্টান্ত দিয়ে মাত্রাবৃত্তের পরিচয় নেওয়া যাক্,

বিজ্ঞানী দল এলো বার্লিন ঝাঁটিয়ে,
হাতপাকা জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ঘাঁটিয়ে।

[রবীন্দ্রনাথ, ছড়া-৪]

এ-অংশটি যুক্তবর্ণ ভেঙে উচ্চারণ অনুসারে রুদ্ধ-মুক্ত দলে সাজিয়ে লিখলে দাঁড়াচ্ছে,

২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১
বিগ্ গা নী / দল্ এলো / বার্ লিন্ / ঝাঁ টি য়ে,
২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
হাত্ পা কা / জন্ তুর্ / না ড়ি ভুঁ ড়ি / ঘাঁ টি য়ে।

[চিহ্ন সংকেত : / লঘু (পর্ব)-যতি। উপরের অঙ্ক দলের (সিলেব্‌ল্-এর) মাত্রাজ্ঞাপক।]

এখন প্রতি মুক্তদলে একমাত্রা এবং প্রতি রুদ্ধ দলে দুই মাত্রা হিসেবে উচ্চারণ ধরলেই মাত্রাবৃত্তের ৪ । ৪ । ৪ । ৩-মাত্রার ছন্দ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি চার-চার মাত্রায় যতি দিয়ে পড়বার ছন্দ এটি। এমন পাঁচ, ছয়, সাত মাত্রায়, (কদাচিৎ আট বা দশ-মাত্রায়) যতি দিয়েও মাত্রাবৃত্ত লেখা হয়।[১] এখানে বলে রাখি, মাত্রাবৃত্তে মুক্তদলে এক মাত্রা এবং রুদ্ধদলে দুমাত্রা—এই হিসেবে পড়বার সহজ পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের হাতেই পূর্ণতা পেয়েছিল। মাত্রাবৃত্তের এই মাত্রা বা পরিমাপের একক হল, উচ্চারণের সময়-ভিত্তিক মাত্রা, ছান্দসিকের পরিভাষায় 'কলামাত্রা'।

এবার অক্ষরবৃত্তের একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।

[রবীন্দ্রনাথ, চৈতালি, বঙ্গমাতা]

এ-শ্লোকটি যুক্তবর্ণ ভেঙে উচ্চারণ অনুসারে সাজালে দাঁড়াচ্ছে,—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সাত্ কো টি সন্ তা নে রে // হে মুগ্ ধ জ ন নী,
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
রে খেছ বা ঙা লী ক রে // মা নুষ্ ক র নি।

[চিহ্ন-সংকেত : // অর্ধ (পদ)-যতি]

মাত্রার হিসেব হল, মুক্তদলে একমাত্রা, রুদ্ধদলে শব্দশেষে দুমাত্রা,—অন্যত্র অর্থাৎ শব্দের সূচনায় বা মাঝে যুক্তবর্ণে লেখা হলে একমাত্রা,—কিন্তু অযুক্ত বর্ণে লেখা হলে কবি একমাত্রা বা দুমাত্রা—দুভাবেই ব্যবহার করতে পারেন। উপরের দৃষ্টান্তে 'সাত্' এককদ্ধদল শব্দ, শব্দশেষের রুদ্ধদলের হিসেবে, দুমাত্রায়

উচ্চারিত হচ্ছে। 'সন্তানেরে' র সন্ বা 'মুগ্ধ'-এর মুগ্ শব্দসূচনায় একমাত্রা হয়েছে; আবার 'মানুষ'-এর নুষ্-শব্দান্তে দুমাত্রা হয়েছে। আর একটি কথা। মাত্রাবৃত্তের তুলনায় অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণ কিছুটা বেশি সংশ্লিষ্ট (compact)। এখানে ছোটমাপের পর্বযতির পরিবর্তে দীর্ঘতর মাপের অর্ধযতি বা পদযতি প্রাধান্য পায়। সাধারণত জোড়মাত্রায়, আট, দশ বা ছয় মাত্রায় যতি পড়ে। উপরের দৃষ্টান্তে ৮॥ ৬-মাত্রার যতি রয়েছে; এই রূপা-দর্শের নামই 'পয়ার'।

অক্ষরবৃত্তে অযুক্তবর্ণে লেখা স্কন্ধদল রবীন্দ্রনাথ সাধারণত শব্দের মাঝে বা সূচনায় দু'মাত্রা ধরতেন। যেমন,

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বোল্ তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউ চাক,
এরি তরে মধুকর এত করে ডাক!
[কণিকা, হাতে কলমে]

কবি অযুক্তবর্ণে লেখা 'বোলতা' এবং 'মউচাক' শব্দদুটি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে যথাক্রমে তিন এবং চার মাত্রা ধরেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দুই এবং তিনমাত্রা ধরলেও ক্ষতি হতনা। তার প্রমাণ আধুনিক কবিদের লেখায় মিলছে। যেমন,

১। কৌতূহলী পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে 'দুরন্ত আশা' কবিতায় ছ'মাত্রার এবং 'বর্ষার দিনে' কবিতায় সাতমাত্রার যতি দেখতে পাবেন। চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার যতিকে ছান্দ-সিকেরা লঘুযতি এবং এই লঘুযতি বিভক্ত বাক্যাংশকে পর্ব নাম দিয়েছেন। মাত্রাবৃত্তে এই লঘুযতির বা পর্বের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষে স্ফূর্তি নেই। বাকি সব দেশে
প্রজারাই মরে, বেনে ব্যাঙ্ক ভরে ঠেসে।
কেবল অভাগ্য আমরা। লড়াই পালিয়ে
দিল্লী আর সিমলা করি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।

[সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, গ্রীনরুমে]

এখানে কবি 'ভারতবর্ষে'-তে চারমাত্রা এবং 'আমরা' ও 'সিমলা'-তে দু'মাত্রা হিসেবে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন। কিছুমাত্র ছন্দপতন ঘটেনি তাতে। প্রসঙ্গত একটা কথা পাঠককে মনে রাখতে বলি, মাত্রাবৃত্তের মতো অক্ষরবৃত্ত ও সময়-একক-ভিত্তিক বা কলা-মাত্রার হিসেবের ছন্দ।

এবারে স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

কেউ যে কারে চিনি নাকো সেটা মস্ত বাঁচন।
তাই না হলে নাচিয়ে দিত বিষম তুর্কি নাচন।

[রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, অচেনা]

রুদ্ধদলে হসন্ত চিহ্ন দিয়ে উচ্চারণের আদর্শে সাজালে শ্লোকটির রূপ দাঁড়াচ্ছে.

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
কেউ্ যে কা রে / চিনি না কো / সেটা মস্ ত / বাঁচন্।
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
তাই্ না হ লে / নাচি য়ে্ দিত / বিষম্ তুর্ কি / নাচন।

[চিহ্ন-সংকেত : উপরের ১-সংখ্যা দলমাত্রা-সূচক।

এখানে রুদ্ধ-মুক্ত মিলিয়ে প্রত্যেক ছোট ছোট যতিভাগে বা পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্ বা দল রয়েছে। অর্থাৎ এ-ছন্দের মাপের একক হল, দলমাত্রা। কিন্তু এর মধ্যে আরও একটু কথা রয়েছে। প্রতি পূর্ণপর্বে যেমন রুদ্ধ-মুক্ত মিলিয়ে চারটি করে দলের সমাবেশ

ঘটে, তেমনি এই চতুর্দল পর্বে ছয় কলামাত্রার একটা ওজন-সমতাও রাখা হয়। আর সে কারণেই, সাধারণত চতুর্দল পর্বে দুটির বেশি রুদ্ধদল জায়গা পায় না। প্রতি পূর্ণ পর্বে চারটি মুক্তদল থাকতে পারে, —সেখানে দুই কলামাত্রার প্রসারণ ঘটে; তিনটি মুক্ত একটি রুদ্ধদল থাকলেও চলে, —সেখানে এক কলামাত্রার প্রসারণ হয়; আবার দুটি মুক্ত—দুটি রুদ্ধ দলেও ক্ষতি নেই, সেখানে মুক্তদলে এক কলা রুদ্ধদলে দু'কলা,—পুরোপুরি ছয়কলার ওজন পাওয়া গেল। কিন্তু তিনটি রুদ্ধ—একটি মুক্ত দলে বা চারটিই রুদ্ধ দলে পর্ব গড়লে সে কবিতা পড়তে পাঠক একটু অস্বস্তিতে পড়েন বই কি![২] বরং সেখানে তিনটি রুদ্ধদলে পর্ব গড়লেই ছন্দটা ঠিকমতো সামলানো যায়।[৩] ছড়া জাতীয় রচনায় অবশ্য সেকালের অথবা একালের কবিরা দলবিন্যাসের এত নির্দিষ্টতা মেনে চলেননি। তার কারণ, স্বরাশ্রয়ী আবৃত্তির সাহায্যে দলমাত্রার অসমতা সহজেই ঢেকে নেওয়া চলে। যেমন,

পুতুল আমার / পুতুল / পুতুলের নাম / তুতুল
পুতুলকে যে / মন্দ বলে / তার নাম । ভূতুল ।
পুতুল আমার / রাজা / খেতে দেব / খাজা
পুতুল আমার / রাণী / কেমন মুখ- / খানি !
পুতুল যাবে / শ্বশুর বাড়ী / পায়ে দিয়ে / জুতুল ।

[অন্নদাশঙ্কর, ডালিমগাছে মৌ. পুতুল]

চিহ্নিত পর্বগুলির দলবিন্যাস লক্ষণীয়।

২। যেমন, (ক) তোমরা যাঁদের ॥ বাক্য হয় না ॥ আমার পক্ষে ॥
মুখোরোচক,
তোমরা যদি ॥ পুনর্জন্মে ॥ হও পুনর্বার ॥
সমালোচক,—
[রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, কর্মফল]

এখানে 'হও্ পুমর্‌বার্' পর্বটিতে একটি যুক্ত—তিনটি রুদ্ধদল এসে পড়াতে একটু দ্রুত উচ্চারণে বাড়তি এক কলামাত্রার তাল সামলাতে হয়।

(খ) মহারাজ, এই ॥ সংবাদপত্র ॥ লেখা অতি ॥
সোজা ;
দরকার শুধু ॥ ইংরাজ সংবাদ ॥ পত্রগুলো ॥
খোঁজা,
[দ্বিজেন্দ্রলাল, আষাঢ়ে, রাজা নবকৃষ্ণরায়ের সমস্যা]

এখানে 'সংবাদ্ পত্র' পর্বে একমুক্ত-তিনরুদ্ধ দল, এবং 'ইংরাজ্ সংবাদ্' পর্বে চারটি রুদ্ধ দলের সমাবেশ হয়েছে। গানের সুরে ছাড়া এতটা বাড়তি ওজন সামলানো মুস্কিল।

৩। যেমন, বসেছে আজ ॥ রথের তলায় ॥ স্নানযাত্রার ॥
মেলা—
সকাল থেকে ॥ বাদল হল, ॥ ফুরিয়ে এল ॥
বেলা।
[রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, সুখদুঃখ]

কবি এখানে সবগুলি চতুর্দল পর্বের মাঝে 'স্নান্ যাত্ রার্' পর্বটি তিন রুদ্ধদলে সাজিয়ে ছন্দসমতা রক্ষা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দীর্ঘ পদযতি প্রধান (আট, দশ ও ছয় দলমাত্রার), সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের নতুন এক স্বরবৃত্ত ছন্দ উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর 'আলেখ্য' (১৯০৭) কাব্যে এ-ছন্দের নিদর্শন মিলবে। এখানে তিনি রুদ্ধ-মুক্ত নির্বিশেষে প্রতিদলেই এক কলার সংহত উচ্চারণ এনেছিলেন। সংক্ষিপ্ত এ আলোচনায় সে-ছন্দের আর পরিচয় দিলাম না।

বাংলা মুখ্য ত্রি ছন্দরীতির প্রাথমিক পরিচয় এখানেই শেষ করে এবারে ছন্দমুক্তির প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে যে ছন্দ-উদাহরণগুলি তুলেছি তার অধিকাংশই 'মিত্রাক্ষর' রীতিতে,—অর্থাৎ পর্ব-পদ-পংক্তির মাত্রা সমতা ও মিল রেখে, রচিত হয়েছে। মিত্রাক্ষরের এই ধারাটি প্রাচীনতম কাল থেকে মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কাব্যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের পর মধুসূদন বাংলায় কাহিনীধর্মী এপিক বা মহাকাব্য লিখতে গিয়ে মিলটনের ব্ল্যাঙ্কভার্স-এ লেখা এপিক কাব্যের অনুসরণে নতুন অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা করলেন। এই ছন্দ পরীক্ষায় তিনি বাংলা কাব্যে তখন পর্যন্ত সবচেয়ে পরিচিত অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দকেই বেছে নিলেন। সেই বড়ু চণ্ডীদাস থেকে গুপ্তকবি পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কবিই যে অক্ষরবৃত্ত পয়ারকে তাঁদের কাব্যের মুখ্য ছন্দবাহন করেছিলেন। তাঁরা প্রতি আট ও ছয় মাত্রায় অর্থ ও পূর্ণ যতি দিয়ে, প্রতি চোদ্দ মাত্রার দুই পংক্তিতে মিল রেখে কাব্য লিখতেন। যেমন,

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র / ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র / রায় গুণাকর॥
[অন্নদামঙ্গল-১, প্রস্তুতিস্তবে দক্ষজীবন]

মধুসূদন এই ৮-৬ মাত্রার ছন্দযতির চালে ভবযতিকে মিলিয়ে দেওয়াটাকে কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতির পক্ষে বাধাস্বরূপ মনে করলেন। অমিত্রাক্ষরে লেখা তাঁর 'মিত্রাক্ষর' সনেটটিতে এ কথা বলতে গিয়ে লিখলেন,

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে

পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠি রাগে !
ছিল না কি ভাবধন, কহ লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৯৭ নং]

মধুসূদনের বক্তব্য হল, পয়ারের আট-ছয় মাত্রার ছন্দযতি রক্ষা করেও, ভাবযতির গাঁটছড়াটা খুলে তাকে স্বচ্ছন্দে চলতে দিতে হবে। প্রয়োজনমত ভাব ছন্দের লাইন ডিঙিয়ে চলবে। রবীন্দ্র-উপমায় বলতে গেলে, পুরোনো বাড়ির অন্দর-সদরের বাইরের কাঠামোটা থাকলেও একালের কবিতাসুন্দরীরা ওই মাঝখানের দেউড়িটা অনায়াসে পারপার করে চলতে থাকুন। বলা যেতে পারে, 'মিত্রাক্ষর'-এর ছন্দবন্ধন থেকে কবিতার ভাব-মুক্তির এটাই প্রথম পদক্ষেপ। অনেকে ভুল করে ভাবেন মধুসূদন যে তিলোত্তমা বা মেঘনাদ লিখতে গিয়ে লাইনশেষের মিল তুলে দিলেন সেটাই অমিত্রাক্ষরের আসল বৈশিষ্ট্য। সেটা ঠিক নয়। লাইনশেষের মিল তুলে দিয়েছিলেন, এতকালের কৃত্তিবাস-কাশীদাস-ভারতচন্দ্রের সমিল মিত্রাক্ষর-পয়ার পঠনে অভ্যস্ত পাঠককে নতুন ভঙ্গির ছন্দ পড়তে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে। নইলে মিল দিয়েও যে অমিত্রাক্ষর লেখা চলে সে তো তাঁর চতুর্দশপদী বা সনেটগুলি পড়লে গেলেই বোঝা যায়।[৪] রবীন্দ্রনাথও সুপরিচিত অনেক অমিত্রাক্ষর কবিতায় (যেমন মেঘদূত, বসুন্ধরা, মানসসুন্দরী) মিল দিয়েছেন।

৪। উপরোদ্ধৃত 'মিত্রাক্ষর' সনেটটির প্রথম আট লাইনেও মিল লক্ষ করা যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই এবারে প্রশ্ন উঠল অমিত্রাক্ষর কবিতায় ভাবের প্রবাহ যখন ছন্দের লাইন ডিঙিয়ে চলবার ছাড়পত্র পেল তখন কৃত্রিম ছন্দপংক্তির সমতা রক্ষার আর প্রয়োজন কোথায় ? 'পদ্মাবতী'র অমিত্রাক্ষর নাট্য-সংলাপ লিখতে গিয়ে কথাটা বোধহয় মধুসূদনের মনে প্রথম জেগেছিল। তারপর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র সেটা পুরোপুরি উপলব্ধি করলেন। প্রায় একই সময়ে তিনি এবং রাজকৃষ্ণ রায় অমিত্রাক্ষর পয়ার ভেঙে মুক্তকের ছোটবড়ো পংক্তিতে নাট্য-সংলাপ সাজিয়ে দিলেন। আর কবিতায় সে কাজের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রথম যুগে [৫] অল্পস্বল্প পরীক্ষা করে থেমে গেলেও, 'বলাকা'র কবিতাগুলি লিখতে গিয়ে (রচনা-কাল ১৯১৪-১৬) পুনর্বার এ-ছন্দের উপযোগিতা নতুন করে উপলব্ধি করলেন। পূর্বে তিনি শুধু অক্ষরবৃত্তে মুক্তকের পরীক্ষা করেছিলেন ; এবারে অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত উভয়রীতিতেই মুক্তক রচনা করলেন। বলাকার ৪৬টি কবিতার মধ্যে ৩১টি মুক্তক ছন্দে লেখা। তার মধ্যে ৯টি স্বরবৃত্তে, বাকি ২২টি অক্ষরবৃত্তে রচিত।[৬] এখানে উভয়রীতির এক একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

অক্ষরবৃত্ত মুক্তক :	কলামাত্রা-বিভাগ :
যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি ॥	১০ ॥
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি ॥	১০ ॥
যত কিছু বস্তুভার। I	৮ I
ততক্ষণ নয়নে আমার' ॥	১০ ॥
নিদ্রা নাই ; I	৪ I
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে ॥ কেটে কেটে খাই ॥	৮ ॥ ৬ ॥

কীটের মতন ; I ৬ I

ততক্ষণ ॥ ৪ ॥

দুঃখের বোঝাই শুধু ॥ বেড়ে যায় নূতন নূতন ; I ৮ ॥ ১০ I

[বলাকা, ১৮ নং কবিতা]

[চিহ্ন-সংকেত : ॥ অর্ধ (পদ) যতি, I পূর্ণ (পংক্তি) যতি ।]

স্বরবৃত্ত মুক্তক : দলমাত্রা বিভাগ :

যখন আমায় । হাতে ধরে ॥ ৪। ৪॥
আদর করে । ৪।
ডাকলে তুমি । আপন পাশে I ৪। ৪I
রাত্রি দিবস । ছিলেম ত্রাসে ॥ ৪। ৪॥

পাছে তোমার । আদর হাতে ॥ অসাবধানে ।
কিছু হারাই I ৪। ৪॥ ৪। ৪I

চলতে গিয়ে । নিজের পথে ॥ ৪। ৪॥
যদি আপন । ইচ্ছামতে ॥ ৪। ৪॥
কোনো দিকে । এক পা বাড়াই I ৪। ৪I

পাছে বিরাগ-। কুশাঙ্কুরের ॥ একটি কাঁটা ।
একটু মাড়াই I ৪। ৪॥ ৪। ৪I

[বলাকা, ২২নং কবিতা]

[চিহ্ন-সংকেত : । লঘু (পর্ব) যতি । অন্যচিহ্ন দুটি আগের মতো ।]

বাহুল্যবোধে মাত্রার অঙ্কগুলি আর শব্দের মাথায় বসাচ্ছি না। পাঠক পূর্ব-প্রদত্ত সূত্রমতো মাত্রার হিসেব ধরতে পারবেন আশা রাখি ।

---

৫ । রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যাসংগীতে'র (১৮৮২) কয়েকটি কবিতায়

লক্ষ করা যাবে, অক্ষরবৃত্ত মুক্তকে ১০,.৮,৬-মাত্রার পদযতির পাশাপাশি আরও ছোট ৪ বা ১-মাত্রার শব্দেও যতি এসেছে। মিলের বা ভাবের তাগিদে কবি জোড়মাত্রায় পদকে খণ্ডিত করেছেন। অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণবিরোধী বলেই কখনো বিজোড়-মাত্রায় ভাঙেননি। স্বরবৃত্ত মুক্তকে অবশ্য চতুর্দল পূর্ণপর্বই সবচেয়ে ছোট মাপ। লাইন শেষে পূর্ণ চতুর্দল পর্বের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে ৩মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রেখেছেন।

এ-যুগে 'বলাকা' এবং 'পলাতকা'র অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত মুক্তকে কবি লাইন শেষে মিল দিয়েছেন। তবে অমিল মুক্তক তিনি একেবারে লেখেননি এমন নয়। যেমন, অক্ষরবৃত্তে—

মুক্তকের আভাস ফুটিয়েছেন। তারপর 'মানসী'র (১৮৯০) 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় সার্থক অমিল মুক্তকের ব্যবহার করেছিলেন।

৬। বলাকার মুক্তক কবিতাগুলির হিসেব নিম্নরূপ :

অক্ষরবৃত্ত মুক্তক (সমিল) : কবিতাসংখ্যা : ৬-১৯, ২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫। মোট ২৪টি।

স্বরবৃত্ত মুক্তক (সমিল) : কবিতাসংখ্যা : ২১, ২৪, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৪। মোট ৯টি।

'বলাকা'র বাকি কবিতাগুলি সবই 'মিত্রাক্ষর' ছন্দে লেখা। 'উৎসর্গ' কবিতাটি ৬-মাত্রাপর্বের মাত্রাবৃত্তে রচিত। ১-৫, ২০, ২১, ৩০, ৩৫, ৩৮, ৪৩ সংখ্যক কবিতাগুলি স্বরবৃত্তে রচিত। ৩৯-সংখ্যক কবিতাটি অক্ষরবৃত্তে, প্রবহমান সমিল মহাপয়ারে (৮ ॥ ১০) রচিত।

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে যমুনেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া ;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

[পুনশ্চ, বাঁশি]

মিল তুলে দিয়ে স্বরবৃত্ত মুক্তকও লিখেছেন। যেমন,

হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলি ফুলের নিঃশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পূজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

পুনশ্চ, পয়লা আশ্বিন]

কৌতূহলী পাঠক এবারে প্রশ্ন করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত রীতিতে মুক্তক লিখেছেন ; মাত্রাবৃত্তে কি লেখেন নি ? মাত্রাবৃত্তে সমমাপের পর্বযতি রেখে মুক্তক লেখা একটু কঠিন বটে। তবে কবি তাতেও পিছ্‌পা হননি। এখানে তাঁর সমিল ও মিল-বিহীন দুটি মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাই।

মাত্রাবৃত্ত : সমিল মুক্তক (ছয়মাত্রার পর্ব) :

ক্ষণভঙ্গুর দিনে
নিমেষ-কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে-ছবি
সামান্য পটে আঁকি
মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।
দীর্ঘকালের ক্লান্ত আঁখির উপেক্ষা হতে তারে
সরায় অন্ধকারে। [সানাই, ক্ষণিক]

মাত্রাবৃত্ত : অমিল মুক্তক (ছয়মাত্রার পর্ব) :

আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী মসির তুলিকায়
অতীতদিনের বিদ্রুপবাণী
রেখায় রেখায় মুছে মুছে দিক্
স্মৃতির পত্র হতে,
থেমে থাক ওর বেদনার গুঞ্জন
সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো। [সানাই, ব্যথিতা]

ইতিপূর্বে এ পত্রিকায় বলাকার ছন্দবৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে, পরিশেষে, ছন্দ-জিজ্ঞাসু পাঠককে কয়েকটি কথা মনে রাখতে বলি। (১) অক্ষরবৃত্তে চারমাত্রার লঘু (পর্ব)-যতির চাল তেমন স্পষ্ট হতে পারে না, তাকে ছাপিয়ে আট/দশ/ছয় মাত্রার দীর্ঘতর পদযতির চালটাই প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথও, ছোটদের জন্যে দু-একটি কবিতায় ছাড়া এই রীতিই অনুসরণ করেছেন। সুতরাং 'বলাকা'র অক্ষরবৃত্ত মুক্তকে চারমাত্রার লঘু (পর্ব)-যতির সন্ধান অনাবশ্যক। (২) রবীন্দ্র-নাথ 'মানসী' কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যুক্তবর্ণাশ্রিত রুদ্ধদলকে

নির্দ্বিধায় দুই কলামাত্রা হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেন। বস্তুত তখন থেকেই বাংলা কবিতায় যুক্তবর্ণবহুল মাত্রাবৃত্তের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। (৩) বাংলা কাব্যের আট, দশ বা ছয় কলা-মাত্রার পদে (বিশেষ করে অক্ষরবৃত্তে) ত্রৈমাত্রিক বা বিজোড় শব্দের পর বিজোড় শব্দ এবং দ্বিমাত্রিক (বা চতুর্মাত্রিক) অর্থাৎ জোড় শব্দের পর জোড় শব্দের বিন্যাসটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ'কথাটা বোঝাতে গিয়ে পয়ারের সংজ্ঞায় বলেছিলেন,

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে-ছয়ে হাঁফ্ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড়॥ [ছন্দসরস্বতী]

সুতরাং একই কবিতায়, এমনকি একই পংক্তিতেও, বিজোড় শব্দের পর বিজোড় শব্দ এবং জোড় শব্দের পর জোড় শব্দ বসিয়ে পদ-বিন্যাস অনায়াসে চলতে পারে। উপরের এই শ্লোকটিতে সত্যেন্দ্রনাথ তাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বরাবর তাই করে এসেছেন। (৪) লৌকিক স্বরবৃত্তের (বা ছড়ার ছন্দের) চালটাই চতুর্দল-ছয়কলা পর্বের ;—একটু কাটা-কাটা, পর্বসূচনায় ঝোঁকালো। সেটা আদৌ ইংরেজি সিলেবিক ছন্দের প্রভাবজনিত নয়, ইংরেজি আয়াম্বিক বা ট্রোকের সমধর্মীও নয়। —এটা খাঁটি লৌকিক বাংলা ছন্দ-তালের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাব-প্রকাশক কবিতায় এ-ছন্দ ব্যবহার করতে গিয়ে পর্ব-সূচনার ঝোঁক কমিয়ে দিয়েছেন। 'পলাতকা'র স্বরবৃত্ত-মুক্তক ছন্দে লেখা কবিতা-গুলি পড়তে গেলেই সেটা ধরা পড়ে। (৫) একই কবিতার কিছু অংশ অক্ষরবৃত্তে, কিছুটা স্বরবৃত্তে বা মাত্রাবৃত্তে লেখা চলে না এমন নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (দ্র. পূরবী, আশা) এবং কয়েকজন আধুনিক কবি বৈচিত্র্যের তাগিদে সেটা করেছেন। তবে বলাকায় এমনতর পরীক্ষার নিদর্শন নেই। যে কবিতা অক্ষরবৃত্তে শুরু করেছেন সেটা নির্ভেজাল অক্ষরবৃত্তেই শেষ করেছেন। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত সম্পর্কেও একই কথা।

স্মৃতিচারণ

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব)

॥ আট ॥

৺পি. সি. সরকার

জুলাই ৩, ১৯৮৩ তারিখে একান্তর পেরিয়ে বাহাত্তরে পা দিলাম, কলকাতায়। জুলাই ১০ তারিখে আমাকে নিউ ইয়র্ক শহরে বসে চিঠি লিখল প্রদীপ, যাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র : "বহু শহরে শো (ইন্দ্রজাল) হয়ে গেছে। সবাই খুব প্রশংসা করছেন। বাবা আজ বেঁচে থাকলে খুবই আনন্দ পেতেন।"

এ চিঠি পেয়েই ওর বাবার চিঠি বার করলাম আমার ৺পি. সি. সরকার সংগ্রহ থেকে। তিনি ২৮।১।১৯৬১ তারিখে হামবুর্গ (জার্মানি) থেকে লিখছেন : "এখান থেকে আগামী সপ্তাহে **LONDON** যাবো—তারপর **PARIS** হয়ে **Calcutta. Next show**-র জন্য বিরাট যন্ত্রপাতি জোগাড় করছি—এবার **terrific show** করবো ইচ্ছা আছে।"

অকটোবর ১০, ১৯৬৭ তারিখে জাপানের টোকিও থেকে লিখছেন : "জাপান থেকে অভিবাদন জানাচ্ছি। আঠারো জনের দল আর ত্রিশ টন যন্ত্রপাতি নিয়ে চার মাসের সফরে এসেছি। এই নিয়ে জাপানে দশ বার এলাম। আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার 'দেশে দেশে' বইটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশী হয়েছি। হ্যাঁ, আপনি আমার জীবন কাহিনী লিখতে পারেন,

যদি সত্যিই লিখতে চান। এটা সত্যিই আমার মনের কথা। ইতি আপনার বন্ধু পি. সি. সরকার, যাদুকর।”

কথা হয়েছিল বন্ধুবর প্রতুল চন্দ্র (অর্থাৎ যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার) বলবেন আর আমি লিখব, এইভাবে সরকার কথিত এবং অকুব জীবনকাহিনী তৈরী হবে, সরকারের জবানিতে। বিধাতা তা শেষ পর্যন্ত হতে দিলেন না, জাপান থেকে তাঁকে পর-লোকে পাঠিয়ে দিলেন জানুয়ারি ৬, ১৯৭১ তারিখে।

কিন্তু বিধাতার কাছে পুরো জব্দ হতে আমি রাজি নই। বন্ধু প্রতুলচন্দ্রের যে পরিচয় আমি পেয়েছি পঁচিশ বছরে (জানু-য়ারি ১৯৪৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭০), তার কিছু বিবরণ আমি লিখে রেখে যাব, বিধাতা আমাকে ওপারে পাঠাবার আগে যত-টুকু পারা যায়।

সম্প্রতি আমার পরম স্নেহভাজন তরুণ কবি (এবং সম্পাদক) সুভাষ ঘোষাল ৺প্রতুল চন্দ্রের (পি. সি সরকার) একটি চিঠি আমাকে দেখে নকল করে রাখবার সুযোগ দিয়েছে। সুভাষের স্বর্গত শ্বশুর বিজয় ভূষণ বসু মহাশয় ছিলেন সরকারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। ৬১, কর্ণোয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মার্চ ১৮, ১৯৩৭ তারিখে সরকার তাঁকে লিখছেন :

“ময়মনসিংহ গিয়াছিলাম passport করতে। সেখান থেকে যাই বাড়ি। বাগেরহাট গিয়াছিলাম Commissioner-এর visit-এর সময়, সেখানে তিন দিন show হয়েছিল। কলেজে লেক্‌চারও দিয়েছিলাম। তারপর তুমকাতে exhibition-এ ম্যাজিক দেখাতে যাই—সেখানে এক সপ্তাহ ছিলাম। Jessore-এও একটা exhibition-এ গিয়াছিলাম, এক দিনের জন্য। তৎপূর্বে ফরিদপুর যাই Mr Blandy, C. I. E., I. C. S এবং

Mr. Gordon-এর visit উপলক্ষে। তারপর জলপাইগুড়িতে 1st March show দিই। তারপর 3-10 March হবিগঞ্জ (Sylhet) আসামে exhibition show দিয়া সবেমাত্র ফিরিয়াছি। সেখানে কলেজে লেকচার দিই ও competition magic-এ first হইয়া Prof. Bhattasali কে defeat করিয়া gold medal পাই। আজ একটা local engagement-এ এখনই বাহির হইয়া যাইতেছি। এদিকে show-র অত্যন্ত ভীড়। কাজেই বরিশালে অনিশ্চিতভাবে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ A bird in hand is worth two in the bush.

আপনার বন্ধুরা আমার ম্যাজিক দেখতে চান, খুবই আনন্দের কথা। তাঁদের প্রশংসায় আমি গর্বিত, কিন্তু বস্তুজগতে ফুলের চেয়ে ফুলকপির দাম অনেক বেশি, তাই বাধ্য হইয়া বরিশাল না যাইয়া locally যে সব call আসছে সে সব attend করছি। টাকাই এখন প্রধান লক্ষ্য। বিদেশ যাওয়া আমার প্রায় স্থির। কতদিনের জন্য যাইতেছি, কবে ফিরিব, ঠিক নাই। হয়তো নাও ফিরিতে পারি, বা গরুর গাড়ি করে মৃতদেহ পলাশপুরেও পৌঁছতে পারে। (হাসবেন না।) 'দেবদাস' ছবিটা খুব মনে লেগেছে কিনা, তাই বললাম। 'এখন ফেলো না আঁখিজল' গানটা মনে হয়, আর তার শেষ দুই লাইনই মনে হয়, আগের দুই লাইন নয়।

'আমারে স্মরি প্রিয় অধীর চঞ্চল। হয়ো না যেন তুমি, ফেলো না আঁখিজল' এইটুকু বাদ দিয়ে শুধু 'আমি যা নিয়ে যাই তুলনা তারি নাই, তোমার শত স্মৃতি কত না ব্যথা গান।' এইটুকু মনে হইতেছে।

সুখী আপনারা। সংসারে আপনাদের সব আছে—আর আমি সংসার বাড়ি ঘর দুয়ার বাবা মা আপনার জন সকলের

স্নেহ ছাড়া। তাই স্থির করেছি বিদেশ গিয়ে আর ফিরিব না। মন স্থির করে তবে ফিরিব।

আমার বই দুইটি half লেখা হয়ে পড়ে আছে। Publisher-রা খুবই তাগাদা দিচ্ছে, আমি হাত জোড় করে বিদায় দিচ্ছি: মাপ করবেন বই finish করবার মানসিক অবস্থা আমার নাই।

কাল Metro-র Camille ছবি দেখিলাম। GRETA GARBO-র এই ছবিটি খুব ভাল হয়েছে। It is a story of two real lovers ending in tragedy. খুব ভাবছি। এক প্রকার আছি। আপনারা নিশ্চয় ভাল আছেন।

Yours
P. C. Sorcar"

প্রিয় বন্ধুর এই চিঠিখানা আমার কাছে অসাধারণ মূল্যবান। দুঃখের বিষয় বন্ধুবরের জীবিতাবস্থায় এটি আমার হাতে আসে নি, এলে জেনে নিতে পারতাম কেন তিনি অমন বিষণ্ণ ভাষায় বলছেন তিনি সকলের স্নেহ ছাড়া।

এখন শুধু অনুমানে ধরে নিতে পারি যে সেকালের অসাধারণ যাদুকর এমিন সোহ্‌রাবর্দি—বালাকালে যাঁর অত্যাশ্চর্য যাদুপ্রদর্শন দেখে যাদুকর 'রয় দি মিষ্টিক' অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ রায় (১৮৯১-১৯৭৭) যাদুবিদ্যার সাধনায় মেতেছিলেন—যেমন যাদুকে পেশা করার অপরাধে তাঁর অভিজাত আত্মীয়স্বজন দ্বারা বর্জিত হয়ে প্রায় একঘরে অবস্থা সহ্য করেছিলেন, তবু যাদুকর বৃত্তি পরিত্যাগ করেন নি, প্রতুলচন্দ্র সরকারও তেমনি সকল আপনজনের অমত এবং অপছন্দকে অগ্রাহ্য করে যাদুকর বৃত্তিকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন এমন যুগে, যখন যাদুকর বৃত্তিকে শিক্ষিত সমাজ মর্যাদা

দিত না, অবজ্ঞার চোখে দেখত। এবং সেই কারণেই সরকার হয়ে পড়েছিলেন আপন জনের স্নেহ ছাড়া। কলেজী শিক্ষা পেয়ে ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং, আইন, শিক্ষকতা, কেরানীগিরি প্রভৃতি কোনো সম্মানজনক এবং নিশ্চিত আয়ের বাঁধাধরা লাইনে না গিয়ে ছেলেটা কিনা ধরল এমন লাইন, যার না আছে সামাজিক মর্যাদা, না আছে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ! তাঁকে ভবিষ্যৎ যাদুসম্রাট রূপে দেখবার মতো দূরদৃষ্টি কারও ছিল না, তাই কল্যাণকামী আপনজনের পক্ষে তাঁকে বিপথগামী ভেবে তাঁর প্রতি বিরূপ হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

এখানে বলে রাখা ভালো যে প্রতুল চন্দ্রই সরকার পরিবারে প্রথম যাদুকর, তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র বা অপর কোনো পূর্বপুরুষ যাদুকর ছিলেন না। একথা স্বয়ং প্রতুল চন্দ্র সরকারই আমাকে বলেছিলেন, যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম কিংবদন্তী-খ্যাত যাদুকর আত্মারাম সরকার তাঁর পূর্বপুরুষ কিনা।

কিংবদন্তী আছে, নানারকম অবিশ্বাস্য অলৌকিক ব্যাপার তাঁর বশীভূত কয়েকটি ভূতের সাহায্যে ঘটাতেন এই যাদুকর আত্মারাম সরকার। বশম্বদ ভূতেরা তাঁর পাল্‌কি বইত। এই ভূতদের হাতেই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়। এদিক দিয়ে জারমানির কিংবদন্তী-খ্যাত পণ্ডিত যাদুকর ফাউস্ট-এর সঙ্গে আমাদের আত্মারাম সরকারের মিল আছে। শয়তানের অনুচরদের হাতেই তাঁর বীভৎস মৃত্যু ঘটে, ভীমের হাতে কীচকের যেভাবে মৃত্যু হয়েছিল।

বন্ধুবর ডঃপি. সি সরকারের ধারণায় অলৌকিক শক্তিধর কোনো আত্মারাম সরকারের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না, ওটা কিংবদন্তী মাত্র।

বন্ধুবর সরকারের চিঠিতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য উক্তি

আমাকে চমক দিয়েছে : বস্তুজগতে ফুলের চাইতে ফুলকপির দাম অনেক বেশি। এই কথা তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন ১৯৩৭ সালে, তখনও আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি।

এর অনেক পরে (সরকারের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে) আমি একটি কবিতায় লিখেছিলাম :

"প্রভু বেলফুলে মোরে কাজ নাই
(তুমি) বেলফল মোরে দিও।
ফুলে হবে না তো, বেল দিয়ে হবে
মোরব্বা রমণীয়।
না-ই হোক খাঁটি, থাকুক ভেজাল,
মালার চাইতে তবু ভাল মাল,
শিশুকাল হতে ফুল হতে মোর
ফুলকপি বেশি প্রিয়।"

কবিতাটি 'প্রার্থনা' শিরোনাম সহ প্রথমে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'তে ও পরে 'পাগলা-গারদের কবিতা' গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল।

আমি ভেবেছিলাম 'ফুলের চেয়ে ফুলকপি বেশী ভালো', এ কল্পনাটা আমি ছাড়া অন্য কারো মাথায় আসে নি, কিন্তু কবি সুভাষ ঘোষালের কাছ থেকে সরকারের চিঠিখানা পেয়ে পড়ে বুঝলাম ঐ আইডিয়াটি আমার অনেক আগে যাদুকর পি সি সরকারের মাথায় এসেছিল, এবং আমার মাথায় এসেছিল—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই—অনেক পরে। একই আইডিয়া আলাদা ভাবে এসেছিল দুজনের মাথায়, কেউ কারো প্রভাবান্বিত হয়ে নয়।

এ থেকে বোঝা যায় সরকার-এর এবং আমার চিন্তাভঙ্গীর এবং দৃষ্টিকোণের সাদৃশ্য। বাল্যকালে স্কুল জীবনে প্রায় একই সময়ে সরকার এবং আমি সারা জীবনের মতো নেশায় মেতে

ছিলাম যাদুবিদ্যার, পেশা হিসাবে শিক্ষিত সমাজে যার মর্যাদা ছিল না। আমাদের দুজনেরি বৃত্তি নির্বাচন ছিল অত্যন্ত অগতানুগতিক।

আমি কলেজ জীবন শেষ করবার আগেই নিজের প্রদর্শন-প্রতিভা (**showmanship**) এবং মঞ্চব্যক্তিত্ব, অভিনয় ক্ষমতা প্রভৃতির অভাব টের পেয়ে যাদুকে পেশা বানাবার সংকল্প ত্যাগ করে আমার যাদুর নেশাকে তৃপ্ত রেখে আসছি (এবং রেখেও যাব) যাদু দর্শনে, অধ্যয়নে, গবেষণায়, উদ্ভাবনে, যাদুসাহিত্য রচনায়। (যাদুর নেশা একবার যাকে ভালোভাবে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না।) অর্থাৎ আমার আজীবন যাদু চর্চা মঞ্চের নেপথ্যে।

বন্ধুবর প্রতুলচন্দ্রের ছিল অসামান্য প্রদর্শন-প্রতিভা, মঞ্চ-ব্যক্তিত্ব, অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং আরো নানা গুণের সমন্বয়। তাই তিনি পেশাদারী যাদুমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। আমি হয়ে রইলাম যাদুর নেপথ্য-সাধক।

আমি যা হতে চেয়েছিলাম কিন্তু হতে পারি নি, সরকার তাই হতে পেরেছিলেন এবং অভাবনীয় বিরাট ভাবেই পেরেছিলেন। আমি তাই বন্ধুবর পি. সি. সরকারকে দেখেছিলাম আমার দ্বিতীয় সত্তা (**alter ego**) রূপে। ৺পি. সি সরকার যে আমার এত গভীর প্রীতি আর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ হচ্ছে আমি ভালবাসতাম আর শ্রদ্ধা করতাম তাঁর মধ্যে আমারই দ্বিতীয় সত্তাকে।

অতি সামান্য এবং সাধারণ শুরু থেকে অসাধারণ দ্রুত বেগে পি. সি. সরকার (৺প্রতুল চন্দ্র) পৌঁছেছিলেন অতি অসামান্য, অসাধারণ আর বিরাট পরিণতিতে, স্থানীয় পরিচিতি থেকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিতে। হুডিনির পরেই (অথবা হয়তো হুডিনির সঙ্গে সমানভাবেই) আমাদের পি সি সরকার বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত যাদুকর।

'সাফল্যের কাহিনী' রূপে পি. সি. (প্রতুলচন্দ্র) সরকারের জীবনকাহিনী অনন্য।

সরকারকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনার চরিত্রে কি কি বিশেষত্ব থাকায়, আর কিভাবে অগ্রসর হয়ে আপনি এমন অসাধারণ বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন বলে আপনার মনে হয় ?"

সরকার বলেছিলেন : "আমার বাবা ভগবান সরকারকে আমি ভগবানের মতোই ভক্তি করতাম। অর্থের অপ্রতুলতায় বাবার অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থাকতে দেখে মন খুব খারাপ হতো। স্কুলে থাকতেই বিখ্যাত গণপতি চক্রবর্তীর যাদুর খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে পণ করলাম সেরা যাদুকর হয়ে অনেক টাকা রোজগার করব। সেটাই হলো আমার জীবনের লক্ষ্য। ('টাকাই এখন প্রধান লক্ষ্য' ১৯৩৭ সালে চিঠিতে লিখেছিলে সরকার।) তা থেকে কখনো বিচ্যুত হইনি। প্রথম দিকে অনেক বাধা বিপত্তি। বিরুদ্ধ সমালোচনা, অপমান, লাঞ্ছনা, হতাশা এসেছে। এসেছে যাদুচর্চার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে কোনো বাঁধাধরা লাইনে ঢুকে পড়ার প্রলোভন—কিন্তু আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ : লক্ষ্য যা স্থির করেছি, তা থেকে ভ্রষ্ট হবো না, I must sink or swim with magic. যাদুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার এই একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার দিয়েছেন।···

"Aim high যথেষ্ট ভালো উপদেশ নয়। ঠিক উপদেশ হচ্ছে Aim highest. আমি পণ করেছিলাম শুধু বড় ম্যাজিশিয়ান হবো না, 'সবচেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ান' হবো।··· (এবং সরকার world's greatest magician বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন)

"নিজেকে নিঃসন্দেহে ভেবেছি **store-house of infinite possibilities** বলে, বিশ্বাস করেছি আমার মধ্যে রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। এগিয়ে আমি যাবোই, কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। 'পারব না' ভাবটাকে কখনো মনের কাছাকাছিও ঘেষতে দিই নি। যে কোন কাজে হাত দিয়েছি, ভেবেছি নিশ্চয় পারব। পেরেছিও।···

"মার্কিন লেখক **Dale Carnegie** আমার গুরুস্থানীয়। তাঁর **'How to make friends and influence people'** বইটি আমার অসীম উপকার করেছে। এ বইর প্রতিটি উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমার সাফল্যকে যদি বিরাট বলেন, তাহলে তাতে এ বইটির অবদানও বিরাট।···

"পেশায় বা ব্যবসাতে প্রচারের মূল্য অসাধারণ। প্রতি-যোগিতার জগতে নিজের ঢাক নিজে এবং অন্যকে দিয়েও প্রচুর পেটানো দরকার। অন্তরে বিনয় থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু লড়াইয়ের মাঠে নেমে বৈষ্ণব বিনয় চলে না। সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে।···

(বিশ্বের একমাত্র যাদু সাপ্তাহিক **ABRACADABRA**-র সম্পাদক ৺**Goodliffes** লিখে গেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে পি. সি. সরকার অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহঙ্কার, অমায়িক মানুষ ছিলেন। আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতাও তাই বলে।)

"আমাকে এগিয়ে যাবার পথে যে বা যা সাহায্য করবে, সে বা তা যত তুচ্ছ বা যত সামান্যই হোক না কেন, তাকে আমি কখনো তুচ্ছ বা সামান্য ভেবে অবহেলা করি নি, শ্রদ্ধার সঙ্গে তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছি। **Every little makes more.** সুতরাং **little** কে তুচ্ছ করা বোকামি। তিল তিল করেই তো

তাল হয়। যত তালই আমার ভাণ্ডারে থাক, তার ওপর একটি তিল যদি আসে তো মন্দ কি ?”

১৯৬০ সালে একদিন আমার টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে সরকার আর আর আমি আলোচনা করছি, এমন সময় কয়েকটি ছাত্র এসে হাজির। তাঁরা চাঁদা তুলে একটি পূজোসংখ্যা কাগজ বার করছে, তাতে আমার একটি লেখা চাই। দিন সাতেক বাদে এসো বলে তাদের বিদায় দিয়ে সরকারকে বললাম, “কি লেখা ওদের দিই বলুন তো ? নতুন গল্পের প্লট মাথায় আসছে না।”

সরকার খুব seriously বললেন, “আমার একটা গল্প দিয়ে দিন না। তাতে আমার একটু পাবলিসিটি হবে।”

আমি বললাম, “আপনি তো এখন বিশ্ববিখ্যাত। ওদের সামান্য কাগজ। ছাপবেও খুব কম সংখ্যা।”

সরকার হেসে, কিন্তু তাচ্ছিল্যভরে নয়, বললেন “হুকপিও যদি ছাপে, তাতেও আমি interested.” সরকারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার একটি ছোট, লিখেছিলাম ঐ কাগজে।

কাগজে বারো পৃষ্ঠার লেখা পাঠাচ্ছেন, শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় আপনার নাম লেখা, বাকী ১১ পৃষ্ঠায় আপনার নাম নেই কেন ? একথা সরকার বলেছিলেন একদিন। আমি বলেছিলাম, “বাকি পৃষ্ঠাগুলোতে আমার নাম থাকবার দরকার কি ?” তার উত্তরে সরকার বলেছিলেন :

“আপনার বারোটা পৃষ্ঠাই তো একজন কম্পোজিটর কম্পোজ করবে না। হয় তো বারোটি পৃষ্ঠা distributed হয়ে যাবে বারোজন কম্পোজিটরের হাতে। তাহলে শুধু প্রথম পৃষ্ঠার কম্পোজিটর আপনার নাম জানবে। বাকি ১১ জন আপনার নাম জানবে না। কিন্তু যদি একটি ‘অকুব’ রাবার স্ট্যাম্প করে

নিতেন, আর বাকি ১১টি পৃষ্ঠার ওপর ডান দিকের কোণে তার ছাপ মেরে দিতেন, তাহলে প্রত্যেকটি কম্পোজিটর জানতেন তিনি অক্রুর-র লেখা কম্পোজ করছেন। তারপর তাদের কেউ কোনো দোকানে বই কিনতে গেলে বইয়ের র‍্যাকে আপনার বই দেখলে ভাববে, এরি লেখাই তো কম্পোজ করেছিলুম। এর বইখানাই কিনে নিয়ে যাই।...

(ক্রমশ)

সুভাষ ঘোষাল

এপার ওপার জুড়ে

যখন আমি
রাজা ও দ্বার-রক্ষীর কোন তফাৎ বুঝতে পারি না
যখন রাণী ও নাবালিকার নৃত্য সমপরিমাণ জ্যোৎস্নায় শুরু হয়
যখন কানায় কানায় ভ'রে ওঠে নদী এবং চোখ
আমার তখন কী করার থাকতে পারে
হে পিতৃপুরুষের বীণা ?
যদি আগে অঙ্গীকারবদ্ধ হই
যদি আগে অন্ধের পদতট ছুঁয়ে ফেলি
এপার ওপার জুড়ে যদি আগে বেজে উঠি
ক্ষমা ক'রো।

কতোদূর গেলে ?

হরিণীর কাছে বারবার যাওয়া
হরিণ কি জানে ?

পাতাদের আলো পাখীদের আলো
লেগেছে স্নানে।

বাতাসের বীথি, সে তো রেখে গেছে ঋষি।
বনের আকারে মনের মুক্তি পাওয়া
কতোদূরে গেলে শাশ্বত শাশ্বতী ?

আলোকের পাতা আলোকের পাখী যামিনীঠামে
হরিণের কাছে বারবার যাওয়া
হরিণী কি জানে ?

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু

শর্ত পড়ো নি। ভগ্ন সাপরাস্তার এক কোণায়
বন্ধু চেয়েছিলে। ভাঙা টিবি বহুর প্রহর
নিরাহারে পাক খেয়ে উড়ছে মানুষগ্রহের শূন্যপথে।
কালো শোকবাস পরে ফলক ফাটক, ঘূর্ণা কাঁচে
শতকোটি বধ্য মুখ ভেসে নিবে যাওয়া।
বন ভাগ হয়ে ছুটছে অন্ধ পশু বেগে—
স্ত্রী শিশু-নটের কাচ ফেলে দিয়ে কবন্ধ উল্লোভ—
বন্ধু চেয়েছিলে। দিক্‌রেখার
দূর রঙে আবছায়া হয়ে ছিলে সাপরাস্তার এককোণায়।
স্বরশব্দ বিস্মরণ হয়ে যায় স্রস্ত দিনমদে,
দা লেজা আগুন লোহা ঘিরে পড়ে···হাতড়ে খুঁজছ
অন্ধকার হাওয়া, দরচোখে···

কানাকানি টেলিগ্রাফ

কানাকানি টেলিগ্রাফ দেহাতি দগড়ে ওঠে তুক্…
ফল্গু ফুঁসে ওঠে নিচে, মুখঢাকা পর্ণবাস সুখ
গাছশীর্ষ থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়ে নীলিমাস্তম্ভিত।
দ্রুত ঘোড়াকুর খুরে বুক বাজছে ড্রিম ড্রিম-ছেঁড়া
দিনের ও মুখে ঝুপড়ি চাল উড়িয়ে খেলতে বাতাস—
তীর ফলা কেঁপে ভেসে উড়ে যায় আঠারো বাহুতে…
ঘাসছোপা দোলা বয়ে ঘন অস্তগন্ধে ঘুরে ওঠে।
কানাকানি টেলিগ্রাফ দেহাতি দগড়ে বাজে তুক্…
বুকটুকু নিড়িয়ে ডুবে বসে আছো—কে যায়? ঘাসসই নুয়ে যাও!
প্রলাপগাছের নিচে ফ্যাকাশে ছায়ার গলা-জলে
খেলাবাটি ঠেলে দিয়ে ডুবে বসে আছো এককোণে,
ঝলসা আঁধার পুড়ে পুড়ে নাবছে ঘাস-পানা-কানাচে।
তীর ফলা রুষে পুড়ে উড়ে যায় আঠারোবাহুতে…
খোলা চাল ঝড়ো করে হাতাহাতি রাধবাঁধটুকু
বাঁধতে হঠাৎ ঘুরপাক দিয়ে নেচে ওঠে মাটি।
দূর পিছ থেকে কালো তীক্ষ্ণ অশ্রবণ সাঁঝডাক
ডালপালা-দেয়াল ছিন্নভিন্ন করে ঢুকে আসে, হাতে
আবোলা আগোণা কড়ি বেজে ওঠে—শন্‌শন্ গাছালি—
আশপাশ করে অশ্রুভাপ লাগা বাতাস—কে যায়?
ঘাসসই হয়ে নুয়ে চলে যাও—প্রলাপগাছের
শতকোটি পর্ণচোখ জ্বলে আছে শ্বাস রুদ্ধ করে
গোল গণ্ডি-দাগ ধরে বিষপড়া ফুল আপ্তকামী,
ঢলে আছে শস্ত্রতীর বলি-নাম দাগা ছাগপশু—

কানাকানি টেলিগ্রাফ দেহাতি দগড়ে বাজে তুক্…

পথ ব'লে পথ

চমকা মোড়, শীর্ণতর হয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকছে জটঝোপের
মাঝ দিয়ে, পথ বলে পথ চোখেই পড়ে না, পাখডানা ভাঙা বৃক্ষ—
কাউকে চিনি না, পাতালতায় জিভের স্পর্শ দপ্‌দপ্‌ করছে,
মাথা ভর্তি
যন্ত্রণার ডুবদাগ কালো হয়ে জমে আছে গুঁড়ির ভেতর, মাথাঢাকা
নেতের টুকরোটুকু উড়িয়ে খেলতে বসল আকাশবাতাস পিছুবাগে···
জামার খুঁট ধরে টানছে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলল কতক পথ
দুরক্ষর কথা
যেন মউলকুঁড়ির এক যব জোড়া আভাসবুদ্বুদ মনে হয় সাত বর্ণে
ছুঁয়ে ধরবে, সুখ ঝালাপালা করে ওড়পাড় করছে হাওয়াডাল,
ডাল নুয়ে পড়ছে শতধারায় যেন মমতার ফাঁস পিঠে এসে
লাগছে, মুখ তুলতে
সাহস হয় না, পাতালতায় দপ্‌দপ্‌ করছে জিভের স্পর্শ— সারাদিন
ধ্বস্ত গাঙ যন্ত্রণার ডুবদাগ কালো হয়ে জমে আছে গুঁড়ির ভেতর···
সাত উজান নেবে যায় শেকড়-নাড়িতে খাক হয়ে, ধাপ ধাপ
জটঝোপে জমে ওঠে ঘষা বাঁজা আলো— চোখ মেলে আছে
অঠাহরে,
পথ বলে পথ চোখেই পড়ে না, ধোঁয়ারেখার মতো অনল শ্বাছায়া
ঘাসমুখে ঘুরে ঘুরে ওঠে একএকবার, শিয়রে শিয়রে
কালো নিষ্ঠুর পর্ণঘোর— লোভশ্বাস ফেলছে, যেন একবার ঘুরলেই
দেখতে পাবো ডাল নুয়ে নুয়ে পড়ছে শতধারায়, সুখশালে সুখ
উভরায় জেগে উঠেছে খোপে খোপে—না-বাঁচা বিপল-দণ্ডের আবছায়া
জামার খুঁট ধরে টানছে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলল কতক পথ
দুরক্ষর কথা···

CENTRAL LIBRARY

'মহাভারত'

(ধারাবাহিক)

পুরুষোত্তম লাল

অর্জুন

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের আচরণ—যুদ্ধপূর্বক আত্মীয়বর্গ নিধনে তাঁর অনীহা—কৌতূহলোদ্দীপক বই কিছু নয়। যেন সব চারিত্র্য-বহির্ভূত। উদ্দীপক অবশ্যই, কিন্তু বিভ্রান্তিকরও বটে। সামরিক কর্তব্য সম্পাদনে একজন ক্ষত্রিয়ের কেন এতো দ্বিধা? হয়তো অর্জুন চরিত্রের সমগ্রতায় নিহিত এই প্রশ্নের উত্তর, এই বিশ্বাসে ১৯৬৮ সালে কুড়ি বছরের এক পরিকল্পনায় শ্লোক-পরম্পরা এক অনুসৃষ্টির কর্মে আমি লিপ্ত হই। আশা, হয়তো এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব হবে মহাকাব্যের ৬ষ্ঠ পর্বের (যেখানে বিধৃত ভগবদ্গীতা) চূড়ান্ত বিতর্ক-বিষয়টির অন্তত কিছু সূত্র সন্ধান।

বর্তমানে, কাজের মধ্যভাগে পৌঁছে, কিছু চকিত উদ্ভাসের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তর এখনো অনায়ত্ত—অবশ্য অনুমান যে সম্পূর্ণ উত্তর নিশ্চয়ই আছে, বস্তুত যা হয়তো নেই। অর্জুন একজন নিরন্তর সন্ধানী, যেহেতু বিপন্ন, পুরুষ; তাঁর ভ্রাতৃ-বৃন্দের সঙ্গে বিসদৃশ, যাঁরা প্রচলিত মূল্যবোধ ও আচরণে তৃপ্ত। তিনি একমাত্র পাণ্ডবভ্রাতা, যাঁর বিচিত্র দুঃসাহসিক কামলীলায় প্রকাশমান এক অস্থির বিশ-শতকী নায়ক, রতিতৃপ্তির মাধ্যমে আত্মার পরিপূর্ণতা সন্ধানে যার নির্মম প্রয়াস। কলিঙ্গ, চেদি, মাদ্রা, মগধ এবং যবনের রাজকন্যাদের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন; হরিদ্বারে আছে তাঁর এক সন্তান—ইরাবত, নগরাজকন্যা উলুপীর গর্ভজাত; মণিপুরে বিবাহ করেন চিত্রাঙ্গদাকে,

যার গর্ভে তাঁর সন্তান বভ্রুবাহন ; দ্বারকায় কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ত্বরিতে অপহরণ ও বিবাহ করেন কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রাকে, যার গর্ভজাত তাঁর সন্তান অভিমন্যু। তুলনায় ম্লান, অপর ব্যতিক্রম ভীম (যিনি "বিবাহ" করেন হিড়িম্বা রাক্ষসীকে) ; অবশিষ্ট তিনজন পাণ্ডব-ভ্রাতা তাঁদের অভিন্ন স্ত্রী দ্রৌপদীতেই সুখী। ব্যাস তাঁদের বিবাহ-অতিরিক্ত কোনো প্রণয়বীর্য গাথা নথিবদ্ধ করেন নি।

তা'হলে কোনো সজাগ পাঠকের পক্ষে অনুমান করা কি অসঙ্গত যে, অর্জুনের মানসিক গঠনই চিন্তাকুল-সন্ধানী-ব্যক্তিমুখী, এমন-কি প্রতিবাদী ? এমন যুক্তি যথেষ্ট নয় যে, এ-সবই এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশবিশেষ, এবং অর্জুনের বহু সংসর্গ প্রবিষ্ট হয়েছে পরিকল্পিত সংঘর্ষের প্রস্তুতিতে সামরিক সন্ধির প্রয়োজনীয় সহায়ক রূপে। আসলে অর্জুনের প্রকৃতি এইরূপ ; এ'ভাবেই তাঁর হ'য়ে-ওঠা ; অন্যরূপ হওয়া তাঁর অসম্ভব। তিনি জানেন যে তিনি পরাজিত হবেন না (কারণ তাঁর সঙ্গে রয়েছে অপরাজেয় গাণ্ডীব ধনুক), তথাপি তিনি সংগ্রামবিমুখ। পৃথিবীর প্রথম সংগ্রামবিরোধী রূপে, একজন বিবেকবান প্রতিবাদী এবং বান্ধব হিন্দু রূপে চিহ্নিত হতে চান তিনি। তাঁকে "কাপুরুষ" বললে, যেমন একবার বলেছিলেন কৃষ্ণ, অবিচার হবে। [বস্তুত,] অর্জুনের ন্যায় "কাপুরুষ" হ'তে অতি বিশেষ ধরনের সাহসের প্রয়োজন। যে-কারণেই হোক্, আসলে অর্জুন অকস্মাৎ পক্ষ নেন অহিংসার, যখন কৃষ্ণ যুক্তিশীল নিধনের পক্ষে। আশ্চর্যজনক-ভাবে, 'গীতা'য় অর্জুন একজন মানবতাবাদী, আর কৃষ্ণ রণমুখী। এবং মূলত এই দুই ভয়ঙ্কর বিপ্রতীপ দর্শনের কোনো ঐকতান সম্ভব নয়, আমাদের এই বিমূঢ় যুগের পক্ষেও যে-দুই দর্শন স্বকীয় তাৎপর্যে প্রোজ্জ্বল।

কৃষ্ণ

রবের আঁতোয়ানের মতে, "মহাভারত"-এর সর্বাপেক্ষা

জটিল চরিত্র কৃষ্ণ। মূল গল্পে কৃষ্ণ আদিম রাখাল-গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি অবিবেচক ও হিংস্র, ধূর্ততায় তিনি ভারতীয় ইউলিসিস। মহাযুদ্ধে নিষ্ঠুর ঘাতকতার জন্য গান্ধারী কৃষ্ণকেই অভিযুক্ত ক'রে অভিশাপ দিয়েছেন। তাঁর অন্তিম অ-গৌরবজনক। কোন্ ক্রমিক দেবারোপ প্রক্রিয়ায় তিনি হ'য়ে ওঠেন ভগবদ্গীতা-র চূড়ান্ত পুরুষ তা এক প্রশ্নবিশেষ, যার ঐতিহাসিক সমাধান দুরূহ, [অথচ] যার মধ্যে সুপরিস্ফুট ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি। কৃষ্ণ-পুরাণ নিছকই কোনো কাব্যিক কিংবা কাল্পনিক মহতীকরণ নয়। [বস্তুত] এ হ'লো জীবিত ঈশ্বরের জন্য মানবাত্মার গভীর ও অপূরণীয় আর্তির রূপারোপ, দৈবী প্রকাশের অবর্তমানে যাঁকে মানুষ খুঁজে পেতে চায় এমন এক মানব-কাঠামোয়, যিনি সব মানবিক সীমার ঊর্ধে অধিষ্ঠিত।"

এই ধারণার সঙ্গে একমত না হ'লেও পাঠকের এ'টুকু বুঝতে অসুবিধে হবার নয় যে, অন্য যাই হোক্, 'মহাভারত' যে [প্রকৃতপক্ষে] কৃষ্ণের মহাকাব্য এবং কৃষ্ণের মধ্যে মূর্ত তার বিবিধ উপাদানের এক জটিল সংহতিবিন্দু—সেইউপাদান যাই হোক না কেন : "ট্র্যাজেডি, কমেডি, ইতিহাস, গ্রামীণ-কমেডি, ঐতিহাসিক-গ্রামীণ, ট্র্যাজিক-ঐতিহাসিক, ট্র্যাজিক-কমিক-ঐতিহাসিক-গ্রামীণ, অথবা একটি নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্য, কি অনিঃশেষ কবিতা।" ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিশিষ্ট মার্ক্সীয় ভাষ্যকার, ডি. ডি. কোশাম্বী ***The Times of India Annual 1965***-এ তাঁর "দ্য হিস্টোরিকাল কৃষ্ণ" প্রবন্ধে ট্র্যাজিক গ্রামীণ-মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণে মহাকাব্যের বিচার করেছেন। তাঁর যুক্তি, কৃষ্ণ-উাখ্যান দুটি ধাপে প্রবাহিত—প্রথমটি কংসবধ ও দ্বারকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাহিত, দ্বিতীয়টি অনুস্যূত পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের বন্ধুতা ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর ভূমিকায়, যার পরিণতি বাসুদেবের অপর পত্নীর গর্ভজাত সন্তান তথা কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জরার হাতে [কৃষ্ণের] মৃত্যুতে।

অধ্যাপক কোশাম্বীর মতে, সম্পূর্ণ উপাখ্যানটির মধ্যে প্রকাশিত সভ্যতার খাদ্য-সংগ্রাহী আরণ্যক পর্ব থেকে কৃষিজ খাদ্যোৎপাদনের বিবর্তন-রূপ। কৃষ্ণের মাতুল কংসকে বধ করতে হ'লো—"মাতৃ-তান্ত্রিক ধারায় (খাদ্য-সংগ্রাহকদের ক্ষেত্রে যা ছিলো স্বাভাবিক) বিকাশপ্রাপ্ত কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে [নিয়মানুযায়ী] প্রধানের উত্তরাধিকারী তার পুত্র নয়, তার ভাগিনেয়। অধিকন্তু, প্রধান পদের উত্তরাধিকারীর উৎসর্গ করতে হ'তো তার পূর্বসূরীকে। এর দ্বারাই স্পষ্ট হয়, কেন জনসমক্ষে কংসবধ অনিবার্য ছিলো।" বস্তুত, "এই পুরাণ-কাহিনীর কোনো পর্বেই রাধার শিখরস্পর্শী প্রেমের কোনো উল্লেখ নেই ; কারণ, তিনি ছিলেন পূর্বাঞ্চলের মাতৃ দেবী। রাধা-তত্ত্ব সম্যক অনুধাবন জরুরি হওয়ার পূর্বে সুদূর বঙ্গভূমি পর্যন্ত কৃষ্ণ-তত্ত্বের প্রসার জরুরি হয়েছিলো।" যাই হোক্, নগ কলিয়ের বিতাড়ন [বস্তুত] অরণ্যবাসী "খাদ্য-সংগ্রাহক" নগদের বিরুদ্ধে "খাদ্য-উৎপাদনকারীদের" আক্রমণ বিশেষ। "সুতরাং কৃষ্ণ কোনো ঐতিহাসিক একক ব্যক্তি মাত্র ন'ন, বরং একাধিক উপ-গাথার বীরসমন্বয়, যে-সকল বীরের সহায়তায় সম্ভব হয়েছে খাদ্য-উৎপাদনশীল সমাজ গঠন।"

আধি-ভৌতিক ইচ্ছাপূরণ ও সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার এই দুই পর্যাপ্ত মাত্রা সেবন-জনিত ভার লাঘব জরুরি হ'লে পাঠকবৃন্দ কৃষ্ণের প্রকৃতি-ভূমিকা ও বাণী-সংক্রান্ত অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষ্যের প্রতি চোখ ফেরালে উপকৃত হতে পারেন ; বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ডব্লু জি আর্চার এর "দ্য লাভ্স্ অব কৃষ্ণ" (১৯৫৭), মিল্টন বি. সিঙ্গার-এর "কৃষ্ণ : মিথ্স্, রাইট্স্ এ্যাণ্ড অ্যাটি-টিউড্স্" (১৯৬৬), ওয়াল্টার স্পিংক-এর গীতিমধুর ও ভাবো-দ্দীপক "কৃষ্ণমণ্ডলা" (১৯৭১), এবং এ. সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী-র ভক্তিরসাশ্রিত "কৃষ্ণ : দ্য সুপ্রীম পার্সোন্যালিটি অব গড্হেড্ (প্রথম খণ্ড)", ১৯৭১।

কৃষ্ণ অফুরান। কৃষ্ণরহস্যের মর্মস্থলে উপনীত হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট একটি পথ নেই, বিভিন্ন পথে লভ্য বিভিন্ন উদ্ভাস —যা থেকে উৎসারিত বিবিধ সমস্যা।

ক্রমশ

(ভাষান্তর : দি. কু. চ.)

নগরসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও সি. এম. ডি. এ.

স্বপনকুমার ভট্টাচার্য

মহানগর বললেই আমাদের চোখের সামনে পুরব্যবস্থা সম্বলিত জনপদের চিত্র ভেসে ওঠে। নগরের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যেখানে পর্বত শ্রেণীর ন্যায় সৌধ, সুরম্য হর্ম্য সমূহ বিদ্যমান। সেই সঙ্গে অবশ্য নাগরিক চাহিদা মেটানর প্রয়াস লক্ষণীয়। 'নগর বা মহানগর এ দেশে বা একালেই নয়' বহুদেশে প্রাচীনকালেও ছিল। প্রখ্যাত সাংবাদিক ইতিহাসবেত্তা লুই মামফোর্ড বলেছেন, 'এ্যাট দি ডন অফ সোসাইটি, দি সিটি ইজ্ অলরেডি এ ম্যাচিওর ফর্ম' সুপ্রাচীন নগরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা তাই দেখতে পাই। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি নগর বা শহরের পেছনেই বিরাট ভূখণ্ডে থাকে বহু গ্রাম। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা উন্নয়নশীল গ্রামসমূহ দ্বারা শহরকে ঘিরে রাখো—এই প্রবাদের সারবত্তাইছিল ভারতের সার্বিক উন্নয়নের মূল কথা। অর্থনীতি হিসাবে একালের মত প্রাচীন যুগেও গ্রামই ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং রাজনীতি হিসাবে তাই ছিল স্বায়ত্বশাসন বিষয়ে একরূপ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। শহুরে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে হলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে রীতি-মত সর্ববিধ বিষয়ে চিরকালই আদান প্রদান হওয়া চাই। শহর দেশের মুখমাত্র হিসাবে চেনা-অচেনাকে আহ্বান জানায়।

পূর্ব প্রসঙ্গে বলি উন্নতধরণের সামাজিক ও আর্থিক বন্ধন গ্রামীন ভারতবর্ষে ছিল বলেই শহরে সমস্যাগুলো আয়ত্তের মধ্যে থাকত, দীর্ঘদিন ধরে শহর স্থায়ীত্ব লাভ করত। গ্রামীন ব্যবস্থা স্বয়ম্ভর ত' ছিলই বরং বর্ধিষ্ণু-গঞ্জের মারফত শিল্প ও পণ্যাদি দেশ বিদেশে রপ্তানি হত। এই গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ উন্নততর জীবন-যাপন সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা লোক শিক্ষা ও লোকহিতের মাধ্যমে প্রচারিত হত। গ্রামীন জীবন কীভাবে উপলব্ধি করতে হয় এবং শহরে ও পল্লী জীবনের আবশ্যকীয় ফারাক কতটা সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মে দেওয়া হত, (সোস্যাল প্ল্যানিং) অপর দিকে যে পরিবর্তন সাধারণের মঙ্গলজনক ও সর্বার্থসাধক চিন্তা করে প্রচলিত হত সেটাই বঙ্গের কৃষি শিল্প ভিত্তিক গ্রামীন সমাজপতিরা গ্রহণ করতেন ও চালু করতেন।

জার্মান দার্শনিক স্পেঙ্গলার বলেছিলেন তার সুবিখ্যাত 'ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট'-এ 'দি ম্যান অব দি ল্যাণ্ড এণ্ড দি ম্যান অব দি সিটি আর ডিফারেণ্ট এসেন্সস'। এই সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য উক্তিটির ব্যাখ্যা বর্তমান মেট্রোপলিস ও মেগালোপলিসের আওতায় দেওয়া খুব সোজা হবে না।

পুরাতত্ত্ববিদেরা ও ইতিহাসকারগণ জানিয়েছেন ভারতে নগরের কাহিনী সুপ্রাচীন। যুগে যুগে নগরের ভাবমূর্তি প্রতি-ভাত হয়েছে কাহিনী ও সাহিত্যের মধ্যে, মূর্তরূপে যা ছিল দেশের অভ্যন্তরে। রামায়ণ-মহাভারতে, পুরাণে নগর পত্তনের কথা দেখি, অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থের, লংকাপুরীর বর্ণনা পাই, বৌদ্ধযুগে তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, কাশী, দ্বারকা, উজ্জয়িনী, রাজগৃহ নগরের কথা পাই, আবার নালন্দা, শ্রীনগর, খাজুরাহো, কাঞ্চীপুরম, শ্রীরঙ্গম, মাদুরাই, মথুরা প্রভৃতি নগরের

বিবরণ পাই। আধুনিককালে বিজয়নগরের কাহিনী দিগ্বিজয়ী হয়েছে। বৈদিক সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক হলেও ঋগ্বেদ-উল্লিখিত কৃত্রিম জলসরবরাহের ব্যবস্থা চমৎকৃত করে। তার পরের যুগে কূয়া থেকে জলসরবরাহের কথা পাই। সাধারণত ধর্মীয় কারণে শিক্ষালয় বা রাজনীতি অথবা আমদানী-রপ্তানীর স্থান শিল্পকারখানা অথবা ভৌগোলিক কারণে ঐসব প্রধান কর্মকেন্দ্রকে ঘিরেই শহর গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক বিশেষীকরণ ও শ্রমের বিশেষীকরণ জনিত অর্থনৈতিক প্রবাহ, পণ্যোৎপাদন ও বাণিজ্যিক লেন-দেন শহর গড়ে তুলত।

গ্রামপ্রধান বাংলায় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে যতগুলো নগরীর কথা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর এবং নদীকূলে অবস্থিত। যেমন—তাম্রলিপ্ত, ত্রিবেণী, পাণ্ডুয়া, কর্ণসুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন, নবদ্বীপ, গৌড়, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষ সমাজ ব্যবস্থা ও জলবায়ু অনুযায়ী নগর ও শহরের বাসস্থান ও রাস্তাঘাট গড়ে উঠত। নগরের বিশিষ্ট পথ-রাজপথ ও অন্যান্য সংকীর্ণ পথের ও প্রাসাদ-বাসগৃহ ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য গুরুত্ব অনুযায়ী বজায় থাকত। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী জয়পুর শহর ১৭২৮ সালে এক বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে ওঠে। শুনেছি ফরিদাবাদও তাই। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার বিবরণ ভারতীয় নগরবিন্যাসের প্রাচীনতম নিদর্শনের অন্যতম। প্রায় ৫ হাজার বছর আগে সেখানে উত্তর পশ্চিম ভারতে ঐ নগরীগুলোতে সমান্তরাল পথঘাট, দোতলা-তিনতলা বাড়ির সারি, চওড়া রাস্তা তার পাশে ৬ ফুট ব্যাসযুক্ত পয়ঃপ্রণালী ও বাড়ি থেকে বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট পয়ঃনালী মূল নর্দমায় সংযোজিত

হয়েছে। পাটলিপুত্রের বিবরণ চন্দ্রগুপ্তের আমলের বিদেশী পর্যটক মেগাস্থিনিসের কাছে পাচ্ছি, অশোকের সময় (২৩২ খৃঃ পূর্বাব্দ) পর্যটক ফা হিয়েন বলেছিলেন "সম্রাট অশোকের প্রাসাদ মানুষের তৈরী নহে—উহা দৈত্যের হাতে নির্মিত বলিয়া মনে হয়।"

শুধু তাই নয় জমি জরিপের কাজ (cadastral survey) নিয়মিত হতো। চোল রাজাদের (৯৮৫-১০১১ খৃঃ) জরিপের কাজ করাতেন। তৎকালীন নগরসমূহ গড়ার পেছনে ঐ সময়কালীন বিজ্ঞানভিত্তিক পুস্তকাদির সাহায্য নেওয়া হত।

আবার বলি আজকের মত তখনও গ্রামই যেমন ছিল শহরও তেমনই ছিল। দু'জনেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রামীন ও শহুরে সংস্কৃতি বলে আলাদাভাবে প্রচার করেছে। ইতিহাস জানাচ্ছে তখন বহুগ্রাম পরস্পর সংযুক্ত থাকত এবং এক গ্রাম থেকে পঞ্চগ্রাম, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, বিংশতিগ্রাম, সহস্রগ্রাম পর্যন্ত সামাজিক অর্থনৈতিক বন্ধন অটুট থাকত। প্রশ্ন হতে পারে, গ্রামগুলো কত বড় ছিল? লোক কত বাস করত? তাহলে জানিয়ে রাখি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র জানাচ্ছে গ্রাম গঠিত হবে কমপক্ষে ১০০টি পরিবার নিয়ে এবং ৫০০টির বেশি কৃষি পরিবার সেখানে থাকবেনা, এরা কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকবেনা. এরা কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকবে। গ্রামের বিস্তার এক বা দু-ক্রোশ মত থাকবে। ১০টি গ্রাম নিয়ে যে সংহতি ছিল তার নাম সংগ্রহণ, অর্থাৎ একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের পেছনে ১০টি গ্রাম থাকছে। আবার ২০০টি গ্রাম নিয়ে যে সংহতি ছিল তার নাম কার্বটিক বা খার্বটিক (ক্ষুদ্রনগর)। এরকম ৪০০ টা গ্রাম নিয়ে যে সংহতি তার নাম দ্রোণমুখ (উপনগর বিশেষ), আর ৮০০টি গ্রাম নিয়ে যে সংহতি তার নাম স্থানীয় (নগর)।

ব্যবস্থা (৮) শিল্পব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচেষ্টায় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

ধর্মীয় কারণেই নগর স্থপতিরা যে কাজ করতেন তা নয়, স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনায় যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ পাবার স্থান ছিল। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ছাড়া নিরপেক্ষ স্থাপত্যের পরিচয় মেলে। সাহিত্য সম্ভারে দেখছি ফ্লাটরুফ, পয়েন্টরুফ, পাকাসিঁড়ির বর্ণনা গৃহান্তরে। মৃচ্ছকটিকের বসন্ত সেনার সুদৃশ্য অট্টালিকা শোভিত ৩টি প্রাঙ্গনের সঙ্গে 'বৃহৎ কথা' শ্লোকের (×-৭০) স্বৈরীনির সুরম্য হর্ম্যের বিবরণ পাচ্ছি। বামসূত্রে (১-৪) একজন সৌখিন লোকের বাড়ীর ভেতরের দৃশ্য এবং কাব্যমীমাংসার (×) এক কবির আবাসগৃহের স্থাপত্য আমাদের চমৎকৃত করেছে। আবার কল্পসূত্রে (পি-২৪২) ও কাদম্বরীতে (পি-১৩) স্নানঘরের কথা, ধারা গৃহ (বিক্রমদেব চ. রভ × ১১) ইত্যাদির বিবরণ ভালোমত লেখা আছে। এসব কবিকল্পিত বর্ণনা নয়—স্যেকুলার আর্কিটেকচার এর জীবন্ত রূপ। নিরপেক্ষ স্থাপত্য-ভাস্কর্যকলার প্রযুক্তিবিদ যেমন ছিলেন, তেমনি সাহিত্যে তার রূপকার ও ভাষ্যকারেরা ছিলেন। পুরানো কাসুন্দি ঘাটতে গিয়ে ঐতিহ্য কৃষ্টি, ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতাকে 'ওল্ড ইজ গোল্ড' প্রবাদের ছকে ফেলা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে ও বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা ও কৃষ্টির পাশাপাশি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও কৃষ্টি বিরাজমান ছিল। কোথাও রীতির কথা বলা হত। যেমন গৌড়ীয় রীতির কথা যা কলকাতা রীতির (কালচার) মতই ছড়িয়েছিল। নগর ও গ্রামবাসী নিজেদের পার্থক্য ও মিলের কথা জানতেন। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

[আগামী সংখ্যায় শেষ]

সাহিত্য ও সংগীতজগতের মাঝখানে সেতু

রবীন্দ্র সংগীতায়ন (১) : সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত।

(প্যাপিরাস্। কুড়ি টাকা)

সম্পাদিকা সুচিত্রা মিত্র তাঁর নিবেদনের এক অংশে লিখেছেন, "তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তারিত আলোচনা যতখানি হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীতের সেই পরিমাণে হয়নি।" অথচ ওঁর এই লেখাটিই আমাদের মনে করিয়ে দিল যে, গত তিন দশক ধরে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় পাঠক্রমের মর্যাদা অর্জন করেছে। এই কারণে সহ-সম্পাদক সুভাষ চৌধুরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য যে 'রবিঠাকুরের গান' ক্রমে 'রবীন্দ্রসংগীত' আখ্যায় রূপান্তরিত হ'য়ে অনেক সংগীতশিল্পী এবং সংগীতজ্ঞের জীবিকার উপায় হ'য়ে উঠেছে। একাডেমিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হলেই যে-কোন বিদ্যাকর্মের দায়িত্বও অনেক বেশী বেড়ে যায় বই কি। দুর্ভাগ্যবশত, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষকেরা অনেকেই, রবীন্দ্রসাহিত্য-তাত্ত্বিকদের তুলনায়, রবীন্দ্র জীবন ও সাধনা সম্পর্কে প্রয়োজনমতো দায়িত্বশীল বা ওয়াকিবহাল নন, এখনও।

সুচিত্রা মিত্র আবার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের "গীতধারা কাব্য-ধারারই সমান্তরাল প্রবাহ, তরঙ্গের গভীরতা ও স্বচ্ছতায় প্রতি-স্পর্ধীও বটে।" সুভাষ চৌধুরীও বলেছেন "রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চায় যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন তাঁরা একই মনোরাজ্যের অধিবাসী, কেবল স্বতন্ত্র মাধ্যমে···।" সাহিত্যিক-অধ্যাপক-সমালোচক গোষ্ঠীতেও প্রায়ই রবীন্দ্র

সংগীতের ভাণ্ডার সম্পর্কে তত্তোটা জ্ঞান বা কৌতূহল লক্ষ করা যায়নি। তাই, সাহিত্য ও সংগীত জগতের দুই পরিবেশগত বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি সেতু গ'ড়ে তুলতেন দায়িত্বশীল এই দুই বিশেষজ্ঞ, উপরি-উক্ত প্রবন্ধ সংকলনটির মাধ্যমে। তাঁদের "মূল উদ্দেশ্য সাহিত্য ও সংগীতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বময় চিন্তাদৌত্যে মিলনের এই সূত্রটি গেঁথে দেওয়া।" সম্পাদকদের পরিকল্পনায় এই প্রবন্ধগুলি অবশেষে তিনটি খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হবে। যদিও সূচিত্রা মিত্রের তালিকায় অনেকগুলি বিদগ্ধ নাম বিবৃত রয়েছে, যাঁরা ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র সংগীতের রসবিচারে বা তথ্যসংগ্রহে নানাভাবে পথিকৃৎ কাজ করে গেছেন, তবুও এর আগে বই আকারে একই সঙ্গে এতোগুলি চিন্তাশীল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে কিনা, আমাদের জানা নেই।

প্রথম এই খণ্ডটিতে আটটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা ও রূপ, শব্দের ব্যবহার, চিত্রকল্প, রাগমিশ্রণ, পূজার নিবেদন, কীর্তন ও লোকগীতির প্রভাব ও রবীন্দ্রনাট্যের সংগীতবিষয়ক বৈশিষ্ট্য নিয়ে মৌলিক ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য নিবেদিত হয়েছে। লেখকরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে মাননীয়; সুতরাং অসাবধান, অনুমানভিত্তিক মন্তব্য আশা করা যায় না তাঁদের কাছে, যেমনটি নানা পত্র-পত্রিকায় প্রায়শই দেখা যাচ্ছে আজকাল। তবে নান্দনিক বিচারে বা হার্দ্যগুণে কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন ভারী তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য লেগেছে, তেমনি আবার দু'একটি লেখা এতো বেশী বিশেষজ্ঞের ডায়ালেক্টে, ছান্দসিক-বৈয়াকরণের চুলচেরা কাটাছেঁড়ায় ক্লিশিত যে সংগীতরসপিপাসু পাঠকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হতে পারে। সাহিত্য ও সংগীতের মিলনের সূত্রটি এক্ষেত্রে শব্দশাস্ত্রের "ল্যাবিরিন্থীয়" গোলকধাঁধায় একেবারে মিলিয়ে-হারিয়ে যায়। সুভাষ চৌধুরী লিখেছেন যে, সংগীতরসিক সাধারণ পাঠকের

কথাটি মনে রাখতে হয়েছে, যাতে তাঁরা বিষয়টির প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হন। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বইয়ের গোড়াতেই ফাঁড়াস্বরূপ দাঁড়িয়ে ডঃ পবিত্র সরকারের "রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা ও রূপ" প্রবন্ধটি। রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদকে "দুর্বল কথাশিল্পী" বলায় তাঁর সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মনোযোগ সহকারে প'ড়ে মনে হয়েছে যে, অধ্যাপক বলতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথের যে-গানগুলিতে কথ্যভাষার আন্তরিকতার সঙ্গে আবেগের অলংকার মিশেছে সেগুলিতেই একটি বিশেষ চরিত্রগত ভারসাম্য লাভ হয়েছে। তৎসম শব্দবহুল স্তব বা বন্দনার গানগুলি সে তুলনায় যেন কবিকে কিছুটা classical দূরত্বে আবদ্ধ রেখেছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রকাব্যের তুলনায় গানে মিতকথা ও বিবর্তনের অল্পতা, ধ্রুপদ ও খেয়ালের শৈলীব্যবহার, অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ, বাক্যখণ্ডের পুনরাবৃত্তির বৈশিষ্ট্য —এই সবের নানা উদাহরণের তালিকাসহ লেখক কবির কবিতার ভাষার সঙ্গে গানের ভাষায় তফাতগুলি বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু সর্বনাম, বিশেষ্য, ক্রিয়া বিশেষণ, অনুসর্গ, অনুপ্রাসধর্মী সমাস, মাইক্রো-ম্যাক্রো-স্টাইলিষ্টিক্স্ cvcvc ইত্যাদি কথার আসা-যাওয়া, নানা চার্ট-প্যাটার্ন ইত্যাদির ব্যবহার, বিরাট টিকা নির্দেশ প্রবন্ধটিকে ভারাক্রান্ত ক'রে ফেলেছে—যদিও লেখকের পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অরুণ ভট্টাচার্য রাগ-মিশ্রণের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, রবীন্দ্রসংগীতভাণ্ডারে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ রাগসংগীতের নানা নিয়ম-নির্দেশ ঘনবদ্ধভাবে বর্ণিত হলেও তাঁর অভিপ্রায় মত লেখক শাস্ত্রীয়সংগীতের শিকড় বেয়ে বহু উর্দ্ধে উঠে গেছেন, নানা শাখা-প্রশাখার ডানা মেলে পৌঁছে গেছেন সেই বিরাট বিস্ময়কর আকাশে, যাকে আমরা "রবীন্দ্রনাথের গান" বলে জানি। লেখকের রসবোধ তাঁর পাণ্ডিত্যকে অবিরল অলংকৃত, সিঞ্চিত করেছে। রবীন্দ্রসংগীতের

ভাব থেকে রূপে ক্রমশ উত্তরণের ইতিহাসটি তিনি ভারি শ্রীমণ্ডিত ভাবে চিত্রিত করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত' নামক প্রবন্ধটি বইয়ের দীর্ঘতর লেখার মধ্যে আরেকটি। রাগভাঙা যে-ধর্মসংগীতগুলি ব্রাহ্ম-সমাজের মাঘোৎসবের জন্য অথবা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নানা পারি-বারিক অনুষ্ঠানের জন্য রচিত হয়েছিল, সেগুলি বিষয়ে আধুনিক প্রাজ্ঞজনেরা অনেকেই কিঞ্চিৎ অনুকম্পামিশ্রিত সংকীর্ণ মত প্রকাশ ক'রে থাকেন—ব'লে থাকেন, এগুলি কৃত্রিম ও সাম্প্রদায়িক। অরুণ বসু এই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছেন নানা তথ্য সহযোগে। উনি বলেছেন, 'সংগীতের ক্ষেত্রে উদার অসাম্প্র-দায়িকতাই ব্রহ্মসংগীতের জনপ্রিয়তার কারণ'। সংকীর্ণ গোষ্ঠী-কেন্দ্রিকতা থেকে কবি ক্রমশই মুক্ত হয়েছিলেন, 'ব্রহ্মসংগীত' থেকে 'পূজার গানে' নিবেদিত হতে চেয়েছিলেন—এই সব মন্তব্য তুলে ধ'রেও অরুণ বসু বোঝাতে পেরেছেন যে, ব্রাহ্মপরিবারের রবীন্দ্রনাথ সুদূর ১৩০৬ সালেই রচনা করেছেন "বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে।" তবে মাঝে মাঝেই ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রাহ্ম-সমাজের আগে তাঁর "তথাকথিত" শব্দের ব্যবহার বিভ্রান্তিকর।

'রবীন্দ্রনাথের পূজার গানের চিত্রকল্প' প্রবন্ধটিতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সরসভঙ্গীতে রবীন্দ্রসংগীতে ইমেজের বৈচিত্র্য ও পূজার গানের বিশেষ প্রতীকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানেও কবিতা ও গানের চারিত্রিক তারতম্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুধীর চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব' এবং বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের গানে শব্দের ব্যবহার' বইটির মূল্যবানতম দুই প্রবন্ধ। সযত্ন বিশ্লেষণ, গভীর গবেষণা, কাব্যময় ভাব ও রসোত্তীর্ণ ভাষার এমন চমৎকার মিলন অনেকদিন অনুভব করিনি। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শুনতে পেলে তৃপ্ত হতেন।

শেষ দুটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাটকের গান সম্পর্কে। অশ্রুকুমার সিকদার নাটকের প্রসঙ্গগত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ক'রে সে গানের সীমাহীন ব্যঞ্জনা উপভোগ করতে শেখালেন, 'ডাকঘরে'র অন্তর্নিহিত গদ্যগানের বর্ণনা করলেন, নাটকে গানের ব্যবহারে দেশজ ঐতিহ্যের কুণ্ঠাহীন প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলেন অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে। আলপনা রায়চৌধুরী লিখেছেন রবীন্দ্রনাটকে গানের সুর ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে। অনেক নাটকেই রবীন্দ্রনাথ বাউলের সুর ও চরিত্র ব্যবহার করেছেন, একটা সূক্ষ্ম আত্মনিবেদনের চিত্র রচনা করতে চেয়ে—কথা, সুর, নাটক ও গান মিলে গেছে নিবিড় একাত্মতায়। শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ 'গানের সুরে আমার মুক্তি'ই হয়তো চেয়েছিলেন—লেখিকা উদাহরণ সহযোগে সুন্দর ক'রে নাটকের এই বিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন।

খালেদ চৌধুরীর রচনায় প্রচ্ছদ সুশোভন রূপ ধারণ করেছে। গানের ছত্রগুলি কোনও বিশেষ বিবর্তনে সাজানো কি? প্রথম গানটি তো গীতবিতানের সূচিতেও প্রথমে রয়েছে। লেখক-লেখিকা সম্পর্কে একটি টীকা থাকলে বইটি সম্পূর্ণ হ'ত।

শ্যামশ্রী লাল

৩৩-ডি শ্রীমোহন লেন, কলকাতা-৭০০০২৬ থেকে সুভাষ ঘোষাল কর্তৃক প্রকাশিত। গ্র্যাণ্ড সাপ্লাই কোম্পানী, কলকাতা-৬১ থেকে মুদ্রিত।

CENTRAL LIBRARY

ত্রিপুরায় আমাদের অনেক কিছুই নেই। এখানে রেলগাড়ী নেই, বিশ্ববিদ্যালয় নেই, রয়েছে কোনো শিল্প নেই—অতি দীর্ঘ এই 'নেই'-এর তালিকা। নেই একখানা পূর্ণাঙ্গ নিয়মিত সাময়িক পত্রিকাও। অথচ এখানে লেখক ছিলেন, লেখক আছেন, আছেন এক সুবিস্তৃত পাঠককুল—কলকাতা বা আরো দূরের সাময়িক পত্রিকাই তাঁদের একমাত্র লভ্য পাঠ্যবস্তু। আর ঠিক এরই ফলে এপ্রিল ৮৩ থেকে বেজে উঠেছে

স ম ত ল

সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা।

শারদ অর্ঘ তুলে ধরছে রুচির গভীরতা

সম্পাদক : **দেবানন্দ দাস**
১০, জগন্নাথ বাড়ী রোড
আগরতলা-৭৯৯ ০০১
পশ্চিম ত্রিপুরা

With best compliments from :

3 NOV 1983

NATIONAL TOBACCO COMPANY

(A division of Duncans Agro Industries Ltd.)

1 & 2, OLD COURT HOUSE CORNER

CALCUTTA-700 001

Regd. Office :

31, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700 001